প্রবর্জীন কল্যাণে

৩০

বছর

ইসলামী ব্যাংক আইডিবি-র নেতৃত্বে বিদেশী উদ্যোক্তার ৭০% এবং বাংলাদেশ সরকারের ৫% শেয়ার নিয়ে ১৯৮৩ সালে যাত্রা শুরু করে।

জে পি মরগান (ইউএসএ) ও ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশসহ ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে ৬০,০০০ দেশী-বিদেশী শেয়ারহোল্ডার।

ইসলামী ব্যাংক ৮০ লক্ষ আমানত ও বিনিয়োগ গ্রাহককে নিয়মিত সেবা দিয়ে আসছে।

২০১২ সালে ১৯ লক্ষাধিক নতুন গ্রাহক ইসলামী ব্যাংকে হিসাব খুলেছেন।

ইসলামী ব্যাংক বিশ্ব সেরা ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক 'গ্লোবাল ফাইন্যান্স' ইসলামী ব্যাংককে ৮ বার সেরা ব্যাংকের পুরস্কার প্রদান করে।

ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের ৪৫% রয়েছে শিল্পখাতে।

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র-শিল্পে দেশের সর্বাধিক বিনিয়োগ করেছে ইসলামী ব্যাংক।

এস.এম.ই তে দেশের মোট বিনিয়োগের সর্বাধিক ১৭% বিনিয়োগ করেছে ইসলামী ব্যাংক।

ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের মাধ্যমে ২৫ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে পল্লী এলাকায় ৭ লক্ষ নারী ও পুরুষকে বিনিয়োগ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাপী ১১৬টি এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক দেশের মোট রেমিটেন্সের ২৮% আহরণ করছে।

বিশ্বমানের বাংলাদেশ গড়তে

আমরা নিয়োজিত

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ লিমিটেড
ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক পরিচালিত

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১৪

সম্পাদক

মোশাররফ হোসেন খান

সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা ১২১৭

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী [স] সংখ্যা ২০১৪

প্র কা শ কা ল
বৈশাখ ১৪২১
রজব ১৪৩৫
মে ২০১৪

প্র চ্ছ দ
মুবাশ্বির মজুমদার

মু দ্র ণ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০

প্র কা শ না য়
সাহিত্য সংস্কৃতি
৪৯২ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৩৩৩২০, ০১৯১৪০৫৮৫৭৬

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ

উ প দে ষ্টা

অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর

আসাদ বিন হাফিজ

মজিবুর রহমান মন্‌জু

স ম্পা দ ক

মোশাররফ হোসেন খান

স দ স্য

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

মোঃ আবেদুর রহমান

হাসান আলীম

নাসির হেলাল

শরীফ আবদুল গোফরান

হারুন ইবনে শাহদাত

বিল্লাল হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূ চি ক্র ম

স ম্পা দ কী য়
আদর্শ মহামানব ০৯

প্র ব ন্ধ
নবী [সা]-এর ভবিষ্যদ্বাণী
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১১

বৃহৎ বিশ্বের প্রেক্ষিতে রাসূল মুহাম্মাদ [সা]
জুবাইদা গুলশান আরা ১৪

রাসূল [সা] ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান
ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ ১৯

ভাষাচর্চায় মহানবী [সা]-এর আদর্শ
এ জেড এম শামসুল আলম ৩৩

মহান আল্লাহর আইন : বিবিধ প্রসঙ্গ
ডক্টর আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম ৩৭

রাহমাতুল্লিল আলামিন
অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান ৪৫

মহানবী [সা]-এর মহান শিক্ষা আন্দোলন
ড. আহসান হাবীব ইমরোজ ৪৮

www.pathagar.com

বদরযুদ্ধ : মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়
এ বি এম মুহিউদ্দীন ৬২

বিশ্ব সভ্যতায় হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর অবদান
ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান ৬৫

বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]
মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ ৬৮

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতদার নবী মুহাম্মাদ [সা]
জাফর আহমাদ ৭২

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী [সা]
ড. মো. জাহিদুল ইসলাম ৭৫

আদর্শ জাতি গঠনে মুহাম্মাদ [সা]-এর অবদান
ড. মীর মনজুর মাহ্মুদ ৮৫

বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক স্মারক
নাসির হেলাল ৯৫

রাসূল মুহাম্মাদ [সা]
কাফি খুররাম ১০৩

মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ
অধ্যাপক আ ত ম মুছলেহ উদ্দীন ১০৫

মাজলুমের নবী মুহাম্মাদ [সা]
এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান ১০৮

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ন্যায়বিচার
মুহাম্মাদ শোয়াইব ১১৪

মহানবী [সা]-এর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ
ড. এম এ সবুর ১১৭

রাসূলের [সা] আগমন
অধ্যক্ষ মো: ইয়াছিন মজুমদার ১২০

www.pathagar.com

যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বনবী [সা]-এর শিক্ষা
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ১২৩

মানবজাতির জন্য ভালোবাসার নিদর্শন : রাসূল [সা]
শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির ১২৮

মানবজাতির দিকদর্শন
শহিদুল ইসলাম ১৩৪

অনুবাদ প্রবন্ধ

অতুলনীয় এক নেতার আবির্ভাব
মূল : ওয়াশিংটন আরভিং, তরজমা : হোসেন মাহমুদ ১৪১

গবেষণা

কুরআন, সুন্নাহ, ইসলাম ও মুসলমানের চরম শত্রু
সেক্যুলারিজম-সৃষ্ট নাস্তিক্যবাদ
প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ ১৫০

কবিতা

মাহবুবুল হক-১৭৪ ◦ আবদুল হালীম খাঁ-১৭৬ ◦ ফজলুল হক তুহিন-১৭৮ ◦ আলতাফ হোসাইন রানা-১৭৯ ◦ মানসুর মুজাম্মিল-১৮০ ◦ নজরুল ইসলাম শান্ত-১৮১ ◦ শাহীন আল মামুন-১৮২ ◦ জয়নাব সিদ্দিকী-১৮৩ ◦ আমিনুল ইসলাম-১৮৪ ◦ মাহমুদ শরীফ-১৮৫ ◦ সোহেল মল্লিক-১৮৬ ◦ মোস্তফা হায়দার-১৮৭ ◦ সোনিয়া সাইমুম বন্যা-১৮৮ ◦ তমসুর হোসেন-১৮৯ ◦ খালীদ শাহাদাৎ হোসেন-১৯০ ◦ আবু সুফিয়ান সরদার-১৯২ ◦ নূর মোহাম্মদ-১৯৩ মুহাম্মদ ইসমাঈল-১৯৪ ◦ নাজমা ফেরদৌসী-১৯৫ ◦ মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ-১৯৬

মিডিয়া

ইসলামী চলচ্চিত্র ও নাটক প্রসঙ্গে
শেখ আবুল কাসেম মিঠুন ১৯৭

সাহিত্য

বিশ্ব নবী [সা]-এর দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা
মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ ২০৩

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ এক সাহাবী-কবি
মুস্তাফা মনজুর ২০৭

ছো ট গ ল্প
সত্যের সাম্পান
আবুল খাইয়ের আইউব ২১৪

তুমুল জোয়ার
মালিক ইমতিয়াজ ২১৮

বয়স যখন আঠার
রিয়াজ পারভেজ ২২২

নিরাপদ জনপদ
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী ২২৭

স ং স্কৃ তি
ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুন
ইব্রাহীম মণ্ডল ২২৯

প ত্রা ব লি
বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারে মহানবীর [সা] পত্রাবলি
ড. আবু নোমান ২৩৬

ভ্র ম ণ
হেরা থেকে ওহুদ : এক আধ্যাত্মিক সফর
মাসুদ মজুমদার ২৪৮

www.pathagar.com

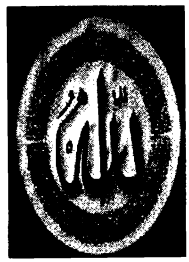

স ম্পা দ কী য়

আদর্শ মহামানব

মহান রাব্বুল আলামিন সমগ্র মানবজাতির জন্য তাঁর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব– রাসূল মুহাম্মাদকে [সা] হিদায়াত স্বরূপ, সুসংবাদ দানকারী, সতর্ককারী, রহমতস্বরূপ ও পথ-প্রদর্শক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এমন আরও বহুতর বিশেষণে রাসূল [সা] বিশেষত। আল কুরআনে বলা হয়েছে–

"তিনি তাঁর রাসূলকে পথ-নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সমস্ত দ্বীনের ওপর তাকে জয়যুক্ত করার জন্য। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" [আল ফাতহ : আয়াত ২৮]

আল্লাহ পাক চান বান্দা হিসেবে মানুষ একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবে এবং তাঁর মনোনীত রাসূলকেই [সা] অনুসরণ করবে। এটাই মহান আল্লাহর চূড়ান্ত ঘোষণা।

পৃথিবীতে বহু মানুষের বসবাস। প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং জীবন-যাপনের পৃথক কর্মপন্থা। মানসিকতা, চিন্তা ও ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রেও রয়েছে অজস্র ভিন্নতা। প্রতিটি সমাজ, দেশ ও জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে পৃথক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিজস্ব একটি স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্য। সেটা থাকতেই পারে। পৃথিবীর ভারসাম্যপূর্ণ চলমানতার জন্য সেটার প্রয়োজনীতাও অনস্বীকার্য। কিন্তু সকল কিছুর ওপর প্রকৃত সত্য এই যে, কর্ম ও জীবনপ্রণালি কিংবা সামাজিক ও বৈশ্বিক ভৌগোলিক কারণে মানুষের মধ্যে যত প্রভেদই থাকুক না কেন–এক আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার এবং রাসূলের [সা] সর্বান্তকরণে অনুসরণ ছাড়া, একমাত্র ইসলামের বিধান, শাসন, জীবন-পদ্ধতি, সামগ্রিক আদর্শ ও সংস্কৃতি জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া আখিরাতে চূড়ান্ত সফলতার অন্য কোনো পথই মানুষের জন্য খোলা রাখা হয়নি। বিজয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি, পার্থিব যে বৈষয়িক চিন্তা কিংবা তার জন্য পেরেশানি, যশ-খ্যাতি বা জাগতিক স্বার্থের পেছনে ছুটে চলা– এটাকেও রাব্বুল আলামিন অত্যন্ত তুচ্ছতর ও লঘু দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন–

www.pathagar.com

"যারা শুধুমাত্র এই দুনিয়ার জীবন এবং এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তাদের কৃতকর্মের সমুদয় ফল আমি এখানেই তাদেরকে দিয়ে দেই এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে কম দেয়া হয় না। কিন্তু এ ধরনের লোকদের জন্য আখিরাতে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। [সেখানে তারা জানতে পারবে] যা কিছু তারা দুনিয়ায় বানিয়েছে [তা সবই] বরবাদ হয়ে গেছে এবং এখন তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।" [সূরা হুদ : ১৫-১৬]

বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, যারা শুধুমাত্র বৈষয়িক ভোগ-বিলাস, লাভ, ক্ষমতা, যশ-খ্যাতি কিংবা উন্নতি সমৃদ্ধি অর্জন করাকেই কেবল তাদের জীবনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে– আল্লাহর এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ তাদের জন্য আদৌ শুভ ও কল্যাণবহ নয়।

আখিরাতের জীবনের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য। এতই নগণ্য যে, এক ফোঁটা বুদবুদের সাথেও এর তুলনা চলে না। সুতরাং এই সাময়িক, ততোধিক ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য মহামূল্যবান একটি জীবনকে বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে সমূহ বিপন্ন ও ভয়ঙ্কর ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত করা কোনো বিবেকসম্পন্ন মানুষ বা ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। দুনিয়া ও আখিরাতের লাভ-ক্ষতির সুবিশাল প্রভেদটা সামনে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে কোনো বুদ্ধিমানের পক্ষেও এমন পতন ও পচনশীলতাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আফসোসের বিষয়, এসব বিচার বিশ্লেষণ তো দূরে থাক, চিন্তার সামান্য কণা-পরিমাণও এ সকল ক্ষেত্রে ব্যয় করতে অনেকেই রাজি নয়। এর চেয়ে পার্থিব লাভ-লোকসান, হিংসা-বিদ্বেষ, আপন স্বার্থ অর্জনের যাবতীয় কূটকৌশল, ক্ষমতার লিপ্সা, ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, এমনকি শেয়ার ও টেন্ডার-এর মতো জটিল বিষয় নিয়ে দর কষাকষি করে একটি জীবন পার করে দিতে তারা অধিক পরিমাণে আগ্রহী। অথচ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে জঘন্য জীবের সাথে উপমিত করেছেন– যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে দ্বীনের পথে, আল্লাহর সৃষ্টি জগতের জন্য, সৎ ও শুভ কর্মের দিকে ধাবিত করে না।

আগেই উল্লেখ করেছি, ভৌগোলিক কিংবা দেশ ও সমাজের মধ্যে আমাদের যতই দূরত্ব কিংবা সীমারেখা কিংবা বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের একটা ক্ষেত্রে ঐক্যকে সুসংহত, সুদৃঢ় ও সংযত করার প্রয়াস থাকতেই হবে, আর সেটা হচ্ছে– মহান রাব্বুল আলামিনের সর্বান্তকরণে দাসত্ব এবং রাসূলের [সা] যথাযথ অনুসরণ। এটাই আমাদের জন্য একমাত্র মুক্তির পথ।

www.pathagar.com

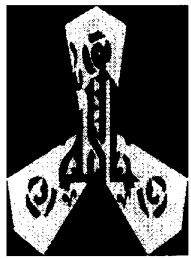

নবী [সা]-এর ভবিষ্যদ্বাণী

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

আখেরি নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] কেয়ামতকাল পর্যন্ত তাঁর উম্মতের জন্য চলার পথ নির্দেশ করে গেছেন। কালের বিবর্তনে যেসব বৈরী সময় উপস্থিত হবে সেগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যেও তিনি এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যেগুলো একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করলে মনে হবে যেন প্রতিটি ঘটনাই আগাগোড়া স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে উম্মতকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে গেছেন। হাদিস শরিফের কিতাবাদিতে সতর্কবাণীমূলক এ অধ্যায়টিকে 'ফেতান' নামে অভিহিত করা হয়। 'ফেতান' ফেতনাতুন শব্দের বহুবচন। আভিধানিক অর্থ, স্বর্ণ আগুনে জ্বালিয়ে তার ভালোমন্দ পরীক্ষা করা। যেহেতু নানা ধরনের বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে মানুষের ঈমান এবং আমলের পরীক্ষা হয়ে যায়, সে কারণে সব ধরনের বৈরী পরিস্থিতিকেই ফেতনা বলা হয়ে থাকে। মন্দ ধরনের কোনো আমল যখন সে জমানার একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়ে যায় এবং বুঝে, না বুঝে মানুষ তা অনুসরণ করতে শুরু করে তখন সেটিকেও একটি 'ফেতনা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেননা এর দ্বারাও মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যায়। কারা এ ফেতনার মধ্যে নিজেকে সমর্পিত করে দেয়, আর কারা এ পরিস্থিতি সাহসের সাথে মোকাবেলা করে ঈমানের ওপর দৃঢ়পদ থাকে, সেটা দেখার একটা সুযোগ উপস্থিত হয়। অনুরূপ ইসলামের মূল চেতনাবিরোধী কোনো চিন্তাধারা যখন আকর্ষণীয় যুক্তির আবরণে সুসজ্জিত করে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন সেটাও একটা ফেতনা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা এর দ্বারা মানুষের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, সে কি স্থূল যুক্তি এবং বাহ্যিক চাকচিক্যের সামনে পরাজয় স্বীকার করে, না সুষ্ঠু যুক্তি ও চিন্তার দ্বারা এ স্থূল চিন্তাধারার মোকাবেলা করে। হযরত নবী কারিম [সা] ফেতনার প্রতিটি দিক সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। তৎসঙ্গে এ কথাও সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, উম্মত যখন এসব ফেতনার সম্মুখীন হবে তখন তার কর্তব্য কী হবে! এ সম্পর্কিত বর্ণনার ধরন এবং আধিক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, হযরত নবী কারিম [সা] ভবিষ্যতের এসব ফেতনার ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি বলেছিলেন, আমার দু'চোখ দেখতে পাচ্ছে ফেতনা তোমাদের প্রতিটি জনপদেই এমনভাবে পতিত হয়, যেমন করে বৃষ্টির ফোঁটা ঝরতে থাকে [সহীহ বুখারি, কিতাবুল-ফেতান]।

www.pathagar.com

নবী কারিম [সা] ইরশাদ করেছেন, সময় অতি দ্রুত অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে এক-একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে যাবে। সৎ কাজ কমে যাবে। দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান দ্রুত হ্রাস পাবে। অজ্ঞতা ও মূর্খতা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে। সহীহ শুদ্ধ ইলম উঠে যেতে থাকবে। অর্থলিপ্সা, লোভ-লালসা ও কার্পণ্য সাধারণ চরিত্রে পরিণত হয়ে যাবে। সর্বত্র হত্যা ও লুণ্ঠনের ছড়াছড়ি দেখা দেবে [সহীহ বুখারি, কিতাবুল-ফিতান, পঞ্চম অধ্যায়]।

নেশাদ্রব্য মদকে নির্দোষ পানীয়রূপে সাব্যস্ত করা হবে। সুদকে ব্যবসারূপে অভিহিত করে হালাল সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা চলবে। ঘুষকে উপঢৌকন বলে হালাল সাব্যস্ত করা হবে। জাকাতকে বাণিজ্যে পরিণত করা হবে। অর্থাৎ একশ্রেণির লোক জাকাত উসুল করে বিভিন্ন পন্থায় তা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে [কানজুল-উম্মাল, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২২৬]।

মানুষ সন্তানের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করাটাকে ঘৃণার চোখে দেখবে। বৃষ্টির দ্বারা জমিন শীতল না হয়ে বরং গরম বেড়ে যাবে। ব্যভিচারের বন্যা বইতে থাকবে। মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদী বলা হবে। আত্মোৎসর্গকারীকে আমানতদার এবং প্রকৃত আমানতদারকে আত্মোৎসর্গকারী বলা হবে। অনাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক গভীরতর হবে এবং আত্মীয়-গোনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব চলে যাবে দুষ্কৃতকারীদের হাতে। প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিকে সমাজ ছোট ছোট ছাগলছানার মতো নিতান্ত স্বল্পমূল্যের মনে করা হবে। মসজিদের মেহরাব কারুকার্যমণ্ডিত হবে, কিন্তু দিল হবে অন্তঃসারশূন্য। সমকামের ব্যাপক প্রচলন হবে। পুরুষ-পুরুষের সাথে এবং নারী-নারীদের কামলীলা চরিতার্থ করবে। বিরাট বিরাট এলাকা নিয়ে মসজিদ নির্মিত হবে এবং সেগুলো সুউচ্চ মিনার দ্বারা সুসজ্জিত করা হবে। জনমানবহীন বিরান এলাকা আবাদ হয়ে যাবে এবং অনেক জনবহুল আবাদি বিরান হয়ে যাবে। সর্বত্র পুলিশি রাজত্ব কায়েম হবে। অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির পেছনে লেগে থাকা, চোগলখুরি ও অন্যের দোষচর্চা ব্যাপকতর হয়ে যাবে। গান, বাদ্য ও প্রকাশ্যে মদ্যপান বেড়ে যাবে [কানজুল-উম্মাল, চতুর্দশ খণ্ড]।

নিয়মিত নামাজ পড়ার প্রচলন কমে যাবে। আমানতের ব্যাপক খিয়ানত হবে। সুদখোরির প্রচলন ব্যাপকতর হবে। মিথ্যাচারকে বৈধ জ্ঞান করা হবে। মানুষের জীবনের মূল্য সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাবে। সুউচ্চ ইমারত নির্মিত হতে থাকবে। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে দ্বীন বিক্রয় করে দেয়া হবে। সুবিচার বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাবে। চার দিকে শুধু জুলুম আর অবিচারের রাজত্ব কায়েম হবে। তালাকের ঘটনা ব্যাপক হবে। অপমৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। একে অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে। ইতর শ্রেণির লোকদের ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটবে আর ভদ্র বিনীত লোক খুব অল্পই অবশিষ্ট থাকবে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা এমনকি মন্ত্রীরা পর্যন্ত মিথ্যা বলবে। জনগণের সম্পদ হিফাজতকারীরা আত্মসাৎকারী হবে। জাতির প্রতিনিধি স্থানীয় লোকগুলো হবে জালেম। দুশ্চরিত্র লোকেরাও কুরআনের ক্বারীরূপে পরিচিত হবে। জীব-জন্তুর চামড়ার তৈরি পোশাকের প্রচলন হবে। ওদের অন্তর পচা লাশের চেয়েও বেশি দুর্গন্ধযুক্ত হবে। শান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কুরআন মজিদ বর্ণাঢ্যভাবে মুদ্রণ করা হবে। সুউচ্চ মিনারসংবলিত সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মিত হবে। কিন্তু মানুষের দিল উজাড় হয়ে যাবে। কুরআনের আইন বাতিল করে দেয়া হবে। কন্যারা পর্যন্ত মায়েদের সাথে দাসী-বাঁদীর মতো আচরণ করবে। যেসব-লোকের পরনের কাপড় জুটত না, ওরা শাসন কর্তৃত্বের মালিক হয়ে বসবে। স্ত্রীলোকেরাও স্বামীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে। পুরুষেরা

www.pathagar.com

স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রীলোকেরা পুরুষের বেশ ধারণ করে প্রকাশ্যে চলাফেরা করবে। আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে অন্যের নামে কসম খাওয়া হবে। মুসলমানরাও মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। দ্বীনী ইলেম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে অর্জন না করে অন্য কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অর্জন করা হবে। জাতীয় কোষাগার ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে। আমানতকে লুটের মাল জ্ঞান করা হবে। জাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে। সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকগুলোই নেতৃত্বের আসন দখল করে ফেলবে। সন্তান পিতার অবাধ্য হয়ে যাবে, মায়ের সাথে নির্মম আচরণ করবে। বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা না করে ক্ষতি করার ফিকিরে থাকবে। অধিকাংশ লোক স্ত্রীর একান্ত অনুগত হয়ে জীবন-যাপন করবে।

চরিত্রহীন লোকেরা মসজিদের মধ্যেও বড় গলায় কথা বলবে। পয়সা-ওয়ালা লোকেরা গায়িকা নর্তকীদের রক্ষিতা করে রাখবে। গানবাদ্যের সাজসরঞ্জাম যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হবে। প্রকাশ্যে রাস্তায় বসে লোকেরা মদ পান করবে। জুলুম করে গর্ব প্রকাশ করা হবে। কোর্টকাচারির বিচার পর্যন্ত কেনাবেচা হবে। কুরআন তেলাওয়াতকে সঙ্গীতের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে। আগের জমানার লোকদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হবে [আদ দুররুল মনসুর, ষষ্ঠ খণ্ড]।

কলমের ব্যবহার [অর্থাৎ লিখিত পঠনসামগ্রী] ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। প্রকৃত সত্য গোপন করা হবে। লোকেরা মসজিদে আসবে সত্য কিন্তু দুই রাকাত [নফল] পড়ার তওফিক হবে না। একটি ছোট শিশুও একজন বৃদ্ধকে শুধু গরিব মনে করে লাঞ্ছিত করবে। এমন দুশ্চরিত্র লোক সৃষ্টি হবে, যারা পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সূচনা করবে সালাম দেয়ার পরিবর্তে গালিগালাজের মাধ্যমে। লোকেরা নরম গদি আঁটা বাহনে আরোহণ করে ঠাটবাটের সাথে মসজিদের দ্বারে এসে অবতরণ করবে। তাদের স্ত্রীলোকরা পোশাক পরিধান করেও প্রায় উলঙ্গ হয়ে চলাফেরা করবে। ওদের মাথায় কৃশ উটের কুঁজের মতো চুল বাঁধা থাকবে [আদ্দুররুল-মনসুর, ষষ্ঠ খণ্ড]।

দ্বীনের বিধিবিধান সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হবে। অর্থাৎ হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে দেয়া হবে [মিশকাতুল-মাসাবিহ]।

মুসলমানরা ইহুদি-নাসারাদের চালচলন অনুসরণ করতে থাকবে [মিশকাতুল-মাসাবিহ]।

আমানত রক্ষা করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। লোকেরা এরূপ বলাবলি করবে যে, অমুক জায়গায় একজন আমানতদার লোক বাস করেন। ওই সব লোকের সাহস, উদ্দীপনা এবং কর্মশক্তির তারিফ করা হবে, যাদের অন্তরে সরিষা বরাবরই ঈমান থাকবে না [সহীহ বুখারি, দ্বিতীয় খণ্ড]। নিতান্ত অযোগ্য বাজে লোকেরাও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে রায় দিতে শুরু করবে [কানজুল উম্মাল, চতুর্দশ খণ্ড]।

হযরত নবী কারিম [সা] ফেতনার জামানা এবং সে জামানায় যেসব ঘটনা ঘটবে সে সম্পর্কিত যেসব ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটা সামান্য অংশই এখানে পরিবেশন করা হলো। ফেতনা সম্পর্কিত সব হাদিস একত্র করা গেলে দেখা যাবে যে, বর্তমান যুগের ব্যাপক অবক্ষয়গুলো যেন প্রিয় নবীজী এক-এক করে প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগেই বলে গেছেন। আজকের যুগের সার্বিক অবস্থাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কী চমৎকারভাবেই না এ যুগের যাবতীয় অসভ্যতা, অনাচার ও অবক্ষয়ের চিত্রগুলো সে ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

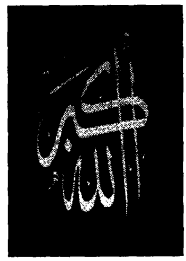

বৃহৎ বিশ্বের প্রেক্ষিতে রাসূল মুহাম্মাদ [সা]

জুবাইদা গুলশান আরা

"পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।" [আল কুরআন-৯৬ : ১-৫] প্রথম অহির আগমন, হেরা গুহায় রাত্রিকালে শুক্রবার, ১৮ রমজান, ৬১০ খ্রিস্টাব্দ।

হযরত রাসূলে আকরাম [সা]-এর পুণ্য আবির্ভাব দিবস গোটা পৃথিবীর জন্যই সুসংবাদ ছিল। মানুষের অবমাননা, পৃথিবীর বুকে অন্যায়ের কলুষ কালিমা সেই যুগে অন্ধকার এক জগৎ তৈরি করেছিল। মক্কায় তখন ছিল আইয়ামে জাহিলিয়াত। মানুষের পৃথিবী যেন তখন মুমূর্ষু। মুক্তির জন্য ছটফট করছিল বিবেকবান মানুষ।

সেই যুগের সাথে সাথে সামনে চলে আসে বর্তমানের অন্ধকার সময়। সারা পৃথিবীজুড়ে চলছে হানাহানি, প্রতি মুহূর্তে আর্তনাদ উঠছে। কোথায় বিশ্ববিবেক? কোথায় সেই নেতা, যার আদেশ-নির্দেশ মানব সভ্যতার কঠিন সঙ্কটে পথ দেখিয়েছিল? আজও পৃথিবী যুদ্ধ করছে। পৃথিবীর মানচিত্রে এখনও রক্তের গ্রোত বয়ে চলেছে।

আজ সেই কারণেই বিশ্বের শান্তির আশায় ব্যাকুল মানুষ স্মরণ করছে সেই মহামানবকে। হযরত মুহাম্মাদ [সা] এসেছিলেন ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মা আমিনার কোলে। জন্মের আগেই তিনি পিতৃহীন হন। প্রথমে দাদা আবদুল মুত্তালিব ও পরে চাচা আবু তালিবের অভিভাবকত্বে বেড়ে ওঠেন। শিশু বয়সে তার জীবনে কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। যেমন, দু'জন শুভ্র বসন পরিহিত ব্যক্তির দ্বারা তাঁর বক্ষবিদারণ। এ বিষয়ে কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে– "হে মুহাম্মাদ, আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দিই নাই? আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার যাহা ছিল তোমার জন্য কষ্টদায়ক।" [আল কুরআন, ৯৪ : ১-৩]। আবার ১৫ বছর বয়সে তিনি যখন চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসার কাজে সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে যান, তখন সেখানে বাহিরা নামক এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। বাহিরা আবু তালিবকে বলেন– "আপনার ভাতিজাকে ইহুদিদের থেকে দূরে রাখুন। আমি যা জানি, তারা তা জানতে পারলে তার ক্ষতি করবে। আপনার ভাতিজার জন্য বিরট সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে।" এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা

www.pathagar.com

তাকে বেছে নিয়েছিলেন বিশেষভাবে। প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন ভবিষ্যতের মহান দায়িত্বের জন্য। এক দিকে তিনি হলেন মহান মুক্তিদাতা, অন্য দিকে সতর্ককারী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সমন্বয় সাধনকারী নেতাসুলভ গুণের প্রকাশ মহানবীর [সা] জীবনের প্রথম দিকেই লক্ষ্য করা যায়। এসব কারণেই সবাই তাকে আল আমিন নামে ভূষিত করে।

মহানবী [সা] নবুওয়ত লাভ করেন ৪০ বছর বয়সে। এর পরেই তার জীবনধারা যায় বদলে। অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশের মানুষের কাছ থেকে নির্যাতন, লাঞ্ছনা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই হয় তাঁর নিত্যসঙ্গী। জীবন হয়ে ওঠে সংগ্রামময়। এ ক্ষেত্রে তাঁর জীবন নিয়ে ভাবলে বিশ্লেষণ করলে যা লক্ষ্য করা যায়, তাহলো তার ক) ব্যক্তিত্ব ও জীবনধারা খ) কূটনৈতিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি, গ) যুদ্ধ ও শান্তিতে তার নেতৃত্বের স্বরূপ এবং মানবসমাজের জন্য তার সামগ্রিক অবদান।

এই কথাগুলো মনে রেখেই আমরা মহানবীর [সা] জীবনকে বিশ্লেষণ করবো এবং দেখতে পাবো যখন একজন মহামানব একটি অনুন্নত মানবসমাজে আবির্ভূত হন, তখন তাঁকে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। মক্কাবাসীদের নির্যাতন, তাঁকে প্রতিনিয়ত বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। মক্কাবাসীদের নির্যাতন তাঁকে প্রতিনিয়ত আঘাত করেছে। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের কাজ ছিল সতর্কতা ও গোপনীয়তার মধ্যে। প্রকাশ্যে প্রচারের কাজ শুরু করার জন্য যথেষ্ট সময় ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। সে সময়কার তথ্যাবলি থেকে জানা যায় যে স্বল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত, সাহাবী এবং উৎসাহী সচেতন যুবক তাঁকে পূর্ণ আনুগত্য ও সহায়তা দিয়েছিল।

পৌত্তলিক ও বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে এক মুহূর্তও শান্তি দেয়নি। দীর্ঘদিন এভাবে দুঃখ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়। আল্লাহর প্রতি সমর্পিত মহানবীকে প্রতিনিয়ত কঠোর কঠিন পরীক্ষার মোকাবেলা করতে হতো। সেই সময়ে অজ্ঞ মক্কাবাসী তাঁকে নবিত্ব প্রমাণ করার জন্য অলৌকিক ঘটনা দেখানোর দাবি করতো। তারা বলতো, অহি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান নয়, হযরতের [সা] নিজেরই রচনা। অন্য দিকে এই অভিযোগও ছিল যে, তিনি নবী হয়েও সাধারণ মানুষের মতো জীবন-যাপন করেন কেন? অলৌকিকত্ব নিয়ে গৌরব করেন না কেন? প্রকৃতপক্ষে একবার তাদের চাপে মহানবী হেরা পর্বতের ওপরে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করেন। তাঁর নির্দেশে আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাহাড়ের দু'পাশে আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যায়। এখানে তারা বলে, এতো জাদু। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা অজ্ঞ এবং অন্ধ বলেই কুরআনের আবির্ভাব যে সবচেয়ে বড় মোজেযা, তা বুঝতে পারতো না। আর মহানবীর মানবিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে বলতে হয়, একজন সদগুণাবলি-সম্পন্ন মানুষই পারেন আরেকজন মানুষকে আদর্শ পথ প্রদর্শন করতে। অর্থাৎ একজন নবী মানুষের জীবনের প্রতিদিনের অংশীদার হয়ে অনেক বেশি সফলতার সঙ্গে মানবসমাজকে সাহায্য করতে পারেন। এ সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, "তারা বলেছিল, তাদের নিকট কেন কোনো ফেরেশতা পাঠানো হয়নি? আমি যদি ফেরেশতা পাঠাতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতি দিয়েই পাঠাতাম এবং তাদের সেই সন্দেহে ফেলতাম যে সন্দেহে তারা এখন পড়ে আছে।" [সূরা ৬, আয়াত : ৮-৯]

এই অবস্থায় ইসলাম আবির্ভাবের ৩ বছর পর আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ [সা] সাফা পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, তোমরা যদি কলেমায় বিশ্বাস আনো, তবে

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবো। এতে তাঁর পিতৃব্য আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। নিকটাত্মীয়গণও তাকে ধিক্কার দেন। এসব ব্যর্থতার জন্য তিনি নিজেকে দায়ী করতেন এবং গভীর বেদনায় মুহ্যমান হতেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার পরম করুণায় অসম্ভব সম্ভব হয়। ৬২০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াসরির [মদীনা] থেকে একদল হজযাত্রী এসে আল আকাবা উপত্যকায় তাঁবু ফেলেন। তাদেরকে মহানবী ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তারাও তা কবুল করেন। এই বাইয়াতে আকাবা অর্থাৎ আকাবার শপথ ইসলামের বিজয়ের পথে সুদৃঢ় একটি পদক্ষেপ। হযরত মুসআব ইবনে ওমাইর ছিলেন রাসূলের অত্যন্ত প্রিয় সাথীদের একজন। তাকে তিনি প্রথম মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে শিক্ষক ও দূতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। এবং সেই সঙ্গে নবদীক্ষিতদের মধ্য থেকে ১২ জনকে নিজ নিজ এলাকায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দেন। এভাবে মহানবী একাগ্রচিত্তে সুনির্দিষ্টভাবে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করে গেছেন।

এ কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, এ কাজ সহজ হয়নি, রাসূলুল্লাহর [সা] জন্য। দীর্ঘদিন সহনশীলতার সঙ্গে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানদের। এই সময়ে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিলো, "মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান কর অপমান সহ্য কর। জাহেলদের ক্ষমা কর।" পরে তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো– "নির্যাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর।" ইবন ইসহাক বলেন যে সূরা হজের ৩৯-৪০ আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কাজেই মনে রাখতে হবে যে, যে কোনো মহান সংগ্রামের মতোই ইসলামের বিকাশও ছিল কঠিন পরীক্ষা ও ধৈর্যের মধ্য দিয়ে যাত্রা। তাই সংগ্রামের পক্ষে বল প্রয়োগের নির্দেশ আছে দীর্ঘদিন পরে।

আজকের পৃথিবীতে মানুষ একে অন্যকে নির্মমভাবে আঘাত করছে। একে অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত করছে। এখন দেখা যাক সেই দূর অতীতে মহানবী কীভাবে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সব মানুষের মধ্যেও ভালো দিক আছে তাকে পথ দেখিয়ে আনতে হবে। ভীতি বা নির্যাতনের মধ্যে নয়। তাঁর সমস্ত যুদ্ধ ও জিহাদের মধ্যে সেই শান্তির প্রচেষ্টাই ছিল প্রধান। এই জন্যই দেখা প্রয়োজন তিনি কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, আর কেনই বা তা নিয়েছিলেন? মনে রাখা দরকার সে তখন আরব বিশ্বের প্রতিকূল শক্তি ছিল অনেক বেশি তীব্র এবং প্রতিশোধপরায়ণ। যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল স্পর্শকাতর এবং কঠিন। মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন-যাপন প্রতিদিন বিপন্ন ছিল। হিজরতের প্রয়োজন দেখা দেয় সেই কারণেই। মহানবী [সা] এক সময়ে ব্যবসায়িক কাজে বসরা গিয়েছিলেন কয়েকজন বণিকের সাথে। হাবশা বা আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে তিনি নিজের চাচাতো ভাই এবং অন্য মুহাজিরদের পরিচয়পত্র দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় পূর্ণ মর্যাদায় সমাদৃত হন এবং সম্রাট নাজ্জাশী মহানবীকে পত্র প্রেরণ করেন যা ছিল আন্তরিকতা ও সম্ভ্রমপূর্ণ। এর মধ্য দিয়ে ইসলামের বাণীকে আবিসিনিয়ার মুসলমানদের হিজরতের মধ্য দিয়ে দূর দেশে ছড়িয়ে দেয়ারও সুযোগ ঘটে।

রাসূল [সা] নিজে ৫৩ বছর বয়সে মক্কাবাসীদের চরম শত্রুতা ও নির্যাতনকে পেছনে ফেলে ১ রবিউল আওয়াল, ১৬ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত আবু বকর ছিলেন তাঁর সঙ্গে। মদীনায় সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

www.pathagar.com

মদীনায় পৌঁছে তিনি প্রথম গড়লেন একটি মসজিদ। দু'জন পিতৃহীন বালকের এই ভূমি তিনি ১০ স্বর্ণমুদ্রা মূল্য দিয়ে কিনে নেন। মুহাজির, আনসার এবং সাহাবীদের সাথে রাসূলুল্লাহ [সা] নিজেও মসজিদ তৈরির এ কাজে অংশ নেন। আমরা আজ বিশ্বশান্তির কথা বলছি। বিশ্বশান্তির কথা ভাবতে গেলে সেই যুগ, সেই পরিবেশে মহানবী [সা] এর সংগ্রামী জীবনের কথা আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও নীতিনির্ধারণ

মদীনায় গমনের পরে নবী করিমের [সা] দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অধিকার রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি তখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নীতিনির্ধারণের প্রতিটি দিকে লক্ষ্য রাখা ছিল অপরিহার্য। মুসলমানদের সংগঠিত করার প্রয়োজন প্রতি পদে অনুভূত হচ্ছিল। এই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্কট কিন্তু তখনও কাটেনি। বরং আরও ব্যাপক ও বিভিন্ন সমস্যাও ছিল। এই সময়ে হযরত মুহাম্মাদ [সা] নিজেও রাতের পর রাত জেগে থাকতেন। সামরিক টহল বাহিনী তৈরি করে নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি নিজেও ঘোড়ায় চড়ে তালোয়ার নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত লোকালয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতেন। আশ্বস্ত করতেন মানুষকে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপনের পর তাঁকে প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে বহু পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল একটি ক্রমবর্ধমান বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে মজবুত ভিত্তি দেয়ার জন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১ হিজরির সফর মাসে তিনি ৬০ জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া গমনকারী কাফেলা সমূহের ঘাঁটি আরওয়ায় যান। যেখানে জুহাইনার সর্দার মাজদি এবং বনু দামবার সর্দার মাখশি ইবনে আমর আদ্দামরির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন।

পরবর্তীতে ইহুদি সম্প্রদায়ের তিনটি দল বনু কাইনকা বনু যাযির ও বনু কুরাইযাহ এবং অন্যান্য মুশরিক ও মুনাফিক গোষ্ঠীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ [সা] একটি চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম হন। হিংসা ও ধ্বংস এড়ানোর লক্ষ্যে এই সমঝোতা চুক্তি এবং অসামান্য দলিল। বলা চলে এটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে নিয়মিত লিখিত সংবিধান তথা প্রথম রাজনৈতিক সনদপত্র। [বি ঘ : পৃ. ১২৯] এভাবে একজন বিজ্ঞ রাজনীতিকের মতোই তিনি দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

যুদ্ধ ও জিহাদের বিষয়ে তাঁর ভূমিকা

মহানবীর কর্মজীবন এবং ঘটনাবলি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এবার লক্ষ্য করি যুদ্ধ বা জিহাদে এবং শত্রুর মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কেমন ছিল। ইসলাম তার শুরু থেকেই ছিল একটি রাজনৈতিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। [ই.মজি : ১৩৯] যা কিছু যুক্তি এবং বিবেকের বিরুদ্ধে ইসলাম তাকেই বারবার প্রতিরোধ করেছে। যুদ্ধ ইসলাম এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। জেহাদ শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে জাহদুন শব্দ থেকে। অর্থ হলো নিজের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার। আবার অন্য অর্থে আল্লাহর পথে যুদ্ধ। সূরা নিসার ৯৫ আয়াতে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [১৩৪ ঐ] রাসূলুল্লাহ কখনো বলেননি-তোমার শত্রুকে ভালোবাসো। তিনি বলেছেন, তোমার ওপর যতটা আঘাত করেছে, তুমি তাকে ততটাই আঘাত করো। [কিন্তু অধিক নয়] এবং তুমি যদি তাকে ক্ষমা কর তবে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন [মোঃ হামিদুল্লাহ Le Prophet del Islam] যুদ্ধকালে কোনো শিশু বা মহিলাকে হত্যার বিরুদ্ধে তাঁর কঠিন নির্দেশ

www.pathagar.com

ছিল। তিনি তাঁর যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিতেন এবং সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। সেসব যুদ্ধের পরে বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণের অসামান্য নজির রয়েছে। হিজরতের পরে দীর্ঘকাল ধরে মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা যুদ্ধ করতে হয়েছে। বদরের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হয়, তখন মাত্র [১৭ রমজান ২য়, হিজরি ১৭ মার্চ, ৩২৩ খ্রি:]

৩১৩ জন মুজাহিদ এক হাজার কোরাইশ সৈন্যের মোকাবেলা করে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জন্য রাসূলুল্লাহ [সা] স্বয়ং ছিলেন উদ্বিগ্ন। কিন্তু দৃঢ় ঈমান এবং আল্লাহ তায়ালার অসীম অনুগ্রহে গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয়। এরপরও উহুদ, খন্দক তাবুকের ও খায়বরের যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে সর্বদা বিজয় ও সাফল্য অর্জিত হয়নি। চতুর্থ হিজরিতের মাউনা কূপের কাছে নিরস্ত্র একদল মুসলমান ক্বারীকে হত্যা করা হয়। এই শোকাবহ ঘটনা রাসূলুল্লাহর হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল।

এবার আসছি একটি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনাটি মহানবীর জীবনে আর এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ষষ্ঠ হিজরি সালের যিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ [সা] উমরাহ পালনের ইচ্ছা করেন। কিন্তু কুরাইশরা সব রকম সৌজন্য বর্জন করে মুসলমানদের জন্য কাবার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। তখন তিনি হুদাইবিয়ায় গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। কুরাইশদের অসঙ্গত চাপের মুখে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

উভয়পক্ষে তখন নানাদিক বিবেচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে একটি দশসালা চুক্তি সম্পাদিত হয়। মুসলমানদের জন্য চুক্তির শর্তগুলো আপাতদৃষ্টিতে ছিল বড়ই অসম্মানজনক। ফলে সন্ধির শর্তগুলো মুসলমানদের মনে দারুণ আঘাত করে। তারা স্পষ্টতই অনুভব করেন শর্তগুলো তাদের জন্য অবমাননাকর এবং তারা দারুণ মর্মযাতনায় ভুগতে থাকেন। কিন্তু মহানবী কেবল বলেছিলেন– "আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। আমি তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করতে পারি না।"

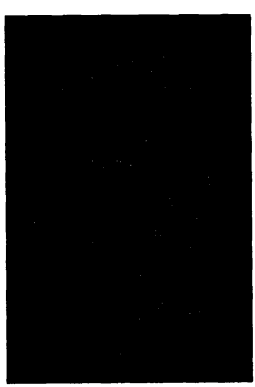

www.pathagar.com

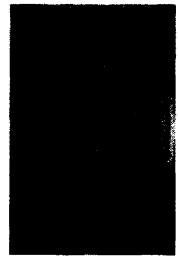

রাসূল [সা] ও অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান

ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলাম যে ইলম তথা জ্ঞানের দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ যা শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে তা হলো, এমন প্রতিটি জ্ঞান যা দলিল-প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মুসলিম আলেমগণ তাকলিদ তথা অন্ধ অনুসরণকে ইলম তথা জ্ঞান বলে গণ্য করেননি। এ জন্য যে, তা হলো কোনো রকম দলিল-প্রমাণ ছাড়াই অন্যের কথায় আনুগত্য ও অনুসরণ। আর তাই ইসলামে যা ইলম, [জ্ঞানী] তা অনেক ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে অথচ আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের ইলম তথা Knowledge সেই অর্থ বা ভাব সন্নিবেশ করে না। সুতরাং ইসলামী ইলমে অতীন্দ্রিয় জগৎ, যার জ্ঞানই অহির মাধ্যমে লাভ করা যায় তাও শামিল করে। এই অহির জ্ঞানের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব রহস্য এবং আদিকাল থেকে মানুষ যে মৌলিক তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, তার জবাবও লাভ করেছে। সেই তিনটি প্রশ্ন হলো :

আমার আগমন কোথা থেকে?
আমার চলার শেষ কোথায়?
আমি কেন এলাম?

এ প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে মানুষ তার সূচনা, প্রত্যাবর্তনস্থল ও তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে যেমন জেনেছে, তেমনি জেনেছে নিজেকে, তার রব প্রভুকে এবং সে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এই ইলমকেই প্রকৃত ইলম বলা অধিকতর সঙ্গত। ইমাম ইবন আবদিল বার এই ইলমকেই আল ইলম আল আ'লা [সর্বোচ্চ ইলম] নামে অভিহিত করেছেন।

এই ইলমের অধিভুক্ত হলো মানুষ এবং মানুষের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অধ্যয়ন। যেমন, মানবজীবনের বিভিন্ন দিক, স্থান, কাল, ব্যক্তি, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদির সাথে তার সম্পর্ক যা মানব ও সমাজবিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পঠিত বিষয়। বস্তু ও জড়পদার্থ যা মহাশূন্যে ও এ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তাও এই ইলমের একটি ক্ষেত্র। আর তা সন্নিবেশ করে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যাও, চিকিৎসকশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা ইত্যাদি, যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা। এই ক্ষেত্রটি নিয়ে আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ মেতে আছে। তারা যখন 'ইলম' নিয়ে কথা বলে তখন এসব বিষয় ছাড়া আর কোনো কিছু নিয়ে কথা বলে

www.pathagar.com

না। কারণ এসকল বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিয়াস অনুমানের আওতাভুক্ত। পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেয়া যায় এবং ল্যাবরেটরি ও পরীক্ষাগারেও তা ঢুকানো যায়।

বস্তুবাদ যাকে তার বিষয়বস্তু গণ্য করে ইসলাম এ জাতীয় জ্ঞানকে কোনো বাধা মনে করে না। ঈমানের পরিপন্থী অথবা বিরোধী বলে গণ্য করে না। যেমন গণ্য করেছিল ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য ধর্ম। এ কথা স্পষ্টভাবে ও জোরের সাথে বলা যায় যে, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাসমূহ এমন মানসিক ও বুদ্ধবৃত্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করে যেখানে এ জাতীয় ইলম অঙ্কুরিত হয়। তারপর তার শিকড় শক্তভাবে গেড়ে দেয়, শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয় এবং মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তা ফল দিতে থাকে। সেই শিক্ষাসমূহের কিছু নিম্নরূপ :

জ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করা

মানুষের মধ্যে সাধারণ অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তির মানুষও আছে, তাদেরকে যা কিছু বলা হয় সাধারণত তাই তারা বিশ্বাস করে, তাদেরকে যা কিছু অবহিত করা হয় তা গ্রহণ করে। বিশেষ করে তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমনঃ মাতা-পিতা বা এ ধরনের অন্য কারো নিকট থেকে যদি সেই সব কথা শোনে তাহলে বিনাবাক্য ব্যয়ে তা মেনে নেয়। তদ্রুপ অধিকাংশ মানুষকে যে মত-পথের ওপর দেখতে পায়, তা ঠিক হোক বা বেঠিক হোক, কোনো রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই তা মেনে নেয়। সে ক্ষেত্র তাদের স্লোগান হলো : 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি আমরা তার ওপর আছি।' অথবা তারা বলেঃ 'আমরা মানুষের সঙ্গে আছি তারা ভালো বা মন্দ যাই করুক না কেন।' এরই বিপরীত হলো বাস্তবধর্মী জ্ঞানগত বুদ্ধিবৃত্তি। এ ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না, প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু মানে না। যেখানে দৃঢ়প্রত্যয় ও অকাট্য জ্ঞান দাবি করা হয় সেখানে আবেগ-অনুভূতি এবং ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। জ্ঞানগত বুদ্ধিবৃত্তি যার ওপর প্রতিষ্ঠিত তার মৌলিক রূপরেখা কুরআন ও সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। আমরা তার থেকে কয়েকটি পয়েন্ট সংক্ষেপে উল্লেখ করছি : দলিল ছাড়া কোনো দাবি গ্রহণ করা যাবে না, তা সে দাবিদার যে হোক না কেন। সেই দলিল হলো, বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়ে যৌক্তিক প্রমাণ। যেমন আল্লাহ বলেন, : বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।[১]

ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা। যেমন : তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে, তাদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে?[২]

তার বর্ণনাভিত্তিক বিষয়ে বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও সত্যতা। যেমনঃ পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৩]

২. দৃঢ়প্রত্যয় ও নিশ্চিত জ্ঞান যেখানে দাবি করা হয় সেখানে অনুমান ও ধারণা প্রত্যাখ্যান করা। এ কারণে আল কুরআন মুশরিকদের ইলাহ সম্পর্কে ধারণা ও অনুমানসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন আল্লাহ বলেনঃ[৪] অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসর করে, কিন্তু সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই। মাসিহ [আ] কে শূলে চড়ানোর ব্যাপারে ইয়াহুদ ও নাসারাদের ধারণাসমূহকে কুরআন প্রত্যাখ্যান

www.pathagar.com

করেছে এভাবে : এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি।[৫]

রাসূল [সা] বলেছেন : তোমরা অনুমান থেকে সাবধান হও। কারণ অনুমান হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।

৩. যেখানে নিরপেক্ষতা, বাস্তবধর্মিতা প্রয়োজন এবং যেখানে বস্তুসমূহের প্রকৃতি ও সৃষ্টি জগতের নিয়ম-নীতির সাথে কাজ-কর্ম করতে হয় সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগ ও কামনা-বাসনা প্রত্যাখ্যান করা– তার পরিণতি ও ফলাফল যাই হোক না কেন। কুরআন মুশরিকদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে:[৬] তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।

দাউদ আলাইহিস সালামকে উদ্দেশ করে আল্লাহ বলেছেন:[৭] অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। এমনিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের রাসূলে কারীমকে [সা] লক্ষ্য করে বলেছেন:[৮] অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তারচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে?

৪. জড়ত্ব, অন্ধভাবে আনুগত্য ও অনুসরণ এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অন্যের লেজুড়বৃত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। তা তারা হোক পিতা, পিতামহ বা পূর্ব পুরুষের কেউ, অথবা হোক ক্ষমতাধর নেতৃস্থানীয় কেউ, অথবা হোক আমজনতা ও সাধারণ মানুষ। যারা এ কথা বলতো : "বরং আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে যার ওপর পেয়েছি তার অনুসরণ করবো।"

আল কুরআন অত্যন্ত কঠোরভাবে তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল কুরআন বলেছে:[৯] এমনকি, তাদের পূর্বপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝতো না এবং তারা সৎ পথেও পরিচালিত ছিল না, তা সত্ত্বেও?

অতীতের যে সকল জাতি-গোষ্ঠী তাদের নেতৃবৃন্দ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুসরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে, কিয়ামতের দিন তাদের পরিণতির চিত্র তুলে ধরে তাদের কঠোরভাবে ধিক্কার দিয়েছে। সেদিন তাদের এমন নিকৃষ্ট পরিণতির জন্য তারা যে একে অপরকে দোষারোপ করবে সে কথাও কুরআন বলে দিয়েছে। কুরআন বলেছে : আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ [শাস্তি] রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।[১০]

সাধারণ মানুষ যদি কোনো ভুলের ওপর থাকে, যেহেতু অসংখ্য মানুষ তার ওপর আছে, এই যুক্তিতে তা মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করার ব্যাপারে রাসূল [সা] কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তেমনিভাবে যে মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বাধীন ও নেতা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তার অন্যের অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণের মনোবৃত্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন তিনি বলেন:[১১]

তোমাদের কেউ সুবিধাবাদী হবে না। যেমন, সে বলবে; আমি মানুষের সাথে আছি। তারা যদি ভালো করে, আমিও ভালো করবো, তারা খারাপ করলে, আমিও খারাপ করবো। বরং তোমরা নিজেদেরকে এ অবস্থানে সুদৃঢ় করবে যে, মানুষ ভালো করলে তোমরাও ভালো করবে, মানুষ খারাপ করলেও তোমরা জুলুম করবে না। এই নৈতিক ভূমিকা যা ব্যক্তির আচরণে দৃঢ়তা ও স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে তা তার চিন্তার ক্ষেত্রেও একটা আদর্শের কথা ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

৫. গভীর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ : আর তা হবে আসমান ও জমিনের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে। যেমন আল্লাহ বলেন:[১২] তারা কি লক্ষ্য করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে? তেমনিভাবে তা হবে মানুষের নিজের সম্পর্কে। আল্লাহ বলেন:[১৩] নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?

তা ছাড়া মানবজাতির ইতিহাস, তার উত্থান-পতন এবং মানবসমাজে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিয়ম-রীতি সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:[১৪] তোমাদের পূর্বে বহু বিধান ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

৬. নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা : যেসব শিক্ষা চিন্তার প্রকাশ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সমাজের মাটিকে প্রস্তুত করে তার একটি হলো, শিক্ষার প্রসার ঘটানো ও নিরক্ষতা দূরীকরণ। এ কারণে রাসূলুল্লাহ [সা] তাঁর সময়ে সমগ্র আরবে বিস্তৃত নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই নিরক্ষতার কারণে তৎকালীন আরবাসীকে উম্মি বলা হতো। আল কুরআনেও তাদেরকে উম্মি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

তিনি উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তার মধ্য হতে।[১৫]

রাসূল [সা] নিজেও তার এক বক্তব্যে এই বাস্তবতার স্বীকৃতি দিয়েছেন এভাবে:[১৬]

আমরা একটি নিরক্ষর জাতি, আমরা লিখি না, গণনা করি না।

তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই নবী তাঁর উম্মি জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম কলমের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা ঘোষণা করেন, লেখার বিস্তার ঘটান এবং তাঁর অনুসারীদের নিরক্ষরতা দূর করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাঁর নিকট সর্বপ্রথম এ আয়াতগুলো নাজিল হয় তাতে পড়া, কলম ও শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।[১৭]

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক জমাট [রক্ত] হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না। আল কালাম নামে আল কুরআনের একটি পূর্ণ সূরাই নাজিল হয়েছে, যার সূচনাকে আল্লাহ তায়ালা এই ক্ষুদ্র জিনিসটির কসম করে বলেছেন: নূন। শপথ কলমের এবং তারা যা লেখে তার।[১৮]

এই কসম দ্বারা বুঝা যায় কলম বস্তুটি অবয়বে ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি ও প্রভাব বিশাল। এ কারণে রাসূল [সা] কিছু মুসলিমকে যখনই লেখা শেখানোর কোনো সুযোগ পেয়েছেন, তা মোটেই হাতছাড়া করেননি। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হলো বদরের যুদ্ধেবন্দি। এ যুদ্ধে কিছু কুরাইশ বন্দি লিখতে জানতো। রাসূল [সা] তাদের মুক্তিপণ ঘোষণা করেন যে, তারা প্রত্যেকে ১০ জন করে মুসলিম সন্তানকে লেখা শেখাবে।

ইবন সা'দ আমির আশ শাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:[১৯] বদরের দিন রাসূল [সা] প্রতিপক্ষের ৭০ জন যোদ্ধাকে বন্দি করেন। তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তারা মুক্তি লাভ করে। মক্কাবাসীরা লিখতো কিন্তু মদীনাবাসীরা লিখতো না। যাদের মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিল না, তাদের প্রত্যেকের নিকট মদীনার ১০ জন করে তরুণকে সোপর্দ করা

www.pathagar.com

হলো। তারা তাদেরকে লেখা শেখালো। যখন তারা লেখায় দক্ষ হয়ে গেল, তখন তাই হলো তাদের মুক্তিপণ।

বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ [সা]-এর অন্যতম কাতিবে অহি যায়দ ইবন সাবিতকে [রা] লেখা শেখান এই কুরাইশ যুদ্ধবাদীরা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল [সা] এই লেখা শেখানোর পরিকল্পনা নামমাত্র ছিল না, বরং দক্ষতার এমন স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছিল যে তা ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে নিরক্ষর হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ধর্মের ভিন্নতা রাসূল [সা] কে মুশরিকদের নিকট থেকে তাদের একটি ভালো জিনিস গ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

রাসূল [সা] এর লেখা শেখানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও উৎসাহ দান কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, নারীদের ক্ষেত্রেও তা বিস্তৃত ছিল। তারই নির্দেশে শিফা বিনত আবদিল্লাহ উম্মুল মু'মিনিন হাফসা বিনত উমারকে [রা] লেখা শেখান।[২০]

পরিসংখ্যান বিদ্যার প্রয়োগ

রাসূল [সা] পরিসংখ্যান বিদ্যা নিজে প্রয়োগ করে সাহাবায়ে কিরামকে [রা] তা শেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। আধুনিক যুগে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। নবী কারীম [সা] মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বেই এ পদ্ধতির সুবিধা কাজে লাগান। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান [রা] বলেন, আমরা রাসূল [সা]-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা আমাকে গণনা করে বল, কত মানুষ ইসলামের স্বীকৃতি দেয়।

সহীহ আল বুখারীতে এসেছে : রাসূল [সা] বলেন:[২১] জনগণের কতজন ইসলামের স্বীকৃতি দেয় তা আমাকে লিখে দাও। হুযায়ফা [রা] বলেন, আমরা তাঁকে লিখে দেই, এক হাজার পাঁচশো জন পুরুষ। এটা ছিল লিখিত পরিসংখ্যান। রাসূল [সা] নিজের জনবল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। তিনি নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন যে, এই জনবল নিয়ে শত্রুপক্ষের কতজনের বিরুদ্ধে রখে দাঁড়াতে পারবেন। এ কারণে কেবল যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের সেই সূচনা পর্বে পরিসংখ্যানবিদ্যা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর নির্দেশে প্রয়োগ করা হয় তা আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ইসলামের সকল প্রকার জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ কাজে লাগানোকে স্বাগত জানায়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা

আদমশুমারি, পরিসংখ্যান যেমন জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি তেমনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণও অধিকতর স্পষ্ট জ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি। এই পরিকল্পনা নির্ভর করে হিসাব ও পরিসংখ্যানের ওপর। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ধরে নিয়ে বর্তমানে সেই উপযোগী লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থির করে কাজ করাই হলো পরিকল্পনা। অনেকে বিশ্বাস করেন এ ধরনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা ধর্মীয় বিশ্বাস পরিপন্থী কাজ। প্রাচীনকালে যারা জ্ঞানকে ঈমানের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে বলেছে, এ দু'টি হলো পরস্পরবিরোধী বিষয়। এ দু'টির সম্মিলন সম্ভব নয়। উপরক্তে বিশ্বাস মূলত এই চিন্তারই ফসল। ধর্মীয় চিন্তা প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর ভিত্তিশীল। একজন ধার্মিক মানুষ আজই আগামীকালের, অন্য কথায় জীবনকালে মৃত্যুর জন্য, ইহকাল পরকালের

www.pathagar.com

জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সুতরাং চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য এই পার্থিব জীবনে অবশ্যই তাকে পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য কিছু রীতিপদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আর সেই চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি।

আল্লাহ তায়ালা আল কুরআনে যে অতীতের ঘটনাবলি ও কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা মূলত বুদ্ধিমান মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য। সেই সকল কাহিনীর একটি হলো নবী ইউসুফ [আ]-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যার কাহিনী। এই কাহিনীতে আল কুরআন পনেরো বছরের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে। ইউসুফ [আ] স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আগামী কয়েক বছর দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন কম হবে, ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। তাই বর্তমানেই তা মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ও তার আশপাশ এলাকা সেই দুর্ভিক্ষ থেকে বেঁচে যায়। আল কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনীর কিছু এ কম : ২২ ইউসুফ বললো, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শষ্য কাটবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ব্যতীত সমস্ত শস্যসহ রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এ সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে।

কিছু লোক মনে করেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ভাবনা অথবা তাঁর তাকদির ও ফয়সালার ওপর ঈমানের পরিপন্থী কাজ। এ কারণে তারা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার চিন্তাকে ধর্মীয় দিক থেকে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মনে করে। তবে সত্য এই যে, যারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলুল্লাহ [সা] গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তারা জানেন যে, পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত এলোমেলোভাবে কোনো কিছু করা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। যেখানে কোনো নিয়ম-নীতি, সুব্যবস্থাপনা নেই তার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই।

সত্যি কথা এই যে, যারা গভীরভাবে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতু রাসূলুল্লাহ [সা] অধ্যয়ন করে তাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, যে কোনো রকমের তাড়াহুড়ো করা, বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলোভাবে কিছু করা এবং কোনো রকম নিয়মরীতি ছাড়া কোনো কিছু করা, কুরআন-সুন্নাহ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। রাসূল [সা] তাওয়াক্কুল আল্লাহ [আল্লাহর ওপর নির্ভর করা] দ্বারা এ কথা বোঝাননি যে, সব রকম উপায় উপকরণ প্রয়োগ করা ত্যাগ করতে হবে এবং বিশ্বচরাচরের যে নিয়ম-রীতি আছে তা অস্বীকার করতে হবে। রাসূল [সা]-এর নিকট এক বেদুঈন এসে তার বাহন উটটি মসজিদের সামনে দাঁড় করিয়ে বলে : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আমার উটটি বেঁধে রেখে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবো না ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করবো?

রাসূল [সা] বললেন, উটটিকে বেঁধে তাওয়াক্কুল করো।

ইমাম আল কুরতুবী [রহ] সেই সব লোকের মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যারা বলে পার্থিব জীবনের উপায় উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ। তিনি বলেন, প্রকৃত কথা হলো, যে আল্লাহর ওপর দৃঢ় আস্থা রাখে, আর এ বিশ্বাস করে যে, তার জীবনের সব কিছু পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে, তাহলে পার্থিব জীবনে উপায়-উপকরণ প্রয়োগে তার এ বিশ্বাসে কোনো ক্ষতি করবে না। কারণ, তখন তার এ কাজ হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়মরীতির

www.pathagar.com

অনুসরণ। আমরা কি লক্ষ্য করি না যে, রাসূল [সা] শত্রুর মোকাবেলায় শরীরে বর্ম পরেছেন, শত্রু বাহিনীকে ঠেকিয়ে দেয়ার জন্য দুই পাহাড়ের মাঝখানের পথে তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করেছেন, মদীনার প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য খন্দক খুঁড়েছেন, সাহাবায়ে কিরামকে [রা] হাবশায়, অতঃপর মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন, নিজে হিজরত করেছেন, পানাহারে যাবতীয় উপায় উপকরণ, নিয়মরীতি অবলম্বন করেছেন, পরিবারের জন্য খাদ্য খাবার ঘরে মজুদ রেখেছেন। মোটকথা, পার্থিব জীবনের কোনো ব্যাপারে আসমান থেকে আসবে এ ভরসায় বসে থাকেননি। অথচ আসমানী সাহায্য লাভের সর্বাধিক যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তি তিনিই ছিলেন।[২৩]

রাসূল [সা]-এর জীবনী যে কেউ পাঠ করলে দেখতে পাবে, তিনি যে কোনো ব্যাপারে সব রকমের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছার জন্য সব ধরনের উপায় উপকরণ অবলম্বন করেছেন, সাথে সাথে বিপরীতমুখী সকল সম্ভাবনা মনে রেখে সতর্কতা গ্রহণ করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম তাওয়াক্কুলকারী ব্যক্তি।

রাসূলুল্লাহ [সা] মক্কার কুরাইশদের জুলুম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য তার সাহাবীদের হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশের পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা বা চিন্তা কাজ করেনি– এ কথা বলা যাবে না। বরং এর পশ্চাতে কাজ করে তৎকালীন হাবশার ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি। তিনি আরব উপদ্বীপের কোনো দূরবর্তী অঞ্চলে তাদেরকে যে যেতে বলেননি, তার পেছনে কোনো কৌশল ও পরিকল্পনা কাজ করেনি তা-ও বলা যাবে না। কারণ, কুরাইশদের যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিল তাতে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। তেমনিভাবে রোম ও পারস্যের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলেও তাদেরকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হিকমত ও কৌশল হতে পারতো না। কারণ, তাদের পরিবেশ এই নতুন দ্বীনের দাওয়াত মেনে নিত না। তিনি তাদেরকে চীন বা ভারতবর্ষের মতো দূরবর্তী দেশেও যেতে বলেননি। কারণ, তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, যা তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারতো।

প্রকৃত কারণ হলো, হাবশাই ছিল ভৌগোলিক দিক দিয়ে হিজরতের উপযুক্ত স্থান। দেশটি বহুদূরেও ছিল না, আবার অতি নিকটেও ছিল না। দেশটি ও কুরাইশদের মাঝখানে ছিল বিশাল সাগর। ধর্মীয় দিক দিয়েও ছিল উপযুক্ত। কারণ, দেশটির অধিবাসী ছিল খ্রিস্টান। তুলনামূলকভাবে তাদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্কে ছিল অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে। রাজনৈতিক দিক দিয়েও ছিল উপযুক্ত। দেশটির তৎকালীন শাসক ছিলেন একজন খ্যাতিমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এ কারণে রাসূল [সা] সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেন : সেখানে একজন বাদশাহ আছে, আমি আশা করি তোমরা তার নিকট অত্যাচারিত হবে না।[২৪]

আমাদের এ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল হওয়া সত্ত্বেও রাসূল [সা] ও তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের চারপাশের বিশ্ব থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এবং অজ্ঞ ছিলেন না। তেমনিভাবে তাঁরা তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি পারসিক ও রোমানদের দ্বন্দ্ব সংঘাত সম্পর্কেও উদাসীন ছিলেন না। তাদের সেই দ্বন্দ্বে আরবের মুসলিম ও মুশরিকরাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে সূরা রূমের সূচনাতে নাজিল হয়েছে এভাবে :[২৫]

www.pathagar.com

রোমকগণ পরাজিত হয়েছে, নিকবর্তী অঞ্চলে কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর মদীনায় হিজরতের সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে, তিনি সে ক্ষেত্রে জ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা ও ঈমানী তাওয়াক্কুলে সমন্বয় সাধন করেছেন। দু'টিকেই পাশাপাশি রেখেছেন। এই ঐতিহাসিক সফরের জন্য একজন মানুষের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, প্রয়োজনীয় বস্তুগত সামগ্রী ও উপায় উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তারপর তিনি মাহজার অর্থাৎ যেখানে হিজরত করবেন, সে স্থান সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, সেখানকার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের কিছু মানুষ আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতে অংশগ্রহণ করার পর। তিনি সেই দু'টি বাইয়াতে তাদের নিকট থেকে নিজেদের সার্বিক নিরাপত্তার অঙ্গীকারও গ্রহণ করেন। তারপর তিনি নিজের সহচরদের মধ্যে থেকে সর্বাধিক আস্থাভাজন আবু বকর [রা]-কে সফর সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। তেমনিভাবে বেছে নেন নিজের প্রতি উৎসর্গ প্রাণ ও একান্ত বিশ্বাসভাজন আলী [রা]কে নিজের বিছানায় রাত্রি যাপন করে শত্রুকে ফাঁকি দেয়ার জন্য। তিনি মক্কা মদীনার তৎকালীন পথ বিশেষজ্ঞরও সহায়তা নেন। তিনি হলেন একজন পৌত্তলিক আবদুল্লাহ ইবন উরায়কাত। রাসূল [সা]-এর এ কর্মের দ্বারা ফকীহগণ এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, আস্থাভাজন ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিশ্চিত হলে যে কোনো বিষয়ে অমুসলিম বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করা সঙ্গত হবে। তারপর তাঁরা পরিকল্পনা করেন কোথা থেকে কখন কীভাবে যাত্রা শুরু করবেন, কোন পথে যাবেন, শত্রুর চোখে ধূলো দেয়ার জন্য কোথায় কোন গোপন আশ্রয়ে থাকবেন, সেখানে কারা কীভাবে খাদ্য খাবার পৌছাবেন। এই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মদীনার বহুল ব্যবহৃত পথ ছেড়ে অখ্যাত অজ্ঞাত পথে যাত্রা করে 'ছুর' পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেন। তেমনিভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী আসমা, আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর ও আবু বকরের দাস আমীর ইবন ফুহায়রা [রা] তাদেরকে ছাগল চরানোর উসিলায় দুধ পান করানোর দায়িত্ব পালন করেন। রাসূল [সা] তাঁর হিজরতের পরিকল্পনায় কোথাও কোনো ফাঁকফোকর রাখেননি। যাকে যেখানে এবং যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা স্বাভাবিক। পৌত্তলিকরা 'ছুর' পর্বতের গুহা পর্যন্ত পৌছে যায়। তাদের কেউ নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকালেই গুহার মধ্যে অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ [সা] ও সঙ্গী আবু বকর [রা]-কে দেখতে পেতো। আবু বকর [রা] ভীত শঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ [সা]! তাদের একজন যদি তার পায়ের পাতার দিকে তাকায় তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে।

রাসূল [সা] প্রত্যয়দীপ্ত ভঙ্গিতে উচ্চারণ করলেন : তুমি দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।[২৬] এখানেই রাসূলুল্লাহ [সা]-এর তাওয়াক্কুলের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আর তাহলো একজন মানুষ তার শক্তি ও সাধ্যের মধ্যে যা কিছু আছে তা ব্যয় করবে, যত রকম উপায় উপকরণ ও মাধ্যম আছে তা ব্যবহার করবে, সুষ্ঠু পরিকল্পনা সহকারে অগ্রসর হবে এবং যা তার সাধ্যের বাইরে তা ত্যাগ করে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। কেবল তখনই [নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন] বাণীটি ফলপ্রসূ হবে।

www.pathagar.com

জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করা

জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্ব স্ব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতামত ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ জ্ঞান ও বুদ্ধি দাবি করে, আল কুরআনও আমাদেরকে সে কথা শেখায়। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন : তাঁর সম্বন্ধে যে অবগত আছে তাকে জিজ্ঞেস কর।[২৭]

...মহাবিজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারবে না।[২৮]

...তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর।[২৯]

সুতরাং যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়সমূহ সামরিক [বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেয়া উচিত]। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্থনীতিবিদ, শিল্প বিষয়ে প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে হবে। বদরে রাসূল [সা]ও মুসলিমগণ কুরাইশদের মুখোমুখি হন। কুরাইশরা উপত্যকার শেষ প্রান্তে শিবির স্থাপন করে। রাসূলুল্লাহ [সা] বদরের পানির কূপ থেকে দূরবর্তী মদীনার দিকের প্রান্তে অবস্থান নেন। তাতে কুরাইশরা কূপের পানি ব্যবহারে সুযোগ গ্রহণ করতে পারতো। এ পর্যায়ে সাহাবী আল হাব্বাব ইবন আল মুনযির আল আনসারী [রা] রাসূল [সা]-এর নিকট এসে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্থানে কি আল্লাহকে আপনাকে অবতরণের নির্দেশ দিয়েছেন, যা অতিক্রম করার এবং যেখান থেকে পেছনে থাকার অধিকার আমাদের নেই? নাকি এটা আপনার নিজের সিদ্ধান্ত যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুকে ধোঁকা দেয়া?

রাসূলুল্লাহ [সা] বললেন : না, এ আল্লাহর নির্দেশ নয়, বরং আমার নিজের সিদ্ধান্ত, যুদ্ধ কৌশল ও শত্রুকে ধোঁকা দেয়া। হাব্বাব ইবন আল মুনযির [রা] বললেন :[৩০]

ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা শিবির স্থাপনের উপযুক্ত কোনো স্থান নয়। আপনি লোকদের নিয়ে সম্প্রদায়ের পানির কাছাকাছি চলুন, আমরা সেখানে অবতরণ করবো। তারপর কূপের পেছনে শিবির স্থাপন করবো। সেখানে একটি হাউজ বানিয়ে পানি দিয়ে ভরে ফেলবো। আমরা সেই পানি পান করবো, আর তারা পান করতে পারবে না। রাসূল [সা] বললেন, তুমি একটা চমৎকার কথা বলেছো! বুদ্ধিদীপ্ত হাব্বাব [রা] প্রথম রাসূল [সা]-এর নিকট জানতে চান, তিনি যেখানে অবস্থান নিয়েছেন তাকি আল্লাহর নির্দেশ? যদি তাই হয় তাহলে তো তা বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হবে। আর যদি সেই স্থানটি রাসূলুল্লাহ [সা] নিজে একজন সেনাপতি ও সামরিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সে ক্ষেত্রে হাব্বাব [রা] নিজের একটি ভিন্নমত উপস্থাপন করবেন। কারণ তিনি উক্ত অঞ্চলের একজন বাসিন্দা হিসেবে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। রাসূল [সা] তাঁর মতটি শোনেন এবং সানন্দে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তা গ্রহণ ও সেই মোতাবেক কাজ করেন। রাসূল [সা] হাব্বাবের [রা] মতটি স্বাগত জানান যে ভাষায় তা একটু লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি বলেন : "তুমি একটি কথার মতো কথা বলেছো, অথবা তুমি একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছো।"

এ বছর যুদ্ধে সা'দ ইবন মু'আজ [রা] রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জন্য একটি মঞ্চ তৈরির পরামর্শ দেন, সেখান থেকে তিনি সৈনিকদের সার্বিক কর্মতৎপরতা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সার্বক্ষণিকভাবে দিকনির্দেশনা দেবেন। রাসূল [সা] এই পরামর্শের জন্য সাদকে ধন্যবাদ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেন। আহজাব যুদ্ধের সময় সাহাবী সালমান আল ফারসি [রা] রাসূলুল্লাহ [সা]কে খন্দক

www.pathagar.com

খননের পরামর্শ দেন। তিনি সে পরামর্শ গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করেন। মক্কার পৌত্তলিক যোদ্ধারা ঘোড়া দাবড়িয়ে খন্দকের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে :[৩১]

আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এ এমন এক কৌশল যা আরবরা কখনো অবলম্বন করেনি। এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই যে মুসলিমরা পারস্য, রোম অথবা অন্য যে কোনো জাতির যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করে শত্রুকে পরাভূত করবে। শুধু যুদ্ধ নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি ও কল্যাণের জন্য বিজাতীয় যেকোনো উপায় উপকরণ প্রয়োগ ও কৌশল অবলম্বন করবে। মাধ্যম ও উপায় উপকরণের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিধিবিধান নেই। বিধি বিধান আছে তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

উপকারী ও কল্যাণকর সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান

ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য উপকারী ও কল্যণকর, এমন সকল বিদ্যা শিক্ষার প্রতি রাসূল [সা] তাঁর উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। সে বিদ্যা মুসলিম অমুসলিম যাদের কাছেই থাকুক না কেন, অর্জনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল [সা]-এর একটি বিখ্যাত বাণী উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন :[৩২]

বিজ্ঞতাপূর্ণ কথা মুমিনের হারানো বস্তু। যেখানেই সে তা কুড়িয়ে পাবে, সেই হবে অধিকতর হকদার। একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তিনি বিষয়টি তুলে ধরেছেন। জ্ঞানকে তিনি মুমিনের হারানো বস্তুর সাথে তুলনা করেছেন। হারানো বস্তুটি যেখানেই খুঁজে পাওয়া যাক না কেন, প্রকৃত মালিক তার অধিকতর হকদার হয়ে থাকে। তেমনিভাবে মুমিন ব্যক্তি মুসলিম-অমুসলিম যেখানেই জ্ঞানের সন্ধান পাক সেখান থেকে তা আহরণ করবে। জ্ঞানার্জনের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক এর চেয়ে উত্তম বাণী আর হতে পারে না। কল্যাণকর জ্ঞান যেখানেই পাওয়া যাক তা অর্জন করতে হবে, এ কথা তিনি কেবল মুখে বলেই শেষ করেননি বরং বাস্তবে তা করে উম্মতকে দেখিয়ে দিয়েছেন। বদরযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে কুরাইশ বন্দিদের যারা লেখাপড়া জানতো তাদের মুক্তিপণ ধার্য করেন, প্রত্যেকে দশ জন করে মুসলিম শিশু-কিশোরকে লেখা শেখাবে। এভাবে তিনি বিপুলসংখ্যক মুসলিম শিশু-কিশোরকে শিক্ষিত করে তোলেন। এ প্রসঙ্গে আলী [রা]-এর একটি উক্তি উল্লেখ রাখা যায়। তিনি বলেন :[৩৩]

জ্ঞান হলো মুমিনের হারানো বস্তু। সুতরাং মুশরিকদের নিকট থেকেই হোক না কেন, তোমরা তা গ্রহণ কর। নিরেট বস্তুগত জ্ঞানও অমুসলিমদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই, যদি তা যাদের বা যার নিকট থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে তাদের বা তার চিন্তা বিশ্বাসের প্রতিফলন না ঘটায়। কারণ, বিশ্বচরাচরের সকল প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতির বাধ্যতা মুমিন কাফির এবং সত্যনিষ্ঠ ও পাপী সকলে সমানভাবে মেনে নেয়। এ কারণে অতীতে মুসলিমগণ জাগতিক সকল জ্ঞান, যেমন চিকিৎসা, রসায়ন, জ্যোতর্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি গ্রিক, পারসিক, রোমান, ভারতীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী জাতিসমূহের নিকট থেকে গ্রহণ করতে কোনো রকম কুণ্ঠাবোধ করেনি। তবে দ্বীন, মূল্যবোধ ও আকিদা বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত জ্ঞান যা আল্লাহ, প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে ইসলামী চিন্তা-বিশ্বাসর সাথে সাংঘর্ষিক সে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহ দেয়নি। কারণ, তাতে মানুষের জন্য কোনো কল্যাণ নেই। এ কারণে রাসূল [সা] উমর ইবন আল খাত্তাব [রা]-এর হাতে ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের কপি দেখে

www.pathagar.com

বিরক্তি প্রকাশ করেন। কারণ, তাওরাত মানুষের হাতে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছিল, আল্লাহর কালামের সাথে মানুষের কথা, ধ্যান ধারণা, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তা আর সন্দেহ সংশয়ের ঊর্ধ্বে ছিল না। আর দীনের উৎস তো কেবল সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ঐশী গ্রন্থ। আর তা কেবল আল কুরআন।

ইমাম আহমাদ জাবির ইবন আবদিল্লাহ [রা] থেকে বর্ণনা করেছেন :[৩৪]

আহলি কিতাবের এক ব্যক্তির নিকট থেকে পাওয়া একখানা কিতাব হাতে নিয়ে উমর ইবন আল খাত্তাব [রা] নবীর [সা]-এর নিকট আসেন। নবী [সা] তা দেখে রেগে যান এবং বলেন খাত্তাবের ছেলে! তোমরা কি তোমাদের আকিদা বিশ্বাসের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত? যে জন্য তোমাদের নবী ও কিতাবের বাইরে অন্যদের নবী ও কিতাব থেকে জ্ঞান নিতে চাও। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ, আমি তা তোমাদের নির্ভেজাল ও পরিচ্ছন্নভাবে দান করেছি। তোমরা তাদের নিকট কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না। [জিজ্ঞাসা করলে] তারা হয়তো তোমাদেরকে সত্য তথ্য দেবে, আর তোমরা তা মিথ্যা বলে অস্বীকার করবে, অথবা মিথ্যা তথ্য দেবে, আর তোমরা তা সত্য বলে মেনে নেবে। যাঁর হাতে আমার জীবন সেই সত্তার শপথ! এখন যদি মূসাও জীবিত থাকতেন তাহলে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত তাঁরও কোনো উপায় থাকতো না।

উমর [রা]-এর হাতে তাওরাত দেখে রাগে, উত্তেজনায় রাসূল [সা]-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। অত্যন্ত শক্তভাবে তিনি তার এ কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তা ছিল একটি দ্বীনের বিষয়। আর দ্বীনের কোনো কিছু একমাত্র সত্য সঠিক উৎস ছাড়া অন্য কোথাও থেকে গ্রহণ করা যায় না। তবে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যা মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পর ভিত্তিশীল তা মানবজাতির যৌথ সম্পদ। তা যে কোনো স্থান, যে কোনো পাত্র থেকে গ্রহণ করা যাবে। হোক না জ্ঞান প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের, হোক না তা মুসলিমদের বা মুশরিকের। আমরা রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন থেকে এ শিক্ষা পেয়ে থাকি। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বদরের পৌত্তলিক বন্দিদের জ্ঞানের সাহায্য দেন, তিনি পারস্যের যুদ্ধকৌশল কাজে লাগিয়ে মদীনার চার পাশে খন্দক খনন করেন, তায়িফ অবরোধে 'মানজিনিক' [ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ যা দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা হতো] ব্যবহার করেন, মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে খুতবা দান করেন, যার নির্মাতা ছিলেন একজন রোমান কাঠমিস্ত্রি। খুলাফায়ে রাশিদীনকেও আমরা উম্মতের কল্যাণে এমন সব উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে দেখি যার সাথে আরববাসীর পূর্বে পরিচয় ছিল না। তারা তা অনারবদের নিকট থেকে মানুষের কল্যাণ চিন্তায় গ্রহণ করেন। যেমন উমর [রা] তাঁর কিছু সঙ্গী সাথীর প্রস্তাব ও পরামর্শক্রমে ইতিহাস লেখার চিন্তা ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করেন। অনেক গবেষক তো মত প্রকাশ করেছেন যে, লেখা ও দিওয়ানের সূচনা হয় খোদ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সময়ে। যেমন হিজরতের পর রাসূল [সা] নির্দেশ দেন লিখিতভাবে আদমশুমারি করার জন্য।[৩৫]

ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন

রাসূলুল্লাহ [সা] উম্মতকে স্বচ্ছ সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং সব ধরনের ভ্রান্ত ধারণা বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলে কঠোরভাবে আঘাত করেছেন। তৎকালীন জাহিলি সমাজে এবং অতীতের বহু বিকৃত ঐশীধর্মে যা শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল।

www.pathagar.com

ধর্মের লেবাসধারী বহু মানুষ সেই সকল কুসংস্কারকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড বলে প্রচার করেছে। আর সাধারণ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে তাদের আনুগত্য করেছে। যেমন গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, জাদুকর এবং জ্যোতির্বিদ্যার দাবিদার লোকেরা এই শ্রেণির অন্তর্গত। তারা বিশ্বাস করতো, তারা সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম-রীতি ভঙ্গ করতে, অদৃশ্যের প্রাচীর ভেঙে তা অবগত হতে এবং মানুষের মনের কথা জানতে সক্ষম। এভাবে তারা মানবসমাজে প্রতারণাপূর্ণ বাজার বসিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিতে থাকে।

ইসলামের অভ্যুদয় হলো এবং মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক বাজারের মূলে শক্তভাবে আঘাত করে বন্ধ ঘোষণা করলো। এর ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ীদের প্রতারণার সকল জারিজুরি ফাঁস করে দিলো, তাদের সকল পণ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। সাথে সাথে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ কথা ঘোষণা করলো যে, সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নিয়ম কেউ ভঙ্গ করতে পারে না, অদৃশ্যের জ্ঞান এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই এবং সকল কল্যাণ কেবল আল্লাহর নিয়ম-রীতিসমূহ শ্রদ্ধাভরে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত।

ইমাম বুখারী [রহ] মুগিরা ইবন শুবার [রা] সূত্রে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুগিরা [রা] বলেন: ইবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলো। উল্লেখ্য যে, ইবরাহিম ছিলেন নবী [সা]-এর ছেলে এবং মারিয়া আল কিবতিয়্যা [রা]-এর গর্ভজাত। লোকেরা বলাবলি করতে লাগলো, ইবরাহিমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য রাসূল [সা] ঘোষণা করলেন: সূর্য ও চন্দ্র হলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যকার দু'টি নিদর্শন। না কারো মৃত্যুর জন্য তাদের গ্রহণ হয় আর না জীবনের জন্য।

জাহিলি যুগে মানুষের মনে কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়েছিল যে, কোনো মহান ব্যক্তির মৃত্যু অথবা এ জাতীয় কোনো কিছুর কারণে সূর্য অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হয়। রাসূলুল্লাহ [সা]-এর এই ঘোষণা তাদের এই অন্ধ বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে সমূলে উৎপাটিত করে এবং সাথে সাথে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল করে দেয় যে, চন্দ্র-সূর্য হলো আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির মতো দু'টি সৃষ্টি এবং তারা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম-রীতি অনুযায়ী আবর্তিত হয়। হাদীসের গ্রন্থসমূহে এরূপ ভাব ও অর্থে বহু হাদিস দেখতে পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি হাদিস বা এর অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো : রাসূল [সা] বলেন : তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাহাবায়ে কিরাম [রা] বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কী কী? বললেন : আল্লাহর সাথে শরিক করা, জাদু। আল হাদীস– যে ব্যক্তি একটি গিরা দিলো, তারপর তাতে ফুঁক দিলো, মূলত সে জাদু করলো। আর যে জাদু করে, সে শিরক করে। যে ব্যক্তি কোনো কিছু ঝোলালো, মূলত সে তার ওপর নির্ভর করলো।[৩৬]

অর্থাৎ কেউ যদি নিজ দেহে তাবিজ কবচ মাদুলি বা এ জাতীয় কোনো কিছু এই বিশ্বাসে ঝোলায় যে, তা তাকে কুদৃষ্টি অথবা রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করবে, তাহলে তার ওপরই সে নির্ভর করেছে বলে গণ্য হবে। যে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের জন্য পাখি ওড়ায় অথবা যার জন্য ওড়ানো হয় অথবা যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা যার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, অথবা যে জাদু করে অথবা যার জন্য জাদু করা হয়, তাদের কেউই আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কাহিনী তথা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তাহলে সে মুহাম্মাদ [সা]-এর ওপর যা নাজিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।[৩৭]

www.pathagar.com

যে গণক অথবা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যা এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে তাহলে সে মুহাম্মাদ [সা]-এর ওপর যা নাজিল হয়েছে তা অবিশ্বাস করলো।[৩৮]

যে গণকের নিকট যায়, তার নিকট কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না।[৩৯]

এ ধরনের আরো বহু সহীহ হাদীস, হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কাহিন হলো সেই ভবিষ্যদ্বক্তা যে কিছু গোপন বিষয়ে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় কথা বলতো, যার কিছু সত্য হতো, আর কিছু হতো মিথ্যা। সে এ কথা দাবি করতো যে তার অনুগত জিন আছে, তাকে সে গোপন কথা বলে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে :[৪০]

যে বক্তি তারকারাজি থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করলো, সে মূলত জাদুর একটি শাখা অর্জন করলো। তারপর যা বৃদ্ধি করার তা করলো। তবে জ্যোতির্বিদ্যা ও এই জ্ঞান ভিন্ন। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করা দোষের কিছু নয়। কারণ এ বিদ্যার ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কিয়াস-অনুমান এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার। অতীতে মুসলিম মনীষীরা এ বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আধুনিক যুগে এ বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা হচ্ছে। যার ফলে মানুষ চাঁদ পৌঁছাতে পেরেছে। এই বিদ্যার মধ্যে দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক এবং কুরআন সুন্নাহের ভাবের পরিপন্থী কোনো কিছু নেই।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ [সা] জ্ঞানার্জনের প্রতি মানুষকে যেমন উৎসাহিত করেছেন, ঠিক তার পাশাপাশি জ্ঞানের নামে কুসংস্কার, প্রতারণা ইন্দ্রজাল ইত্যাদিরও মূলোৎপাটন করেছেন।

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা আন নামল ৬৪
২. সূরা আয-যুখরুফ ১৯
৩. সূরা আল আহকাফ ৪
৪. সূরা আন নাজম ২৮
৫. সূরা আননিসা ১৫৭
৬. সূরা আন নাজম ২৩
৭. সূরা সাদ ২৬
৮. সূরা আল কাসাস ৫০
৯. সূরা আল বাকারা ১৭০
১০. সূরা আল আ'রাফ ৩৮
১১. তিরমিযী, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি, হাদিস ২০০৮
১২. সূরা আল আরাফ ১৮৫
১৩. সূরা আয যারিয়াত ২০-২১
১৪. সূরা আলে ইমরান ১৩৭
১৫. সূরা আল জুমআহ ২
১৬. বুখারী, কিতাবুস সাওম
১৭. সূরা আলাক ১-৫
১৮. সূরা আল কালাম ১-২

www.pathagar.com

১৯. ইবন সা'দ, আত তাবাকাত [বৈরুত], খ. ১. পৃ. ১২
২০. মুসনাদু আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৩৭২; আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব; নায়লুল আওতার, খ. ৯. পৃ. ১০৩
২১. আর রাসূল ওয়াল ইলম, পৃঃ ৪৭
২২. সূরা ইউসুফ : ৪৭-৪৯
২৩. নায়লুল আওতার, খ. ৯. পৃঃ ৯২
২৪. আর রাসূলু ওয়াল ইলম, পৃঃ ৫০
২৫. সূরা আর রূম ২-৩
২৬. সূরা আত-তাওবা ৪০
২৭. সূরা আল ফুরকান ৫৯
২৮. সূরা আল ফাতির ১৪
২৯. সূরা আন-নাহল ৪৩
৩০. সিরাতু ইবন হিশাম, খ. ২. পৃঃ ২৭২ঃ আল ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহারা, খ. ১, পৃঃ ৪২৭
৩১. সিরাতু ইবন হিশাম, খ. ১. পৃঃ ২৩৫
৩২. তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, হাদিস ২৬৮৮; ইবন মাজাহ, বাবুজ জুহদ, হাদিস ৪১৬৯
৩৩. জামিউ বায়ান আল ইলম, খ. ১. পৃঃ ১২১
৩৪. আহমাদ আবদুর রহমান আল বান্না, তারতিবুল মুসনাদ, কিতাবুল ইলম, হাদিস-৬২
৩৫. আল কাত্তানি, নিজামুল হুকমাহ খ. ১, পৃঃ ২২৭-২২৮
৩৬. নাসঈ, তাহরিমুদ দাম, হাদিস ৪০৭৯
৩৭. আর রাসূল ওয়াল ইলম, পৃ. ৫৯
৩৮. ইবন মাজাহ, কিতাবুত তাহারাহ, হাদিস ৬৩৯ঃ আবুদাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদিস ৩৯০৪; তিরমিযী, কিতাবুত তাহারাহ, হাদিস ১৩৫
৩৯. মুসলিম, বাবুস সালাম, হাদিস ২২৩০
৪০. আবু দাউদ, কিতাবুত তিব্ব, হাদিস ৩৯০৫; ইবন মাজাহ, কিতাবুল আদাব হাদিস ৩৭২৬; মুসনাদু আহমাদ, খ. ১. পৃঃ ৩১১

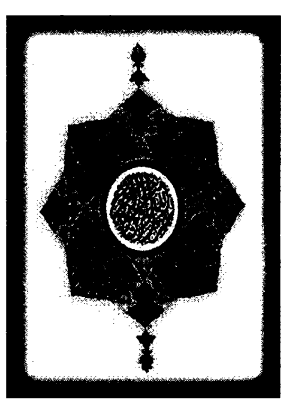

www.pathagar.com

ভাষাচর্চায় মহানবী [সা]-এর আদর্শ

এ জেড এম শামসুল আলম

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে মহান আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির জন্য কল্যাণ ও সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রচারক হিসেবে তিনি ছিলেন মুসলমানদের আদর্শ। কিন্তু পিতা হিসেবে, স্বামী হিসেবে, সুরুচিশীল ও সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন ধর্ম-মত-নির্বিশেষে ইহুদি-নাসারা, কাফের, পৌত্তলিক– সবারই আদর্শ। তাঁর ব্যবহার, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চালচলন যেকোনো রুচিশীল ও সুন্দর জীবন-যাপনে আগ্রহী ইহুদি-নাসারা-কাফিরেরই অনুকরণীয় ছিল।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বজনীন আদর্শ

আজকাল যেমন আমরা মুসলমান হয়েও পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, সংস্কৃতিতে হিন্দু বা খ্রিস্টানদের অনুকরণ করতে চাই, রাসূল [সা]-এর সময় ইহুদি-নাসারা-পৌত্তলিক আরবরা আমাদের রাসূল [সা]-কে রুচি, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য চেতনার মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, নামাজ-রোজার ব্যাপারে আমাদের ওলামায়ে কেরাম, ইমাম সাহেবান, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা রাসূল [সা]-এর আদর্শ মানুষের সামনে তুলে ধরতে যতটুকু সচেষ্ট, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রিয় নবীকে রুচিশীল ও সংস্কৃতিবান শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরতে ঠিক ততটুকু অমনোযোগী। ফলে, ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ও সংস্কৃতিতে অনেকে হিন্দু, খ্রিস্টান ও পাশ্চাত্যের অনুসারী।

ভাষা সম্বন্ধে রাসূল [সা]-এর আদর্শ আমাদের সামনে কী? হযরত মুহাম্মাদ [সা]-কে আল্লাহ শিশুকাল থেকে নবুওয়তের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

জ্ঞানের অনুপ্রেরণা : রাসূল [সা] এমন কথা বলতেন না, যা তিনি নিজে করতেন না। কিন্তু এই সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ছিল একটিমাত্র ক্ষেত্রে। তা হলো– সাক্ষরতা অর্জন।

বদরের যুদ্ধে একেকজন বন্দির মুক্তির শর্ত ছিল, তারা অন্তত দশজন নিরক্ষর মুসলিমকে লিখতে ও পড়তে শিক্ষা দেবেন। জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দিয়ে যত নির্দেশ বিশ্বনবী [সা] জারি করেছেন, দুনিয়ার অন্য কোনো ধর্মনেতা তা করেননি। কিন্তু তিনি নিজে নিরক্ষর বা উম্মি ছিলেন। এ এক রহস্য। তা-ই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা।

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষক ছিলেন আল্লাহ নিজে। আল্লাহর সৃষ্টি ছিল তাঁর পাঠের উপরকণ। তিনি আল্লাহর সৃষ্টি দেখতেন, নিরীক্ষা করতেন, গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ ব্যতীত রাসূল [সা]-এর অন্য কোনো শিক্ষক থাকবে, তা আল্লাহর অভিপ্রেত ছিল না। যিনি হবেন মানবতার শিক্ষক, তাঁকে হতে হবে ত্রুটিশূন্য। মানুষের মধ্যে এমন কোনো শিক্ষক হতে পারেন না যিনি ত্রুটিহীন। আমাদের নবীর পুত্র ছিল, কন্যা ছিল, বন্ধু ছিল, সহযোগী ছিল, শত্রু ছিল। কিন্তু কোনো শিক্ষক ছিল না। রাসূলকে উম্মি বা নিরক্ষর রাখার হাকিকত আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন। আল্লাহ তাঁর রাসূল [সা]-কে নিরক্ষর উম্মি নবী বলে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নিরক্ষর থাকুন এটাই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। এই উম্মি নবীর ভাষাজ্ঞান কেমন ছিল?

যুগনায়ক

যুগের সবচেয়ে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সমকালীন শিক্ষকশ্রেণি অপেক্ষা উন্নততর হওয়া নবীদের সুন্নত। আল্লাহর নবীরা ছিলেন নিজ নিজ যুগের সবচেয়ে প্রগতিশীল ও আধুনিক মানুষ। তা না হলে অন্যেরা তাদের আদর্শ অনুকরণীয় হিসেবে গ্রহণ করবেন কেন? আল্লাহ নবীদের ওই সব গুণে ভূষিত করেই পাঠিয়েছেন, যে গুণাবলিতে সে জামানার লোকেরা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

দাউদ [আ]-কে আল্লাহ এমন কণ্ঠ ও সুমধুর সুর দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি যখন আল্লাহর কালাম পাঠ করতেন এবং লোকেদের আল্লাহর পথে আহ্বান করতেন, তখন শুধু মানুষ কেন, জমিনের জীবজন্তু ভিড় জমাতো, আকাশের উড়ন্ত পাখিও নেমে আসত।

ব্যাবিলন, এশিরিয়া, লিডিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে অত্যধিক ধনশালী হয়ে উঠেছিলেন। কারুনের অর্থসম্পদ তো উপকথায় পরিণত হয়েছিল। নেবুচাঁদ নেজার, ফেরাউন, সাদ্দাদ, নমরুদের অর্থসম্পদ ও রাজক্ষমতায় তখন মানুষ ছিল বিমুগ্ধ ও হতবাক। আল্লাহ হযরত সুলায়মান [আ]-কে পাঠালেন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ঐশ্বর্যশালী সম্রাট করে। হযরত মূসা [আ]-এর যুগে মিসরীয়রা জাদুবিদ্যায় ছিল অত্যধিক পারদর্শী। জাদুর মধ্যে সর্বপ্রধান ও সবচেয়ে ভীতিপ্রদ জাদু ছিল সাপ বানানো। মূসা [আ]-কে আল্লাহ দিলেন লাঠিকে সাপ বানানোর ক্ষমতা।

হযরত ঈসা [আ]-এর যুগে গ্রিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল বিশ্বে অতি উন্নত। ইউনানি বা গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু সে যুগে নয়, এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও অনুভূত এবং সুস্পষ্ট। রোগ নিরাময় করার মাধ্যমেই ছিল সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম বিকাশ। তাই আল্লাহ ঈসা [আ]-কে দিলেন হাতের স্পর্শে অন্ধকে দৃষ্টিদানের ক্ষমতা, খঞ্জকে পদদান, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময়, এমনকি মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা।

আরবদের ভাষণ উৎকর্ষ

রাসূলে করিম [সা]-এর যুগে আরবে ভাষা ও কবিতাচর্চা উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আরবি ভাষায় একেকটি শব্দের যত প্রতিশব্দ আছে, বিশ্বের অন্য কোনো ভাষায় তদ্রূপ নেই। এক 'ঘোড়া' শব্দটিরই শোনা যায় ৯০০ প্রতিশব্দ ছিল। আরবীয়রা ছিলেন স্বভাবে কবি। সাবয়া মুয়াল্লাকা কালোত্তীর্ণ হয়ে আজো শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর চেয়ে চমকপ্রদ কাহিনী বিশ্বের কোনো ভাষায় আজো সৃষ্টি হয়নি।

নবী-পরিবারের লোকেরা কবি স্বভাবের ছিলেন। নবী [সা]-এর মৃত্যুতে বিবি আয়েশা [রা] ও বিবি ফাতেমা [রা]-এর বিলাপ কালোত্তীর্ণ শোকগাথায় পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মচারীকে লেখা হযরত আলী [রা]-এর একেকটি পত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের স্বাক্ষর বহন করে।

www.pathagar.com

বিশ্বগ্রন্থ আল কুরআন

আল্লাহ রাসূলের প্রতি নাজিলকৃত গ্রন্থ আল-কুরআন শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, আরবি ভাষার উজ্জ্বলতম সাহিত্য। বিশ্বের আর কোনো গ্রন্থ নেই, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করা হয়। ছন্দের মিল থাকলে ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে কোনো ছড়া মুখস্থ করা যত সহজ হয়, ছন্দহীন গদ্য কাব্য মুখস্থ রাখা তত সহজ নয়। ছন্দ-মাধুর্যের জন্যই কুরআন মুখস্থ করা সহজতর হয়েছে।

আরব দেশে অনেক খ্রিস্টান কুরআন তিলাওয়াত করে বা শ্রবণ করে দিনের কর্মসূচি শুরু করে। কারণ তাতে মানসিক প্রশান্তি আসে। আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে। আরবেরা কিন্তু তা উপভোগ করেন। আরব দেশে একাধিক রেডিও স্টেশন আছে, যা থেকে দীর্ঘ সময় শুধু কুরআন তিলাওয়াতই প্রচার করা হয়। কায়রোর একটি রেডিও স্টেশন থেকে দিন-রাত সব সময় শুধু কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, আর কিছু না কিছু লোক তা শোনে।

সূরা আর রহমানের ছন্দ-মাধুর্যের কথা বাদই দেয়া যাক। সূরা ফাতিহা একজন মুসলমান জীবনে কতবার পাঠ করেন? কেউ কি কখনো সূরা ফাতিহা পড়ে ক্লান্ত হয়েছেন? বোধ হয় না। এর কারণ শুধু যে অন্তর্নিহিত বাণী তা নয়, এতে রয়েছে কাব্যসুধা– এ অমৃতের নেশা কাটে না।

বিশুদ্ধভাষী নবী [সা]

কাব্যানুরাগী আরব সমাজে আবির্ভূত নবী মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও শুদ্ধভাষী। নবী করিম [সা] শুধু শুদ্ধ ভাষায় নয়, বরং বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। সারা জীবনে তিনি একটি মিথ্যা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। আর সারা জীবনে বিশ্বনবী একটি অশুদ্ধ শব্দ বা বাক্যও উচ্চারণ করেননি। শিশুকালেও আমাদের নবী শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর শুদ্ধ উচ্চারণ শুনে লোকজন আশ্চর্য হতেন। জিজ্ঞেস করতেন, ছেলেটি কোন পরিবারের। আমাদের মহানবী [সা] কথায়, আচরণ ও পোশাকে পবিত্র, পরিছন্ন ও বিশুদ্ধ থাকা পছন্দ করতেন। তাঁর জামাকাপড়ে কোনো দিন কেউ কোনো দাগ দেখেনি। তাঁর পোশাক তাঁর চরিত্রের মতোই নিষ্কলঙ্ক ছিল।

মহানবীর বাচনভঙ্গি

ভাষায় বিশুদ্ধতা ও উচ্চারণে স্পষ্টতা ছিল নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কথা এমন স্পষ্ট ছিল যে, যারা তাঁর কাছে বসে থাকতেন, তারা তাঁর কথা শুনে মুখস্থ করতে পারতেন, লিখে নিতে পারতেন। হাদিস সেভাবে হয়েছে। তিনি বলেছেন, অন্যরা লিখেছেন।

তখনকার দিনে কাগজ-পেনসিল সহজলভ্য ছিল না। এত অসুবিধা সত্ত্বেও রাসূলে করিম [সা]-এর বাক্য এমনভাবে উচ্চারিত হতো বা বলা হতো, যাতে অন্যরা তা লিখে নিতে পারতেন। তিনি দ্রুত বাক্য বলতেন না। তাঁর কথা বলার ধরন এমন ছিল যে, শুধু প্রতিটি বাক্য নয়, প্রতিটি অক্ষরও অন্যরা বুঝতে পারতেন। আইন ও হামজার মধ্যে পার্থক্য আছে। পুরো বাক্যের মধ্যে কোনো অক্ষরটা উচ্চারিত হচ্ছে, তা শ্রোতারা স্পষ্ট ধরতে পারতেন।'

অর্ধেক কথা মুখের ভেতরে, বাকি অর্ধেক মুখের বাইরে– এভাবে কথা মহানবী [সা] বলতেন না। কথা বলার উদ্দেশ্য অন্যের কানে তা পৌঁছে দেয়া। কথা বলার সময় আস্তে কথা বলা হলে অন্যের বুঝতে কষ্ট হয়। অন্যকে কষ্ট দেয়া অসুন্দর আচরণ ও বেয়াদবি। ইলমুল কিরাত বা

www.pathagar.com

মাখরাজ কীভাবে পেলাম? আরবি ধ্বনিবিজ্ঞান অতি উন্নত। এর উৎস কী? এর উৎস হলো সুন্নাহ। কারণ, রাসূল [সা] শুদ্ধভাবে কথা বলতেন। স্পষ্ট উচ্চারণ করতেন।

ভাষণভঙ্গি

আল্লাহর নবী [সা]-এর ভাষণপদ্ধতি এমন ছিল যে, যত বড় মাহফিল হতো তাঁর স্বর তত উচ্চ হতো। কথা বলার সময় তিনি স্বর তত উচ্চ করতেন, যাতে সবচেয়ে পেছনে যিনি বসে আছেন তার মনে হতো যে, নবী করিম [সা] তার সামনে বসে কথা বলছেন।

তিনি দুই-চারজনের সামনে কথা বলেছেন আর আরাফাত ময়দানের লাখো লোকের মাঝে বক্তৃতা করেছেন। তখন মাইক ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর কোনো কথা বোঝেননি এমন লোক ছিল না। যেসব গুণ একটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে, তার মধ্যে রয়েছে শুদ্ধ ভাষণ ও স্পষ্ট উচ্চারণ।

শুদ্ধ ভাষার সুন্নাহ

আমাদের নবী [সা] তাঁর মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলতেন এবং স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন। মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে বলা আমাদের নবীর সুন্নাত। দাড়ি না রাখলে একটা সুন্নাতের বরখেলাফ করা হলো। অনুরূপভাবে একটি অশুদ্ধ শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করলাম মানে সুন্নতের একটি খেলাপ করলাম। আমাদের অনেকে মুখ খুললেই সাথে সাথে সুন্নতের বরখেলাফ শুরু করি।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, আরবি অশুদ্ধ বলা সুন্নতের বরখেলাফ। অন্য ভাষা অশুদ্ধ বলা সুন্নতের বরখেলাফ নয়। এটা কিন্তু ভুল। আমাদের নবী [সা] ডান হাত দিয়ে খেজুর খেয়েছেন। যদি কেউ বলেন, বাম হাত দিয়ে খেজুর খাওয়া সুন্নতের বরখেলাফ, কিন্তু আম আর লিচু বাম হাত দিয়ে খাওয়া সুন্নতের বরখেলাপ নয়, তা ভুল হবে।

শুদ্ধ ভাষণ ও দাওয়াত

শ্রোতাদের ওপর বক্তৃতার প্রভাব অনস্বীকার্য। জনগণকে বোঝাতে হবে মাতৃভাষায়, শুদ্ধ ও সুন্দর উচ্চারণে। বড় নেতাদের একটা বড় গুণ হলো সুন্দর বক্তৃতা দেয়ার দক্ষতা। ভাষার ওপর দখল থাকলে বক্তব্যের প্রভাব শ্রোতার ওপর অনেক বেশি হয়। মাতৃভাষার ওপর দখল না থাকলে ভালো বক্তা হওয়া যায় না।

মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব

মুসলিম জীবনে আলেমদের প্রভাব প্রচণ্ড ও অত্যন্ত গভীর। আরবীয়, ইরানি, তুর্কিরা তাদের মাতৃভাষার চর্চা যতটুকু নিষ্ঠার সাথে করতে পারেন, আমরা অবচেতন মনের সংস্কারের ফলে ততটুকু পারিনি।

রাসূল [সা] মাতৃভাষায় একটি অশুদ্ধ বাক্য সারা জীবনে উচ্চারণ করেননি। পরম পরিতাপের বিষয়, লাখ লাখ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সারাক্ষণ মাতৃভাষা শুদ্ধ বলেন এরকম হাজার হাজার আলেম সারা বাংলায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। দুঃখের বিষয়, শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার সুন্নত আমরা দীনদার মুসলমানরা অনেকেই পালন করি না। এ অবস্থার নিরসনকল্পে ওলামায়ে কেরাম ও ইমাম সাহেবদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধিকতর উৎসাহী হতে হবে।

www.pathagar.com

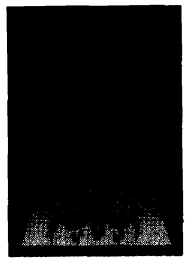

মহান আল্লাহর আইন : বিবিধ প্রসঙ্গ

ডক্টর আ. ছ. ম. তরীকুল ইসলাম

মহান আল্লাহ হচ্ছেন মানুষের স্রষ্টা। মাখলুক হিসেবে মানুষের রয়েছে অসংখ্য দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা। তন্মধ্যে অন্যতম সীমাবদ্ধতা হচ্ছে তার জ্ঞানের স্বল্পতা। মহান আল্লাহর বাণীতে এই বাস্তবতাই ঘোষিত হয়েছে "এবং তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।" [আল-কুরআনুল করীম ১৭:৮৫] স্বতঃসিদ্ধ এই কথাটির প্রমাণ পাওয়া যায় মানবজাতির জ্ঞানের পরিধি পরিমাপের মাধ্যমে। অতীতের কিছু কিছু বিষয় তারা মনে রাখতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বর্তমান সম্পর্কে তার ধারণা খুবই সীমিত। তার এই সীমিত জ্ঞান দিয়ে সর্বকালের সর্বযুগের উপযোগী সর্বজনীন আইন প্রণয়ন সম্ভব নয়। সে জন্য মানবরচিত আইন মূলত হয় অসম্পূর্ণ, অসামঞ্জস্যশীল, সর্বকালের অনুপযুক্ত। উক্ত আইন মানুষের জন্য হয়তো সাময়িক মঙ্গলজনক হলেও অদূর ভবিষ্যতে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে উদ্ভাবিত হলো সমাজতন্ত্র। ক'দিন যেতে না যেতেই তা যে মানবতার মুক্তির জন্য ব্যর্থ, সেই কথাটি প্রমাণিত হলো। এ কারণেই মানুষের জন্য সর্বময় জ্ঞানী, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন, সেই বিজ্ঞ অভিজ্ঞ মহান শক্তিধর স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাদের জন্য একটা সর্বজনীন আইন প্রণয়নই ছিল বাস্তবতার অনিবার্য দাবি। মহামহিম রাব্বুল আলামিন তাই মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য কালোত্তীর্ণ এক চূড়ান্ত আইন প্রণয়ন করলেন, যার বাস্তব রূপই হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। অবশেষে এটাকে তিনি তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণতা দান করলেন। মহান আল্লাহর এই আইনের ধরন, প্রকৃতি, সফলতা; বিশেষ করে মানব সমাজে এর প্রয়োগ না থাকার কারণে সমগ্র পৃথিবীতে এ বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা, অনাচার, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি দিকনির্দেশই হচ্ছে এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

আইন প্রণয়নের অধিকার

ইসলামী আইন সমগ্র পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য। ভৌগোলিক সীমারেখা, বর্ণ, ভাষা, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতির পার্থক্য চুরমার করে কিয়ামত পর্যন্ত যে মানুষই পৃথিবীতে আসবে তাদের সকলের জন্যই এ আইন উপযুক্ত। বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন এই আইন বিশ্বনিখিলের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকেই প্রণয়ন হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। এই আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র আধিপত্য শুধু তার জন্যই নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, সে জন্য আইন প্রণয়নের এই

www.pathagar.com

গুরুদায়িত্বটি মহান আল্লাহই এককভাবে গ্রহণ করেছেন। এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেই মহান সত্তা ব্যতীত অন্য কারো কোনো অধিকার রাখা হয়নি। ঘোষিত হয়েছে, "কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ।" [আল কুরআনুল কারীম ৬ : ৫৭] অন্যত্র বলা হয়েছে, "বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি অন্য কারো ইবাদত না করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" [আল কুরআনুল কারীম ১২:৪০]

বর্ণিত হয়েছে, "শুরায়হ ইবন হানি তার পিতা হানি হতে বর্ণনা করেছন যে, তিনি যখন রাসূল [সা]-এর নিকট প্রতিনিধি হয়ে গেলেন তখন তারা হানিকে আবুল হাকাম [বিধানদাতা] কুনিয়াতে অভিষিক্ত করছিলেন, সেই সময়ে রাসূল [সা] তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহই বিধানদাতা, আর বিধান তাঁর থেকেই; সুতরাং কেন তোমাকে বিধানদাতা বলা হয়?" [আল মুসতাদরাক আলাসসাহিহায়িন, ১ খণ্ড পৃ; ৭৫]

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত যে অন্য কারো কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়, তার স্পষ্ট প্রমাণও রয়েছে রাসূল [সা]-এর জীবনে। তিনি এক সময় বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত কিছুকে হারাম করে নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিষয়ে মহান আল্লাহ ছাড় দিলেন না। প্রতিবাদ করে আয়াত অবতীর্ণ করলেন।

এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূল [সা] তার এক স্ত্রীর ঘরে উম্মি ইবরাহিমের সাথে মিলিত হলে তার উক্ত স্ত্রী তাকে বললেন, হে রাসূল [সা]! আমারই ঘরে আমারই বিছানায় সেই কাজ! তখন রাসূল [সা] উম্মি ইবরাহিমকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণা করলেন। তার উক্ত স্ত্রী তাকে বললেন, হে রাসূল [সা]! আপনি কীভাবে আপনার ওপর যা হালাল ছিল তা হারাম করছেন? তখন তিনি তার সম্মুখে তার সাথে মিলিত না হওয়ার জন্য শপথ করলেন। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অবতীর্ণ করলেন, "হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা কেন নিষিদ্ধ করছ? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ।" [তাফসিরুত তাবারি, ১২ খণ্ড পৃ: ১৪৭] সুতরাং আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র অধিকারী। এতে সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের কোনো কিছুই ইসলামে স্বীকৃত নয়। তবে কখনো কখনো রাসূল [সা] তার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েও আইন প্রণয়নের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

আল্লাহর আইনের উৎস

মূলত আল্লাহর আইনের উৎস হচ্ছে দু'টি। একটি হচ্ছে অহি মাতলু অর্থাৎ ওই অহি যা মহান আল্লাহর ভাষায়ই কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অহি গায়রি মাতলু অর্থাৎ যা আল্লাহরই নির্দেশনা হবে তা আল্লাহর ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে রাসূল [সা]-এর ভাষায় না হয় তার সিদ্ধান্ত ও কর্মকাণ্ডের আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এটির নাম হচ্ছে সুন্নাতুর রাসূল [সা]। সুতরাং মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও অকাট্য সুন্নাহ দু'টিই আল্লাহর আইন হিসেবে গণ্য। এই বাস্তব সত্যই ফুটে উঠেছে রাসূল [সা]-এর ভাষায়। রাসূল [সা] বলেন, "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।" [মুয়াত্তা, মালিক, মিসর তা.বি. ২ খণ্ড, পৃ; ৮৯৯]

ইসলামের মানদণ্ডে আল্লাহর আইন

ইসলামের মূল দর্শন হচ্ছে একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা। সেই আলোকে মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের অনুসারী হওয়া ও যথাসম্ভব তা প্রয়োগ করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরিহার্য।

www.pathagar.com

আল্লাহর আইন মানা মূলত তার ইবাদতেরই শামিল। ইবাদত যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশে করা শিরক, তেমনি আল্লাহর আইন বাদে অন্য আইন মানাও শিরক।

একইভাবে রাসূল [সা] আল্লাহর আইন উপেক্ষা করে ধর্মযাজকদের প্রণীত আইন মানাকে ধর্মযাজকদের ইবাদত নামে উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে, রাসূল [সা] যখন সূরা তাওবার ৩১ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, আদ্দি ইবন হাতিম বললেন, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। তখন রাসূল [সা] বললেন, তারা আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা কি হারাম আর তিনি যা হারাম করেছেন তা কি হালাল করে না? তিনি বলেন, অবশ্যই। রাসূল [সা] বললেন, এটাই তাদের ইবাদত।

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'নবী [সা] বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই এখানে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের উদ্দেশে সালাত আদায় করা, সিয়াম পালন করা এবং তাদের নিকট দোয়া করাকে ইবাদত গণ্য করা হয়নিঃ বরং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করাকেই তাদের ইবাদত করা বলে গণ্য করা হয়েছে।' সুতরাং ইবাদত যেমন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন বৈধ নয়, তেমনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রণীত আইন মান্য করা ও প্রয়োগ করার মাধ্যমে তাদের ইবাদত করাও বৈধ নয়। এ কারণেই আল্লাহর আইন যাদের প্রয়োগ করার সুযোগ থাকার পরও প্রয়োগ করে না, তাদেরকে কুরআনের ভাষায় কাফির, জালিম ও ফাসিক বলা হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ প্রণীত আইনকে উপেক্ষা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ বলে বিবেচিত।

আল্লাহ প্রণীত আইনের শাসনকে লঙ্ঘন আল্লাহদ্রোহী তাগুতের আইন মানারই শামিল। আর তাগুতের আইন মানা হচ্ছে গুমরাহির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার নামান্তর। ঈমান আনার পর এই অবান্তর কাজকে আল কুরআনে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে।

এ আয়াতে মুসলমান হিসেবে দাবিদার হয়েও মানবরচিত আইন যারা প্রয়োগ করে তাদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। ইমাম ইবন তায়মিয়্যাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যারা পরিপূর্ণ কিতাবের ওপর ঈমান আনার দাবি করে তবে কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে বিচার ফয়সালা করে না এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে কোনো বড় আল্লাহদ্রোহীর নিয়মনীতির আলোকে বিচার ফয়সালা করে আল্লাহ তাদেরকে এখানে তিরস্কার করেছেন। [মাজমু ফাতা, ইবনে তায়মিয়্যা, ১২ খণ্ড পৃঃ ৩৩৯-৩৪০]

আল্লাহর আইন প্রয়োগ যে ইবাদত হিসেবেই গণ্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় একজন মনীষীর উক্তিতে তা ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা না করে শুধুমাত্র তারই বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা আল্লাহরই ইবাদত করারই নামান্তর।' সুতরাং আল্লাহ প্রণীত আইন প্রয়োগ ইবাদত হিসেবেই গণ্য। মানবপ্রণীত আইন প্রয়োগ কঠোর অপরাধ বলে বিবেচিত– শিরকের নামান্তর। এমনকি মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহর আইন প্রয়োগ হলে তার নিকট আত্মসমর্পণ না করলে মুমিন না থাকার হুঁশিয়ার বাণীও উচ্চারিত হয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর আইনের প্রয়োগ ও আল্লাহর আইনের ফয়সালা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নেয়াই হচ্ছে ঈমানের অংশবিশেষ। মুমিন থাকতে হলে এর বিরোধিতা কখনো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে ডক্টর আব্দুল আজীব আলি আব্দুল লতিফ বলেন, ঈমানের জন্য যেহেতু মহান আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা অনিবার্য শর্ত, সেহেতু আল্লাহদ্রোহী ও জাহিলি বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা ঈমানের পরিপন্থী।

আল্লামা সা'আদি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, ঈমানের দাবিই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহর বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করা, সুতরাং যে নিজে মুমিন হওয়ার দাবি করে আবার আল্লাহদ্রোহী বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালাকে অগ্রাধিকার দেয়, সে মূলত মিথ্যুক। এমনকি আল্লাহর আইন প্রয়োগ না করাকে সরাসরি কুফরি বলা হয়েছে। এই কারণে আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসূল [সা] খুব কঠোর ছিলেন। এ বিষয়ে তার নির্দেশ হচ্ছে, "নিকটের ওপর বর্তাক বা দূরের ওপর বর্তাক, আল্লাহর নির্ধারিত সাজা কার্যকর করা, আল্লাহর ব্যাপারে কোনো তিরস্কারকারীকে মূল্যায়ন করো না।" [ইবন মাজাহ, ২ খণ্ড পৃ: ৮৩]

আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাসূল [সা] ছিলেন আপসহীন। তাকে বিশেষ ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন প্রয়োগ না করার জন্য তার একান্ত প্রিয়পাত্র উসামাহ ইবন যায়িদ সুপারিশ করলে তিনি শক্ত ভাষায় তার প্রতিবাদ করে বলেন, "তুমি আল্লাহর সাজা কার্যকর করার ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং খুতবাহ দিলেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তাদের পূর্ববর্তীরা এই জন্য ধ্বংস হয়েছে যে যখন তাদের সন্তানরা চুরি করত তারা তাদেরকে ক্ষমা করে দিতো আর দুর্বলরা যখন চুরি করত তাদের ওপর সাজা কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা যদি চুরি করত আমি তার হাত কেটে দিতাম।" [বুখারী, ৩ খণ্ড পৃ: ১২৮২]

অন্য একটি হাদিসে আল্লাহর আইন প্রয়োগের আরো গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

রাসূল [সা] বলেছেন, 'একটি জনপদে সাজা কার্যকর করা সেই জনপদের অধিবাসীদের জন্য সেখানে চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়ার চেয়ে উত্তম।' [ইবন মাজাহ, ২ খণ্ড পৃ. ৮৩]

সুতরাং মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের প্রয়োগ কোনোক্রমেও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। এমনকি মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্যও হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রণীত আইনের প্রয়োগ। আল্লাহর আইন প্রয়োগের অপরিহার্যতা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এর অনিবার্য শিক্ষাটি হচ্ছে, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রতি যার সামান্যতমও ঈমান রয়েছে, আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার অবহেলা করা কোনোক্রমেও বাঞ্ছনীয় নয়।

মহান আল্লাহর আইনের ব্যাপ্তি

মহান আল্লাহ প্রণীত আইন যেমন বিশ্বজনীন তেমনি মানবজীবনে এর ব্যাপ্তিও অসীম।

মানজীবনের যতগুলো দিক রয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে এই আইনের বিস্তৃতি। এই আইন শুধু ব্যক্তিজীবনের ধার্মিক দিককে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় না। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিচার, শিক্ষা, শ্রম, অর্থ– মোটকথা মানবজীবনের সার্বিক দিক এই আইনের অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্য সালাত আদায় করা, জাকাত প্রদান করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন আল্লাহ প্রণীত আইন প্রযোজ্য তেমনি বৈবাহিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক লেনদেন, বিচারকার্য সম্পাদন, রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আল্লাহ প্রণীত আইন প্রয়োগকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। এই ব্যাপকতার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় মহান রাব্বুল আলামিনের বাণীতে।

www.pathagar.com

কোনো বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নয় বরং যে কোনো বিষয়েই তোমাদের মতবিরোধ হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্য আল্লাহ প্রণীত আইনই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং বিশেষ কোনো বিষয় নয় বরং সকল বিষয়কে কেন্দ্র করেই আল্লাহর আইন আবর্তিত হয়েছে।

অন্য আয়াতে রাসূল [সা]-কে সকল বিষয় আল্লাহ কর্তৃক নাজিলকৃত আইন প্রয়োগের স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোনো বিশেষ দিকে আইন প্রয়োগের কথা বলা হয়নি। বরং সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগের নির্দেশ এসেছে। সুতরাং আল্লাহর আইনের পরিসর অসীম। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয়। আরো ইরশাদ হচ্ছে, "আমি এই কিতাবে কোনো কিছু লিখতেই ছাড়িনি। [আল কুরআনুল কারীম ৬ : ৩৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল কুরআন তথা আল্লাহর আইনের ব্যাপকতা সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ [রা] বলেন, এই কুরআনে আল্লাহ আমাদের জন্য প্রতিটি বিদ্যা এবং প্রতিটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ [রহ] বলেন, প্রতিটি হলাল ও হারাম। সুতরাং আল্লাহর আইনকে সঙ্কুচিত করার কোনো সুযোগ নেই।

সে জন্য বাস্তবতার নিরিখে, নিরপেক্ষভাবে ইসলামী আইন ও ইসলামী অনুশাসনের ব্যাপকতা নিয়ে সন্দেহ সংশয়ের কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে যারা এরূপ সীমাবদ্ধতার অভিযোগ ওঠায়, তারা মূলত হয় না বুঝে, অন্যথায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই এই মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়। তারা বলে থাকে, ইসলাম আধ্যাত্মিকতারই নাম। শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়েই এর ব্যাপ্তি। সমাজজীবনে ও অন্য কোথাও এর পদচারণা নেই। মানবাত্মার সংশোধনই এর একমাত্র কাজ। ইসলামের বিচারব্যবস্থা, সামাজিক নিয়ম-নীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, ব্যবসানীতি, কৃষিনীতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে যারা ন্যূনতম খোঁজখবর রাখে, ইসলামের দুশমনদের পূর্বোল্লিখিত ধারণা যে কত বড় ডাহা মিথ্যা, তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং আল্লাহর আইন সীমাহীন ও বিস্তৃত।

মহান আল্লাহর আইন প্রয়োগের দায়দায়িত্ব

প্রতিটি মুসলমানই তার ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর আইনকে নিজেই প্রয়োগ করতে বাধ্য। এ ছাড়া অন্যান্য যারাই যে পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাদেরও সেই পর্যায়ে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। যিনি পরিবারের কর্তা তাকে পরিবার সংক্রান্ত আল্লাহর আইন, যিনি বিচারক তাকে বিচার সংশ্লিষ্ট আল্লাহর আইন, যিনি সেনাপতি, তাকে যুদ্ধ সম্পর্কিত, যিনি রাষ্ট্রনায়ক, তাকে রাষ্ট্রবিষয়ক; মোটকথা যিনি যে ময়দানের দায়িত্বে, তাকে তার ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন প্রয়োগ অপরিহার্য। তাকে তার নিজস্ব দায়িত্বের গণ্ডিতে আল্লাহর আইন প্রয়োগের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল [সা]-এর স্পষ্ট উক্তি হচ্ছে, "সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল, তোমাদের দায়িত্বে দেয়া সব বিষয়ে তোমাদেরকে জবাবদিহিতা করা হবে।" [সহীহ মুসলিম, বায়রুত, তাবি, ৩ খণ্ড পৃ: ১৪৫৯]

এই হাদিসটিতে সাধারণ জবাবদিহিতার কথা বলা থাকলেও ইসলামে আল্লাহর আইন প্রয়োগ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতু এ দিকটিও এ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। সেই জন্য কোনো বিশেষ দিককে উল্লেখ না করেই, যে কোনো বিষয়েই কেউ আল্লাহর আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হলে, আল কুরআনে তাদের ব্যাপারে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

তাদেরকে কাফির, জালিম ও ফাসিক বলে শক্ত ভাষায় গালি দেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানই তার অবস্থানে থেকেই আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেয়া হয়নি। সে জন্য যে সমস্ত মুসলমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আইন প্রয়োগ করেন না, কুরআনের ভাষায় তাদের অবস্থান কোথায়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব তাদেরই ওপর বর্তায়। প্রতিটি মুসলমানের দ্বীনের অনিবার্য এই অংশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।

সমালোচনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আইন

ইসলামের শত্রুদের ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে আল্লাহর আইন প্রয়োগ নিয়ে তাদের ছোটখাটো অভিযোগ থাকলেও বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন তথা দণ্ডবিধি প্রয়োগ নিয়ে ইসলাম ঐসব শত্রুপক্ষের বিদ্বানদের কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়ে আসছে। এর বাইরে আরো দণ্ডবিধি থাকলেও আল কুরআনে ছয় প্রকারের অপরাধের দণ্ডবিধি উল্লেখ হয়েছে। অবৈধ মানুষ হত্যা, ডাকাত, অপবাদ, ব্যভিচার, চুরি ও বিদ্রোহী। মানবাধিকারের দোহাই তুলে ইসলামী এসব দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে তাদের সমালোচনার ভাষাকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন ড. আল আশকার। তা হচ্ছে, 'ইসলামের দণ্ডবিধির বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করে বলেন যে, এই বিধান হচ্ছে নির্মম যা যুগের সাথে বেমানান। বিধিবিধানে অপরাধীর মানসিক দিক বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ইসলামের দণ্ডবিধি অপরাধীকে বেত্রাঘাত করে অথবা হাত কেটে তার মানসিক দিক চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।'

তাদের এই অভিযোগ কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবতাবর্জিত, পক্ষপাতদুষ্ট। মূলত আল্লাহ প্রণীত এসব দণ্ডবিধি প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তোলা, সকলের জানমাল, ইজ্জত-আবরুকে হিফাজতের ব্যবস্থা করা, অপরাধ হ্রাস করা। এ প্রসঙ্গে ডক্টর হাম্মাদ বলেন, 'নিশ্চয়ই ইসলামের দণ্ডবিধির প্রয়োগ অপরাধকে হ্রাসের ক্ষেত্রে এমনকি চিরতরে বিলুপ্তির ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করে যা দ্বারা সমাজ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপনের পরিপূর্ণ উপযোগী হয়।'

ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলি যুগের জাহিল মানুষগুলোকে ইসলামের এই আইন প্রয়োগ সর্বকালের সর্বসেরা সুসভ্য মানুষে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। ইসলামবিদ্বেষীরা মানবাধিকারের ছদ্মাবরণে হত্যাকারী, চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীকে লঘু শাস্তির আবদার, মূলত সারা বিশ্ববাসীকে অপরাধীদের কাছে জিম্মি বানানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে তাদের বৈধ মানবাধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এই পর্যন্ত আল্লাহ প্রণীত কোনো একটি আইন প্রয়োগও আধুনিক যুগে অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়নি। বরং যেখানে যতটুকু এই আইনের প্রয়োগ রয়েছে, সে ভূখণ্ড তত উচ্ছৃঙ্খলমুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে বা হচ্ছে। মানব ও জিন জগৎ বাদে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় আল্লাহর আইন প্রয়োগ বলবৎ থাকায়, সেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। সুতরাং দুশমনদের আসার অভিযোগ ভিত্তিহীন। বাস্তব কথা হচ্ছে, পৃথিবীকে সুশৃঙ্খল করে গড়ে তুলতে হলে এ পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর আইন প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

সাম্প্রতিক বিশ্বে মহান আল্লাহর আইন

বর্তমান বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্রের সংখ্যা সাতান্নটি। এসব দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীই হচ্ছে মুসলমান। এগুলোর শাসকগোষ্ঠীও মুসলমান। একমাত্র কুরআনই মুসলমানের জীবনব্যবস্থা।

www.pathagar.com

সেই প্রেক্ষাপটে এই সব মুসলমান রাষ্ট্রে আল কুরআন তথা আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের কোনো একটি রাষ্ট্রেও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আইন কার্যকর নেই। তবে তুলনামূলকভাবে রাজকীয় সৌদি আরবে আল্লাহর আইনের বেশিরভাগ বাস্তবায়ন রয়েছে। অন্যান্য অধিকাংশ মুসলিম দেশে পারিবারিক ও অন্যান্য সামান্য কিছু আইন ছাড়া অন্য কোনো আল্লাহর আইন কার্যকর নেই। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এখানে শুধুমাত্র কিছু পারিবারিক আইন ছাড়া আল্লাহর জন্য কোনো আইন বলবৎ নেই। এখানে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি সুদভিত্তিক। বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্রিটিশ আইনে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশের অবস্থা বাংলাদেশের মতোই। আর অমুসলিম দেশে তো আল্লাহর আইন পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষিত। সুতরাং বলা যায়, বিশ্ব নিখিলের মালিক মহান আল্লাহর বিশ্ব আইন আধুনিক বিশ্বে তেমন একটা কার্যকর নেই।

মানবরচিত আইনের ব্যর্থতার চিত্র

অন্য আইন মানবরচিত। মানুষের সার্বিক সীমাবদ্ধতা সর্বজনস্বীকৃত। সে জন্য মানবরচিত আইন কখনো সর্বজনীন হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এই আইনে অসংখ্য ত্রুটি থেকে যায়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর প্রয়োগও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আজ নতুন আইন প্রণয়ন করলে কিছুদিন পর তা পরিবর্তনের দাবি ওঠে। মোট কথা, এই আইন বসবাসযোগ্য কোনো সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে যে সক্ষম নয়, বর্তমানের বিশ্বচিত্র তার বাস্তব নমুনা। এর যৎসামান্য উদাহরণ হচ্ছে–

ক. বিগত ২০ বছরে ব্রিটেন ও আমেরিকায় প্রতি ছয়জনে একজন করে জারজ ছিল। বর্তমানে কোথাও তা অর্ধেক কোথাও বা অর্ধেকের বেশি।

খ. আমেরিকার Federal Bureau of Investigation [fbi]-এর তথ্য অনুযায়ী, মধ্যবিত্ত মার্কিন পরিবারে ৪ থেকে ১৩ বছর বয়সের যত শিশুকন্যা রয়েছে, তার ২৫%ই প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার। কানাডার ৫৪% মহিলা বলেছেন, তারা ১৬ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ৫১% মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন অথবা ধর্ষণের জন্য তাদেরকে আক্রমণ করা হয়েছে। সবচেয়ে নিরাপত্তার শহর টরেন্টোর ৯৮% মহিলা কোনো না কোনোভাবে যৌন ভোগান্তির শিকার।

গ. বিশ্বে প্রতি বছরে ৮ কোটি মহিলা অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ করেন। ২ কোটি মহিলা ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত ঘটাতে বাধ্য হন।

ঘ. প্রতি বছর এক লাখ মার্কিন মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মারা যায়। সেখানে ৩০% লোক সমকামী।

ঙ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে [১৯১৪-১৮] এক কোটি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে [১৯৩৯-১৯৪৫] পাঁচ কোটি ৫০ লাখ লোক প্রাণ হারায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খরচ হয় আট হাজার কোটি ডলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এক লাখ এগার হাজার ছয়শত নিরানব্বই কোটি ১৪ লাখ ৬৩ হাজার ৩৪ ডলার। আমেরিকা এই যুদ্ধে প্রতিদিন খরচ করত পঁচিশ কোটি ডলার।

বিশ্বে ৬০ কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। ৮০ কোটি মানুষ নিরক্ষর। ১৫০ কোটি মানুষ চিকিৎসাসুবিধা বঞ্চিত। এই সময়ে প্রতি মিনিটে পৃথিবীর সামরিক ব্যয় ২০ কোটি ডলার।

www.pathagar.com

চ. পুঁজিবাদী আমেরিকার ২৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ১৫% অর্থাৎ প্রায় এক কোটি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ১৯৯৫ তে আমেরিকায় ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ছিল তিন কোটি। ১৯৯২ সালে তাদের গৃহহীনদের সংখ্যা ছিল ৩০ লাখ, যা ২০০৭ সালে দাঁড়াবে এক কোটি ৯০ লাখে। ২০ লাখ আমেরিকান লেখাপড়া শিক্ষার আগেই স্কুল ত্যাগ করে থাকে।

জ. সারা বিশ্বের বিদ্যালয়বিমুখ কায়িক শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ২৪ কোটি ৬০ লাখ।

ঝ. নগ্নছবি তোলার সংগঠক স্পেন্সার স্টুনিক ১৯৯২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪০ হাজার নর-নারীর নগ্নছবি তুলেছে।

ঞ. ভাগ্যাহত অবহেলিত দরিদ্র অভিবাসীদের প্রতি অমানবিক আচরণের জের ধরে সভ্যতার দাবিদার মানবাধিকারে প্রবক্তা ফ্রান্সের প্রায় তিনশত শহরে তিন মাস ধরে দাঙ্গা সহিংসতা সংঘটিত হয়। দেশটি পরিণত হলো হামলা, আগুন, ভাঙচুর ও দাঙ্গার নগরীতে। জ্যাক শিরাক সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্তমান সময়ের ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি অভিবাসীদের উত্তরসূরিদেরকে অভিহিত করলেন 'জঞ্জালতুল্য নিকৃষ্ট মানুষ' হিসেবে ব্যর্থতার এই তালিকা দীর্ঘ করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে আমরা সেদিকে না গিয়ে স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিশ্বের এই চিত্র মূলত মানবরচিত আইনের ব্যর্থতারই জাজ্বল্য নমুনা। এই অবস্থা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষকে মানুষের স্তরে উন্নীত হতে হলে এই পরিস্থিতির অবসান অনিবার্য।

উপসংহার

আল্লাহর আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে এর সুফলতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব। সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যেখানে অনায়াসে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই আইন প্রয়োগ অব্যাহত রয়েছে। এই আইন প্রয়োগ করলে তার ইতিবাচক প্রভাবের কোনো বাস্তব মডেল বিশ্ববাসীর সম্মুখে না থাকায় ইসলামের দুশমনরা এর বিরুদ্ধে যথেচ্ছ বিষোদগার করে যাচ্ছে। তারা মিথ্যাচারের মাধ্যমে অন্য ধর্মাবলম্বীরা তো বটেই, এমনকি অনেক মুসলমানকেও এর বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যার অনিবার্য পরিণতিতে এই আইন প্রয়োগের মধ্যে তারা সবাই পশ্চাৎপদতা, বর্বরতা জুলুমের উপস্থিতি আবিষ্কার করেছে। বাস্তবে অবস্থাটি তা নয়। বরং আসল কথা হচ্ছে, শুধুমাত্র এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই মানুষের বাসোপযোগী একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। একে উপেক্ষা করে সুশৃঙ্খল কোনো পৃথিবীর কল্পনা করাও অবান্তর, এই শাশ্বত সত্যটি বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরাই হচ্ছে সময়ের অনিবার্য দাবি। এ আইন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, বিচার– এক কথায় মানবজীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় যুগোপযোগী। এ আইনকে তারা গুটিকতক অপরাধীর জন্য দৃশ্যত অকল্যাণ ধরে নিলেও এ আইন মূলত বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম, এই বাস্তবতা সকলের সম্মুখে উন্মোচন আজ অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

সে জন্য লেখালেখি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বক্তৃতা, বিবৃতি, আলোচনা সভা, গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির মাধ্যমে এই আইন সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্তির উন্মোচন করে স্বচ্ছ ধারণা দানের এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলা প্রতিটি বিবেকবান মানুষের জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.com

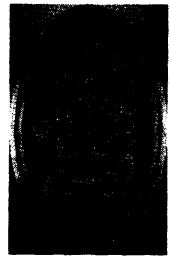

রাহমাতুল্লিল আলামিন

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান

বিশ্বজগতের মহান স্রষ্টা মানুষের জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য যে জীবনবিধান প্রেরণ করেছেন তার নাম ইসলাম। পৃথিবীতে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে আল্লাহ তাঁর দ্বীন প্রচার ও কায়েমের উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে তিনি তাঁর দ্বীন প্রচার করেছেন। প্রথম নবী আদি মানব আদম [আ] আর সর্বশেষ নবী বা রাসূল হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]। মহানবী [সা] শুধু সর্বশেষ নন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম চরিত্রে অধিষ্ঠিত করেছেন। মহানবী [সা]-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং সর্বকালের সব মানুষের জন্য তা একমাত্র প্রকৃত দ্বীন হিসেবে গণ্য করেছেন। এ দ্বীন অনুসরণের মাধ্যমেই মানবজাতি ইহজাগতিক ও পারলৌকিক শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি পেতে পারে।

নবী-রাসূলগণ শুধু আল্লাহর বাণী প্রচার করেই সান্ত হননি, তাঁরা ছিলেন স্ব স্ব উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শ, অনুপম চরিত্রের অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে আল্লাহ তায়ালা মহানবী [সা]-কে সমগ্র মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে।' [সূরা আহযাব ২১]।

আল্লাহর দ্বীন অনুসরণের একমাত্র মাপকাঠি হলো মহানবী [সা]। তাঁকে যথাযথরূপে অনুসরণ করলেই দ্বীনের প্রকৃত অনুসরণ করা হয়। তাই মহানবীর জীবনাদর্শ সম্যক রূপে অবহিত হওয়া প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। তবে এখানে তাঁর জীবনের সব দিক নয়, শুধু সে মহান ব্যক্তির চরিত্রমাধুর্য সম্পর্কে সামান্য কিছু আলোচনার প্রয়াস পাবো।

মহানবী [সা]-এর সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ যাতে মানবজাতিকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করতে পারে সে জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নিখুঁত মানবীয় চরিত্রে বিভূষিত করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আমরা আপনাকে সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে এবং একটি উজ্জ্বল আলোক শিখা হিসেবে প্রেরণ করেছি।' [সূরা আহযাব ৪৫-৪৬]।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তায়ালাই সে সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এ সত্য দ্বীনকে [জীবনবিধান] সকল দ্বীনের ওপর চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করতে পারেন।' [সূরা-ফাতাহ ২৮]।

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর চরিত্র ছিল অতুলনীয়। সৌন্দর্যময় চন্দ্রের কলঙ্ক আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু মহানবী [সা]-এর চরিত্রে সামান্যতম কালিমা আবিষ্কার করাও সম্ভব নয়। মানবজাতির সামনে তিনি ছিলেন এক নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের মতো চির মহিমাময় আলোকরশ্মি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যারা জীবন অতিবাহিত করেছেন এ প্রসঙ্গে তাদের কয়েকজনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। নবুওয়ত লাভের পর নবুওয়তের গুরুদায়িত্ব পালনে মহানবী [সা] যখন নানাভাবে পেরেশানি বোধ করতেন, তখন তাঁর সহধর্মিণী খাদিজা [রা] তাঁকে সর্বপ্রকার সান্ত্বনা ও উৎসাহ প্রদান করে বলতেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে আপনি কখনো বঞ্চিত হবেন না। কারণ আপনি পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে থাকেন, দরিদ্র-অসহায় ব্যক্তিদের আপনি সাহায্য করেন, অতিথি-মেহমানদের আপনি উদারভাবে আপ্যায়িত করেন এবং আপনি সর্বদা ন্যায়ের পথ সমর্থন করেন ও মজলুমের সহায়তা করেন।'

মহানবী [সা]-এর চাচা আবু তালিবের পুত্র আলী [রা] শৈশবকাল থেকে মহানবী [সা]-এর নিকট প্রতিপালিত হয়েছেন। কিশোরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। মহানবী [সা] সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মহানবী [সা] ছিলেন অতি উদার, মহানুভব ও দয়ার্দ্রচিত্ত। সর্বাবস্থায় তাঁর হৃদয়ের কোমলতা ও দয়ালু স্বভাবই প্রতিভাত হতো, কঠোরতা তিনি পরিহার করে চলতেন। তাঁর মুখ দিয়ে কখনো খারাপ ও অশ্রাব্য বাক্য নির্গত হতো না। তিনি কখনো অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ করতেন না। যদি এমন কোনো অনুরোধ তাঁর নিকট পেশ করা হতো যা গ্রহণযোগ্য নয়, তাহলে তিনি যেমন তা অনুমোদন করতেন না, আবার সরাসরি তা নাকচও করে দিতেন না। যারা তাঁকে জানতেন, তারা সহজেই এর অর্থ অনুধাবন করতে পারতেন। তিনি এটা এ জন্য করতেন যেন অন্যের অনুভূতিতে এতটুকু আঘাত না লাগে অথচ অনুমোদনযোগ্য নয় এমন কাজ থেকেও সে নিবৃত্ত হয়।'

আলী [রা] আরো বলেন, 'তিনি ছিলেন অতিশয় পরোপকারী মহানুভব ব্যক্তি, কঠোরভাবে সত্যবাদী ও দয়ার্দ্রচিত্ত। তাঁর সাহচর্যে আসার সৌভাগ্য যারা অর্জন করেছেন তারাই হয়েছেন মুগ্ধ ও আনন্দিত। যে কেউ তাঁকে দেখেছে, প্রথম দর্শনেই তাঁর সৌম্যকান্তি তাকে আকর্ষণ করেছে এবং পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাঁকে মহব্বত করতে শুরু করেছেন।'

মহানবী [সা]-এর স্ত্রী খাদিজা [রা]-এর আগের স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হিন্দ [রা] মহানবী [সা] সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন অতিশয় মহানুভব ব্যক্তি। তিনি কখনো কারো মনে আঘাত দিতেন না অথবা এমন কোনো কথা কখনো বলতেন না যাতে কারো আত্মমর্যাদায় এতটুকু আঘাত লাগতে পারে। কেউ তাঁর প্রতি সামান্যতম অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেও তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলতেন না। ব্যক্তিগত কোনো ব্যাপারেই তিনি কখনো রাগান্বিত হতেন না বা প্রতিশোধ নিতেন না। তবে ন্যায় ও হকের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন, যেকোনো মূল্যে তা প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।'

দুনিয়া ও আখিরাতে যিনি মানবজাতির মহান নেতা, দুনিয়ার ধনসম্পদ ও বিলাসিতা ছিল তাঁর নিকট নিতান্তই তুচ্ছ। তাঁর জীবন-যাপন প্রণালি সম্পর্কে কয়েকটি সহীহ হাদিস : 'তার ব্যবহৃত কম্বল ছিল অনেকগুলো তালিযুক্ত।' [তিরমিযী]।

'তাঁর ব্যবহৃত কাপড়ের সংখ্যা ছিল অত্যল্প। কিন্তু তিনি সেগুলো অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতেন। [বুখারি]।

www.pathagar.com

অন্যদেরও তিনি সাধারণ কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার উপদেশ দিতেন। একবার তিনি কোনো এক ব্যক্তিকে ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করতে দেখে মন্তব্য করলেন : 'সে কেন এগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে না?' আরেকবার অন্য এক ব্যক্তিকে ময়লাযুক্ত পোশাক পরিধান করা দেখে তার আর্থিক সঙ্গতির বিষয় জানতে চাইলেন। তার ভালো অবস্থার কথা জেনে বললেন, 'আল্লাহ যেখানে তোমাকে এতটা নিয়ামত দান করেছেন, তখন তোমার পোশাক-আশাকে সে নিয়ামতের প্রতিফলন ঘটা উচিত।' [আবু দাউদ]।

মহানবী [সা]-এর সুবিখ্যাত বাণী– 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।'

মহানবী [সা] যে ঘরে বসবাস করতেন তা ছিল একটি সাধারণ পর্ণকুটির। তার চার দিকের দেয়াল ছিল মাটির নির্মিত এবং ছাদ ছিল খেজুরপাতার। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য ছাদকে উটের চামড়া দিয়ে ঢেকে দেয়া হতো। ওই একই উপাদানে নির্মিত ছিল উম্মুল মুমিনিনের আলাদা আলাদা ছোট ছোট কামরা। তাঁর নিজস্ব কামরার সামগ্রী বলতে ছিল রজ্জুনির্মিত একটি শোয়ার খাটিয়া, খেজুরপাতা দিয়ে তৈরি একটি বালিশ, পশুর চামড়ার মাদুর, একটি চর্মনির্মিত পানির পাত্র ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র। পার্থিব সামগ্রী বলতে তাঁর এগুলো ছাড়া আর যা ছিল তা হলো– একটি উট, একটি ঘোড়া, একটি গাধা এবং শেষ জীবনে অর্জিত একখণ্ড জমি। [বুখারি, মুসলিম ও আবু দাউদ শরিফ]।

একদা কতিপয় সাহাবি মহানবী [সা]-এর শরীরে শক্ত মাদুরের দাগ বসে যাওয়া দেখে তাঁকে একটি নরম বিছানা দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'দুনিয়ার সামগ্রী দিয়ে আমি কী করব? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক সেই মুসাফিরের মতো যে পথচলাকালে সামান্য সময়ের জন্য বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তারপর আবার চলতে শুরু করে।' [তিরমিযী]।

তিনি সবাইকে সাদাসিধা জীবন-যাপনের উপদেশ দিতেন এবং নিজেও তা কঠোরভাবে পালন করতেন। তাঁর জীবনে বিলাসিতা বলতে কিছু ছিল না। একান্ত অনাড়ম্বর, সাধারণ জীবনই ছিল তাঁর পূত-পবিত্র জীবনের আদর্শ। এমনকি যখন তিনি সমগ্র আরব এলাকার একচ্ছত্র মহান অধিপতি হন তখনো অনেক সময় তিনি দিনের পর দিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিদারুণ কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করেছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা [রা] বলেন, 'এমন দিন তাঁর জীবনে কমই এসেছে যেদিন তিনি দুই বেলা খাবার খেতে পেরেছেন। তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর গৃহে সামান্য কিছু যবের ছাতু ছাড়া আর কোনো সামগ্রীই ছিল না, আর সে যবের ছাতুও তিনি ক্রয় করেছিলেন এক ইহুদির নিকট তাঁর যুদ্ধাস্ত্র বন্ধক রেখে প্রাপ্ত অর্থ থেকে।' [বুখারি ও মুসলিম]।

মহানবী [সা]-এর চরিত্রমাধুর্য ছিল অসাধারণ। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁকে মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই একাধারে তিনি ছিলেন সব মানবীয় গুণের আধার এবং মানবীয় সব দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে। তাঁর সব কাজ, কথা, আচরণ ও উপদেশ সমগ্র মানবজাতির জন্য অতুলনীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ। স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ মানবজাতির জন্য পরম নিয়ামত বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এ মহান ব্যক্তির জীবনাদর্শ জানা, বোঝা ও তা অনুসরণ করা আমাদের জন্য কর্তব্য।

www.pathagar.com

মহানবী [সা]-এর মহান শিক্ষা আন্দোলন

ড. আহসান হাবীব ইমরোজ

'ইকরা' [পড়]! এই মহাবিশ্বের মহান স্রষ্টা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতা জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বোত্তম মানুষ হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর কাছে সর্বপ্রথম এই শব্দটিই নাজিল করেন। ৬১০ খ্রিস্টাব্দের কোনো এক সুন্দর দিনে মরুময় আরবের অন্ধকার পাথুরে হেরা গুহায় যখন এই শব্দটিসহ কুরআনের পাঁচটি আয়াত নাজিল হয় ঠিক তখনই শুরু হয়ে যায় মহানবীর [সা] মহান শিক্ষা আন্দোলন। এরপর পঁচিশ হাজার মাইল পরিধির এই পৃথিবীতে শুরু হয় মানবসভ্যতার এক প্রোজ্জ্বল পরিক্রমা। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইলের ভাষায় 'মুহাম্মাদ [সা]-এর আবির্ভাব জগতের অবস্থা ও চিন্তাস্রোতে এক অভিনব পরিবর্তন সংঘটিত করে। যেন একটি স্ফুলিঙ্গ তমসাচ্ছন্ন বালুকা স্তূপে নিপতিত হলো। কিন্তু এই বালুকারাশি বিস্ফোরক বারুদে পরিণত হয়ে দিল্লি থেকে গ্রানাডা পর্যন্ত আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত করল।

সমসাময়িক শিক্ষার অবস্থা

মহানবীর আবির্ভাবের প্রায় এক হাজার বছর আগে এথেন্সে হেমলক পানে আত্মত্যাগ করেন সক্রেটিস। অতঃপর এই সহস্র বছরে রোমান এবং পারস্য সভ্যতা থিতিয়ে আসে। এই সময়টাকে ইউরোপে অন্ধকারের যুগ বলা হয়। ভারতবর্ষে কিছুটা জ্ঞানচর্চা থাকলেও আরবে ছিল তখন আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর ভাষায় সে সময়ে আরবে মাত্র হাতেগোনা আঠারোজন মানুষ লেখাপড়া জানতেন।

রাসূল [সা]-এর মহান শিক্ষা আন্দোলন

'ইকরা' [পড়] শব্দ ধারণ করে যিনি নবী হলেন সেই মুহাম্মাদ [সা] নবুওয়ত পাওয়ার পরই শিক্ষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন একজন উম্মি [অক্ষরের ধারণাহীন] কিন্তু তিনিই হলেন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধারক। মূলত কুরআনকেন্দ্রিক জ্ঞানের তিনি এতটাই চর্চা করতেন যে তাঁর শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বলেছেন, 'তুমি এত সাধনা করে শেষাবধি নিজকে ধ্বংস করে ফেলো না।' তাঁর প্রেরণায় আবুবকর, উমর, উসমান, আলী, আবদুর রহমান, তালহা, যোবায়ের এরা হলেন এক একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানতাপস। আলী [রা] তো সেই সময়কার একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। মহানবী জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রতিটি মুসলিম [নর-নারীর] জন্য ফরজ। শুআবুল ইমান, হাদিস নং-১৫৪৩, ১৯৩ পৃ."-এর সময়সীমা

www.pathagar.com

সম্পর্কে বলেছেন, "তোমরা দোলনা হতে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।" এর বিস্মৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন "এর জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।" রাসূল [সা]-এর সাধনার চিত্রকে পূর্ণরূপে তুলে ধরে প্রখ্যাত প্রাচ্য ভাষাবিদ জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল ডিউস বলেন, "কুরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডারের জগতের চাইতেও বৃহত্তর জগৎ, রোম সাম্রাজ্যের চাইতেও বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কুরআনের সাহায্যে একমাত্র তারাই রাজাধিপতি হয়ে এসে ছিলেন ইউরোপে, যেথায় ভিনিসীয়রা এসেছিল ব্যবসায়ীরূপে, ইহুদিরা এসেছিল পলাতক বা বন্দিরূপে।"

জ্ঞানের এক মহান জাগরণ

রাসূলের এই মহান আন্দোলন সাহাবী থেকে তাবেয়ী এবং তাবেতাবেয়ী পর্যন্ত প্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী মহান পুরুষদের জীবনে আমরা সেই চিত্র দেখতে পাই।

ইমাম আবু হানিফার দাদা ছিলেন একজন ইরানী ক্রীতদাস। তার পিতা একজন সামান্য কাপড়ের ব্যবসায়ী থেকে একজন সওদাগরে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তিনি তার পুত্রের মেধাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলে তাকে ব্যবসায়ে না লাগিয়ে উচ্চ শিক্ষাদানে মনোযোগী হন। আবু হানিফা অল্প বয়সেই কুরআনে হাফেজ হন। আরবি ভাষা-সাহিত্যে তার ছিল অসামান্য দখল। তিনি জ্ঞানের তুলনায় ধনসম্পদ বা পদবিকে কোনোই গুরুত্ব দিতেন না। তাই তার সুনাম শুনে কুফা নগরীর স্বেচ্ছাচারী গভর্নর ইবনে হুবায়রা তাকে কুফার কাজীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু জ্ঞানের পাগল আবু হানিফা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কোনোভাবেই রাজি করাতে না পেরে অবশেষে সেই বর্বর গভর্নর তাকে বেঁধে বেত মারার আদেশ দেন। কথিত আছে এগার দিন ধরে প্রত্যহ দশ ঘা করে দোররা মেরেও তাকে রাজি করানো যায়নি। দাম্ভিক খলিফা আল মনসুর তাকে ক্ষমা করেননি। আবু হানিফার অপরাধ ছিল তার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা। তিনি মানুষের ওপর খলিফার জুলুম এবং তার অনৈসলামিক কাজের সমালোচনা করতেন। এই অপরাধে আল মনসুর তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। জনসাধারণ তাকে এতই সম্মানের চোখে দেখতো যে, তার মৃত্যুর পর প্রায় দশ দিন ধরে তার জানাজার নামাজ হতো এবং প্রত্যেকদিন গড়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এই নামাজে শামিল হতো। ইমাম আবু হানিফা মুসলিম জুরিসপ্রুডেন্স বা ব্যবহার শাস্ত্রের জন্মদাতা। তার শিষ্যদের ভেতর মুহাম্মাদ, আবু ইউসুফ ও জাফরের নাম আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই মশহুর শিষ্যত্রয়সহ চল্লিশজন শিষ্য নিয়ে আবু হানিফা একটি কমিটি গঠন করেন, মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছর সাধনা করে মুসলিম আইন মহাকোষ গঠন করেন। এই সাধনায় বিমুগ্ধ হয়ে মশহুর জার্মান পণ্ডিত ভনক্রেমার বলেছেন, 'এটি ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বুদ্ধির ধারণাতীত ফল।' অপরদিকে ফিহরিস্ত নামক বিখ্যাত গ্রন্থসূচি প্রণেতা মোহাম্মাদ ইবনে নাদিমের মতে জাবির ইবনে হাইয়ান দুই হাজারেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শুধু চিকিৎসা-বিষয়কই তার পাঁচ'শ গ্রন্থ ছিল। আর বিজ্ঞানের ওপরও তার সমসংখ্যক বই ছিল যার ভেতর একখানি ছিল দুই হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত। চৌদ্দশত আঠারো শতক পর্যন্ত তার লিখিত গ্রন্থগুলো ইউরোপ ও এশিয়ার বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিমিয়া বা রসায়নের

www.pathagar.com

ওপরই তার একশত গ্রন্থের সন্ধান মেলে। আর তাই তাকে রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা বলা হয়। তিনি জ্ঞানের জন্য এতটাই পাগলপারা ছিলেন যে বলিষ্ঠভাবে বলেছেন, "আমার ধনদৌলত, টাকাকড়ি আমার ছেলেরা, ভাইয়েরা ভাগ করে নিয়ে ভোগ করবে। কিন্তু জ্ঞানের দরজায় বারবার আঘাত করে আমি যে শিক্ষা দিয়ে গেলাম, তাই আমার তাজ হিসেবে চিরকাল শোভা পাবে।"

আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের শাসনকালকে মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য দেশ-বিদেশের মশহুর চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, কবি, আইনজীবী, মোহাদ্দেস, তাফসির কারকদের নিজের দরবারে জড়ো করেন। অতঃপর তাদের নিয়ে দারুল হিকমা তথা বিজ্ঞান নগরী প্রতিষ্ঠিত করে তাদের গবেষণার সর্বাধিক সুযোগ ও পরিবেশ দান করেন। আল মামুন তাদের সমবেত প্রচেষ্টায় হিব্রু ও গ্রিক জ্ঞানভাণ্ডারকে উজাড় করে আরবিতে অনুবাদ ও রূপায়ণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ঠিক এমন এক প্রেক্ষাপটেই ৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মূসা আল খারিজ্‌মী জন্মগ্রহণ করেন। যার সিদ্ধান্তগুলি মধ্যযুগের গণিতশাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পিতা প্রথম জীবনে, একজন ডাকাত ছিলেন, তিনি খোরাসানের সড়কে রাহাজানি করে বেড়াতেন। অতঃপর তার মানসিকতার পরিবর্তন হয় এবং বাগদাদে একমনে জ্ঞান চর্চা করেন। তারই তিনপুত্র মুহাম্মাদ, আহম্মাদ, আর হাসান আরব বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। সেই সময়েই তাদের বাড়িতে একটি নিজস্ব গবেষণাগার ছিল এবং তারা সেখানে দিনরাত জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা চালাতেন। এদের ভেতর মুহাম্মাদ তথা মূসা আল খারিজ্‌মী সর্বাধিক মেধাবী ছিলেন। তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শুধু আরবি নয় বরং হিব্রু, গ্রিক ও সংস্কৃতি ভাষারও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি একাধারে ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিদ্যা, গাণিতিক ও দার্শনিক ছিলেন। আর মামুনের প্রচেষ্টায় তিনিসহ সত্তরজন ভূ-তত্ত্ববিদ মিলে 'সুরত আল আরদ' বা পৃথিবীর প্রথম গ্লোব তৈরি করেন। এটাই পরবর্তীতে পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনে মডেল হিসেবে গৃহীত হয়। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে খারিজ্‌মীই আজকের বীজগণিতের জনক।

আল কুরআনের পরই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থটির নাম বুখারী শরীফ। ইমাম বুখারীর পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী। অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। কিন্তু স্নেহময়ী মা ছিলেন একজন অত্যন্ত ধার্মিক ও বিদূষী মহিলা। বরাবরই তিনি পুত্রের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে নজর রাখতেন। তাই ইমাম বুখারী ছোটবেলা থেকেই এমনভাবে গড়ে উঠেছিলেন যে কোনো হাদিস একবার মাত্র শুনলেই তার সনদসহ নির্ভুলভাবে সারা জীবন মনে রাখতে পারতেন। প্রায় কুড়ি বছর বয়সে বুখারীর মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ মক্কায় হজ পালন করেন এবং পরিশেষে সেখানে কুরআন-হাদিসের ব্যাপক জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত হন। সেই বয়সেই মক্কায় অবস্থানকালেই তিনি রাসূলের রওজার পার্শ্বে বসে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যোৎস্নারাতসমূহে সারা রাত জেগে 'কাদায়া আল সাহাবা ওয়াল তাবেয়িন' ও 'আল তারিক আল কবির' নামক দুটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইতিহাসে তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি বলতেন, "এমন কোনো নাম ইতিহাসে নেই যার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ কাহিনী আমার জানা নেই।" অতঃপর তিনি দেশ ভ্রমণে বের হন এবং প্রায় চল্লিশ বছর আজকের

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে সেখানকার প্রায় এক হাজারেরও বেশি জ্ঞানীর সুহবত লাভ করেন এবং তাদের নিকট থেকে ব্যাপকভাবে হাদিস সংগ্রহ করেন। তিনি সাকুল্যে প্রায় ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন যার ভিতর প্রায় দুই লক্ষ তার কণ্ঠস্থ ছিল। এই বিরাট সংগ্রহের ভিতর অনেক যাচাই-বাছাই করে তিনি মাত্র নয় হাজার হাদিস সহীহ হিসেবে গ্রহণ করে আল জামে আল সহীহ নামে তা সংকলন করেন। মাত্র একটি হাদিস সংগ্রহের জন্য তিনি কয়েকশত মাইল সফর করেন। তিনি খুবই আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ছিলেন। একবার বোখারার শাসক তার পুত্রদের শিক্ষা দেয়ার জন্য বুখারীকে তলব করেন, কিন্তু বুখারী এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, "শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে শাহজাদাদেরকেই আমার পর্ণ কুটিরে আসতে হবে।"

আলকিন্দী মুসলিম জগতের 'আল ফাইলাসুফ' বা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। পাশাপাশি মৌলিক বিজ্ঞান সাধনায়ও তার নাম আরব জগতে সবচেয়ে বিখ্যাত। তার পুরো নাম ছিল আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী। তিনি ৮১৩ সালে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। আলকিন্দী একাধারে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যায় বিশারদ ছিলেন আর সঙ্গীতেও তার আকর্ষণ কম ছিল না। এরকম বারোটি স্বতন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার পরও তিনি আরবি, গ্রিক, হিব্রু, ইরানী, সিরিয়াক এমনকি সংস্কৃতসহ ছয়টি ভাষাতে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করেন। ষোল শতক পর্যন্ত জগতে যে সব মহামনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ বারোজনের ভিতর একজন হিসেবে আলকিন্দীকে গণ্য করা হয়। তিনি দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সঙ্গীতের ওপর প্রায় দু'শত পঁয়ষট্টিখানা গ্রন্থ রচনা করেন। আজও ইউরোপে আল কিন্দীকে দর্শনের প্রথম পরিচায়ক ও ভাষ্যকার হিসেবে শ্রদ্ধা করা হয়।

তিব্বিয়া বা চিকিৎসা-শাস্ত্রে মুসলিমদের ভিতর সর্বাপেক্ষা প্রথম উল্লেখযোগ্য সাধক ছিলেন আলী ইবনে সহল-রব্বান আল্-তাবারী। তিনি সম্ভবত আট দশকের শেষের দিকে তাবারীস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ছাড়াও সিরীয়াক, ফারসি, হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আলী তাবারী চিকিৎসা বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'ফিরদৌস আল হিকমাহ ফি আল-তিব্ব' বা ঔষধের স্বর্গ নামক গ্রন্থটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটিকে আরবি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রথম বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে।

বর্তমান ইরানের রাজধানী তেহরানের অন্তর্গত রায় নগরে ৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে আবুবকর মোহাম্মাদ ইবনে জাকারিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ১২২০ সালে মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংসের আগে এ শহরটি মুসলিম জাহানে জ্ঞানবিজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল। সেই জন্য আবুবকর জন্মভূমির নামানুসারে নিজের নিসবা আলরাযী গ্রহণ করেন। তিনি আলকেমী নিয়ে গবেষণা করতেন কিন্তু তার সবচেয়ে বড় অবদান চিকিৎসাশাস্ত্রে। তিনি নানা বিষয়ে কমপক্ষে দুইশত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার ভিতর চিকিৎসাশাস্ত্রেই প্রায় একশত। তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে বসন্ত ও হাম রোগ সম্বন্ধে 'আল জুদারি ওয়াল হাসাবাহ্' নামক পুস্তকটি। এই গ্রন্থটি ল্যাটিন ও ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই তরজমা করা হয়। শুধু ইংরেজি ভাষাতেই ১৪৯৮ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত এটি চল্লিশবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তার আরেকটি শ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে

www.pathagar.com

'আল-হাবী' সর্বপ্রকার রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনাসহ চিকিৎসা প্রণালি ও ওষুধের ব্যবস্থা সম্বলিত একখানি আভিধানিক গ্রন্থ। এটি কুড়ি খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বর্তমানে এর দশটি খণ্ডের অস্তিত্ব আছে। 'আল-হাবী' ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ১৪৮৬ সালের পর থেকে ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই এই বইটি ক্রমাগত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। এর নবম খণ্ডটি ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ষোলশতক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। আল্-রাজীর জ্ঞানার্জনে কেমন আগ্রহ ছিল সেটি তার নিম্নোক্ত বক্তব্য হতেই বুঝা যায়: "যারা আমার সাহচর্যে এসেছেন, কিংবা আমার খোঁজ রাখেন, তারাই জানেন জ্ঞানাহরণে আমার কী আকুল আগ্রহ, কী তীব্র নেশা। কিশোরকাল থেকেই আমার সকল উদ্যম এই একটি মাত্র নেশায় ব্যয়িত হয়েছে। যখনই কোনো নতুন বই হাতের কাছে পেয়েছি, কিংবা কোনো জ্ঞানীর সন্ধান পেয়েছি, তখনই অন্য সকল কাজ ফেলে, বহু আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেও নিবিষ্ট মনে সে বইখানা পাঠ করেছি কিংবা সেই জ্ঞানীর নিকট যথাসাধ্য শিক্ষাগ্রহণ করেছি। জ্ঞান সাধনায় আমার এমন অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ সহিষ্ণুতার ফলেই মাত্র এক বছরে আমি কুড়ি হাজার পৃষ্ঠার মৌলিক রচনা লিখেছি [প্রতিদিন প্রায় ষাট পৃষ্ঠা করে] এবং তাও তাবিজ লেখার মতোই ঝরঝরে অক্ষরে। প্রায় পনের বছর আমি ব্যয় করেছি আমার বিরাট চিকিৎসাভিধান লিখতে। দিনরাত এমন কঠোর পরিশ্রম করেছি যে, শেষে আমি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলি। কিন্তু এখনও আমার জ্ঞানপিপাসা মিটেনি। আজও আমি অন্যকে দিয়ে বই পড়িয়ে শুনি কিংবা আমার রচনা লেখাই।"

আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে জরীর আল-তাবারী ছিলেন জাতিতে ইরানী। তিনি ইরানের সবচেয়ে গীরিসংকুল স্থান তাবারিস্থানে ৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, তর্কশাস্ত্র ও ভূতত্ত্বে গভীর জ্ঞানার্জন করেন। এ সময় তার সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিলো কুরআনের তাফসির ও হাদিসে। তিনি জ্ঞানীদের সংস্পর্শে গিয়ে সরাসরি জ্ঞানার্জনের জন্য আরব ছাড়াও মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশে কয়েক বছর সফর করেন। এ সময় তাকে বহুদিন অর্ধাহারে এমনকি অনাহারেও কাটাতে হয়েছে। একবার অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে ওঠে যে, উপর্যুপরি কয়েকদিন অনাহারে কাটিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য নিজের জামার দু'টি হাতার বিনিময়ে তাকে রুটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল। আল-তাবারী ইসলামের ইতিহাসের অমর হয়ে আছেন একজন শ্রেষ্ঠ তাফসিরে কুরআন এবং একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হিসাবে। তার তাফসিরের নাম 'জামি আল বয়ান্ ফি তাফসির আল কুরআন। এটি বর্তমানে সুবৃহৎ ত্রিশটি খণ্ডে প্রকাশিত। তাবারীর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের নাম 'আখবার আল-রাসূল ওয়াল মুলুক' অর্থাৎ পয়গাম্বর ও রাজাদের ইতিহাস। বর্তমানে ইতিহাসখানি মাত্র পনের খণ্ডে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে আসল ইতিহাসখানি এর কমপক্ষে দশগুণ ছিল। কথিত আছে যে, একশত পঞ্চাশ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশাল ইতিহাস যখন তার ছাত্ররা পড়তে অস্বীকার করে, তখন তিনি আক্ষেপ করে অধুনা-প্রকাশিত পনেরো খণ্ডের সার সংকলনটি করেছিলেন। এই বিরাট গ্রন্থে সৃষ্টির আদিকাল থেকে ৯১৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসের বর্ণনা আছে। জ্ঞানানুশীলনে তার জীবনকে তিনি কীভাবে উৎসর্গ করেছিলেন তার পরিচয় মেলে যখন আমরা জানতে পারি যে, তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বছর যাবৎ দৈনিক চল্লিশ পৃষ্ঠা করে মৌলিক লেখা রচনা করতেন। [অর্থাৎ এ সময়ে তিনি রচনা করেন প্রায় পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার পৃষ্ঠা।]

www.pathagar.com

৮৫৮ সালে হাররান অঞ্চলে আল-বাত্তানী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি বাগদাদের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সেই আল-বাত্তানী বাগদাদ ত্যাগ করে ফোরাত নদীর পূর্ব উপকূলস্থ আল-রাক্কা নামক স্থানে গমন করেন এবং সেখানে আমৃত্যু গবেষণায় লিপ্ত থাকেন। এখানে তার নিজস্ব গবেষণার উপযোগী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যায় একজন মৌলিক গবেষক ছিলেন। এ দু'টি বিষয়ে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার অধিকাংশই আজ কালের করালগ্রাসে হারিয়ে গেছে। দশ শতকের মাঝামাঝি একজন শান্ত্র প্রকৃতির ক্ষুদ্রাকৃতি তুর্কি পোশাক– পরা বৃদ্ধলোক আলেপ্পোর হামাদানি আমীর সায়েফউদ্দৌলার দরবারে উপস্থিত হন। তাকে আট-দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে দেখে এবং ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এমনকি কবিতা ও গানে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতা দেখে গুণগ্রাহী আমীর তাকে সম্মানে আপন দরবারে স্থান দেন। এর কিছু দিনের ভিতরই তাকে সভাপণ্ডিতদের মর্যাদা দান করেন। এই জ্ঞানী লোকটিই প্রাচ্যের 'মুয়াল্লিম-সানী' বা দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু আবু নসর মুহাম্মাদ আল ফারাবী। তিনি আকৃতিতে ক্ষুদ্র, চক্ষুতারকা আরো ক্ষুদ্র এবং সামান্য কয়েকগাছি শ্মশ্রু শোভিত পুরুষ ছিলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন কিনা বা তার পুত্র-কন্যা ছিল কিনা, কিছুই জানা যায় না। কিন্তু অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাকে জন্মভূমি ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করে। কাজীর মতো সম্মানিত পদে ইস্তফা দিয়ে পঁচিশ বছর বয়সে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি বাগদাদে তিনি গমন করেন। প্রায় সত্তরটি বিরাট নোটবুকে দর্শনশাস্ত্রের সারাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ফারাবী অ্যারিস্টটলের আত্মা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থটি শতাধিকবার এবং পদার্থবিদ্যা বিষয়টি চল্লিশবার পাঠ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচ্যের সুধী সমাজে এ্যারস্টটল মুয়াল্লিম-আউয়াল বা আদিগুরু ও ফারাবি মুয়াল্লিম সানী বা দ্বিতীয় গুরু হিসেবে পরিচিত। মুসলিম দার্শনিকদের পিরামিডে তাঁর নাম সর্বোচ্চ। তিনিই ইসলামের প্রথম বিশ্বকোষ-রচয়িতা ও মুসলিম তর্কশাস্ত্রের জন্মদাতা।

ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক হাসান আলি আল মাসুদী বাগদাদে সম্ভবত নয় শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। আল মাসুদী বাল্যেই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইতিহাস, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, ভূগোল, জ্যোতিষশাস্ত্র ও প্রাণীতত্ত্বেও তার অসাধারণ বুৎপত্তি জন্মে। সাহিত্য-সঙ্গীত ও কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সমসাময়িক আলেমদের মতোই বিশ্বাস করতেন 'আর-রিহলাহ্ ফিতালাব আল ইলম' অর্থাৎ সফর করলে জ্ঞানবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাই পথের মোহে যৌবনেই তিনি ভ্রমণে বহির্গত হন ও প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী তৎকালীন দুনিয়া চষে বেড়ান। আল মাসুদী তার দীর্ঘ সফরের অভিজ্ঞতা থেকে শেষ জীবনে সুবৃহৎ গ্রন্থ 'মরূয-আল যাহাব ওয়া-মাআদিন আল-জওহর' বা 'সোনালি ময়দান হীরার খনি' প্রণয়ণ করেন। এই বিরাট ইতিহাস ভূগোলের বিশ্বকোষখানি ত্রিশটি খণ্ডে সমাপ্ত। এই জন্য তাকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভিতর হেরোডোটাস বলা হয়। উক্ত গ্রন্থের উপক্রমণিকায় মাসুদী নিজেই বলেছেন, 'ইতিহাস রচনার পূর্বে তিনি পঞ্চাশজন মশহুর ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।' তার আরেকটি বিরাট গ্রন্থের নাম 'মিরাতুল যামান' বা 'আখবার-উয-যামান'। এটির অসম্পূর্ণ অংশ ত্রিশ খণ্ডে ভিয়েনার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

বিশ্বসভ্যতায় রাসূলের [সা] শিক্ষা আন্দোলনের অবদান

রাসূল [সা]-কে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্বলিত সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। তাই তার প্রভাব ও অবদান সকল কাল ও স্থানের গণ্ডি পেরিয়ে শাশ্বত ও অসীম। আমরা ক্ষুদ্র মানুষ সেটি উপলব্ধি করতে চাইলে একটি নির্দিষ্ট সময় এবং এলাকাকে বেছে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা ৭ম থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের এলাকাটিই বেছে নিতে চাই।

ইসলামপূর্ব ইউরোপের করুণ অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের সময় ইউরোপীয়রা অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তাদের নিজস্ব কোনো সুসংগঠিত ভাষা ছিল না। কুঁড়েঘর ও মাটিরঘর ছাড়া সমস্ত ইংল্যান্ড ফ্রান্সে দালানবাড়ির সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য; লন্ডনের রাস্তাগুলি ছিল জলাভূমি– সে সব স্থানে বুনো হাঁস ও পাখি ইতস্তত বিচরণ করতো। উইলিয়াম ড্রেপারের ভাষায় "ইউরোপীয়রা তখনও বর্বর বুনো অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি; তাদের শরীর অপরিষ্কার, মন কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। অধিবাসীরা ঝুপড়িতে বাস করতো; মেঝেতে নলখাগড়া বিছিয়ে দেয়ালে মাদুর টাঙিয়ে রাখতে পারলেই তা বিত্তবানের লক্ষণ বলে ধরা হতো। সীম, বরবটি গাছের মূল এমনকি গাছের ছাল খেয়ে তারা মানবেতর জীবন-যাপন করতো। [J.W. Draper-History of Intellectual Development of Europe- p.27-28]

যখন আমাদের স্যাক্সন পূর্ব পুরুষরা কাঠের কুঠরিতে বাস করতো; ময়লা খড়ের উপরে বিশ্রাম করতো; যখন আমাদের ভাষা অসংবদ্ধ ছিল এবং পড়াশুনা শুধু কয়েকজন মঠবাসী পাদরির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখন সমস্ত ইউরোপ বর্বর অজ্ঞতায় ও বুনো ব্যবহারে নিমজ্জিত ছিল।

পোপেরা টাকার বিনিময়ে যে সার্টিফিকেট দিতো তা স্বর্গের গেটের প্রবেশপত্র বলে ধরে নেয়া হতো। পোপদের মতে যে কোনো ধনবান খ্রিস্টানরা স্বর্গে যেতে পারতো। অঢেল সম্পদের মালিক ছিল এই পোপেরা। এছাড়াও এরা ছিল সব চেয়ে বেশি প্রভাবশালী। ভ্যাটিকানের পোপ ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি। ইউরোপের সব দেশের রাজাদের ভাগ্য নির্ভর করতো এই পোপের সিদ্ধান্তের ওপর। পোপের সিদ্ধান্তের প্রতি সংশয় প্রকাশ করায় জনৈক জার্মান সম্রাটকে প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তিনদিন গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। পোপের আদেশ অমান্য করলে সাধারণ লোককে পুড়িয়ে মারা হতো।

ফ্রান্সের রাজা ফিলিপকে পোপ যে অপমান করেছিল তাতে ক্ষোভে দুঃখে তিনি বলেছিলেন, "হায় সালাদিন, তুমিই সুখী; তোমার ওপরে পোপ নেই– আমিও মুসলমান হয়ে যাবো।"

সাবানের ব্যবহার অজানা থাকায় এবং অপরিষ্কার থাকা ধর্মপ্রীতির লক্ষণ বলে বিবেচিত হওয়ায় খ্রিস্টানরা সারা বছরেও একবার গোসল করতো কিনা সন্দেহ। একবার এক সন্নাসী সুদীর্ঘ সত্তর বছর গোসল না করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। খ্রিস্টানরা ধর্মগ্রন্থ পাঠের সময়ে শুধু আঙুলের অগ্রভাগে পানি স্পর্শ করে পবিত্র হতো।

সহস্র সহস্র মানুষ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাবে সমগ্র ইউরোপ একবার জনমানব শূন্য হয়ে গিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও প্যারিসের রাজপথে শূকরের পাল চরে বেড়াতো। বৃষ্টি হলে রাস্তায় একহাঁটু কাদা জমতো। লন্ডনের অবস্থাও ছিল এমনি।

www.pathagar.com

সে সময়ে ধর্মীয় আদালত প্রায় দেড়লক্ষ ইহুদিকে মৃত্যুদণ্ডসহ বিবিধ কঠোর দণ্ড দেয়। প্রকৃত অর্থে ধর্ম বলতে ইউরোপে তেমন কিছু ছিল না। স্বয়ং পোপেরা পর্যন্ত নাস্তিক ছিল। পাদ্রিরা মদের নেশায় বেসামাল হয়ে নগ্ন অবস্থায় রাস্তায় নাচতো।

ইউরোপে তখন শিক্ষা বলতে ধর্মীয় শিক্ষাকেই বুঝাতো। আর এই শিক্ষা শুধু সীমাবদ্ধ ছিল মুষ্টিমেয় কিছু পাদ্রী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে। এমনকি অনেক পাদ্রী পর্যন্ত কোনো কিছু লিখতে বা পড়তে পারতো না।

ব্যাভেরিয়ার রাজা একখানা পাণ্ডুলিপির বিনিময়ে একটি নগর ছেড়ে দিতে চেয়েও তা পাননি। একখানা উপাসনা পুস্তক ধার করার জন্য ফ্রান্স রাজাকে বহু মূল্যবান দ্রব্য গচ্ছিত রাখতেও অভিজাতদেরকে জামিন দিতে হয়েছিল। প্যারিসের বিশপ পিটারের বৃহৎ লাইব্রেরিতে মাত্র আঠারোখানা পুস্তক ছিল। রানী ইসাবেলা ২০১টি গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন তন্মধ্যে সাতষট্টিটিই ধর্মপুস্তক। আর এটিই ছিল তৎকালীন খ্রিস্টান ইউরোপের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি।

যদি ইউরোপের বুকে মুসলিমদের আগমন না ঘটতো তবে হয়তো আজও বিশ্বের বুকে ইউরোপীয়রা সবচেয়ে অনুন্নত, অজ্ঞ ও হীন জাতি হিসেবে বিবেচিত হতো।

হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর ওফাতের [৬৩২ খ্রিঃ] পূর্বেই বিভিন্ন দিকে আরব মুসলিমদের বিজয় অভিযান শুরু হয়েছিল। মুসলমানরা এবার ইউরোপ অভিযানের জন্য তৈরি হলেন। প্রথমে তারা কনস্টানটিনোপল অবরোধ করলেন। কিন্তু এর দৃঢ় নৈসর্গিক অবস্থানের জন্য বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না।

কিউটা দুর্গের অধিপতি জুলিয়ান এবং স্পেনের রাজা রডারিকের মধ্যে এক বিবাদ শুরু হলো আর এই বিবাদের সুযোগ নিয়েই মুসলমানরা স্পেনে প্রবেশের সুযোগ গ্রহণ করলেন।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্পেনের অভিজাত শ্রেণির লোকেরা তাদের মেয়েদেরকে পাঠাতেন রাজ দরবারে। উদ্দেশ্য হলো যে, তাদের মেয়েরা রাজকীয় আইন-কানুন শিক্ষা করবে সেখানে। দুর্গাধিপতি জুলিয়ানও তার মেয়েকে রডারিকের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিন্ডাররূপে মোহিত হলেন রডারিক। কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে সতীত্ব হারালো ফ্লোরিন্ডা। জুলিয়ান ছিলেন সিংহাসনচ্যুত রাজা উহটিজারের জামাতা। রডারিক উহটিজারকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন বলে পূর্ব থেকেই রডারিকের প্রতি জুলিয়ানের ক্ষোভ ছিল।

রাজধানী টলোডো ত্যাগকালে রডারিক জুলিয়ানকে কিউটা থেকে কয়েকটি শিকারি বাজপাখি পাঠিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিউটায় পৌছতেই জুলিয়ান রডারিককে উচিত শাস্তি দেয়ার জন্য উত্তর আফ্রিকার সেনাপতি মূসা বিন নুসাইর-এর দরবারে হাজির হয়ে সজল চোখে তার মেয়ের দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং রডারিককে শাস্তি দেয়ার জন্য মূসার সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

প্রথমে পরীক্ষামূলক অভিযানের জন্য মূসা বিন মালিককে চারশো পদাতিক, একশো অশ্বারোহী সৈন্য এবং চারখানা যুদ্ধ জাহাজের দায়িত্ব দিয়ে জুলিয়ানের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রথম অভিযানে কৃতকার্য হয়ে মূসা তারিক বিন জিয়াদ নামক নবদীক্ষিত বার্বার মুসলিম লেফটেন্যান্টকে পাঁচ হাজার আফ্রিকান ও বার্বার সৈন্য এবং দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একদলে চারটি যুদ্ধ জাহাজে করে পুনরায় স্পেন অভিযানে পাঠালেন। তারিক ভূ-মধ্যসাগর

www.pathagar.com

পাড়ি দিয়ে যে পাহাড়ে অবতরণ করেন তা আজও জাবালুত তারিক বা জিব্রাল্টার নামে অভিহিত। তিনি তীরে ভিড়েই তার সবগুলি জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলেন আর মুসলিম মুজাহিদদের উদ্দেশে বললেন "আমাদের দু'টি পথই খোলা রয়েছে- একটি হলো যুদ্ধে জয়লাভ করা আর অপরটি হলো মৃত্যুবরণ করা। পালাবার কোনো পথ নেই।"

ইতোমধ্যে আফ্রিকা থেকে আরো পাঁচ হাজার সৈন্য এসে তারিকের সৈন্যের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত করেছিল। অন্য দিকে রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ।

৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই উভয়পক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। রডারিকের সৈন্যসংখ্যা দেখে মুসলিম বাহিনী প্রথমে কিছুটা ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লো। তারিক তাদের উদ্দেশে বললেন, "প্রিয় সৈন্যগণ! তোমাদের সম্মুখে শত্রু, পিছনে সমুদ্র, পালাবার কোনো পথ নেই। সাহস ও আশার সঙ্গে যুদ্ধ না করলে বাঁচার কোনো আশা নেই।" মুসলিম বাহিনীর প্রবল তেজের মুখে খ্রিস্টান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করলো। হাজার হাজার সৈন্য মারা গেল এ যুদ্ধে। রডারিক উপায়ান্তর না দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলো।

এদিকে মুসীন নামের এক কর্মচারীর অধীনে কয়েকশ' অশ্বারোহী সৈন্যের এক দল কর্ডোবা বিজয়ের জন্য অগ্রসর হলো। রাতের আঁধারে কেউ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারলো না। হঠাৎ শিলাবৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঘোড়ার পায়ের আওয়াজও শোনা গেল না। কর্ডোবা নগর প্রাচীরের পাশে এসে মুসলিম বাহিনী সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। আল্লাহর তরফ থেকে সাহায্য এলো। একজন মেষপালক তাদেরকে নগর প্রাচীরের একটি ভাঙা অংশ দেখিয়ে দিলো। মুসীন প্রাচীরসংলগ্ন ভাঙা অংশে লাফিয়ে পড়লো। নিজের পাগড়ি সে ঝুলিয়ে দিল নিজের যোদ্ধাদের উদ্দেশে।

এদিকে মুরসিয়ার শাসনকর্তা থিওদেমির আত্মরক্ষা করার এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। শহরে পুরুষরা কেউ ছিল না, কারণ যুদ্ধে অনেকে মারা গিয়েছিল, অবশিষ্ট পুরুষরাও পালিয়ে গিয়েছিল। থিওদেমির শুধু তার বালক ভৃত্যকে নিয়ে শহরে অবস্থান করছিলেন। তিনি শহরের মেয়েদেরকে একত্রিত করে তাদের যোদ্ধার পোশাকে সাজালেন। তাদের চুলগুলোকে সামনে এনে এমনভাবে চিবুকের পাশে স্থাপন করলেন যেন দেখে দাড়িওয়ালা সৈনিক বলে ভ্রম হয়। এবার ছদ্মবেশী সৈন্যদের দেখিয়ে তিনি মুসলিম সেনাপতিকে বললেন, "ঐগুলো হলো আমার সৈন্য, ওদের দ্বারাই আমি নগর রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলাম। আসলে আমার সৈন্য বলতে কেউ নেই।" তার অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা ও সাহসের পরিচয় পেয়ে মুসলিম সেনাপতি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং থিওদেমিরকে পুনরায় মুরসিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন।

সেনাপতি মূসা তাঁর নিজ সন্তান আবদুল আজিজকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। সেভিল স্পেনের রাজধানী নির্বাচিত হলো। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হতে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। শুধু স্পেনে নয় ফ্রান্স এবং ইউরোপের কেন্দ্রভূমিতে এই নব জাগরণের ঢেউ প্রবাহিত হয়। নব্বোনের শাসনকর্তা আবদুর রহমান ফ্রান্সের বিরাট অংশ দখল করে নিলেন। তিনি ফরাসি সেনাপতি চার্লসের সঙ্গে এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ইউরোপ খ্রিস্টান থাকবে, না মুসলমান হবে; ভাবী নটর ডেম গির্জা হবে না মসজিদ হবে– এই যুদ্ধে তাই মীমাংসিত হওয়ার কথা।

www.pathagar.com

এই যুদ্ধ এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ঐতিহাসিক গিবন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, এই যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করলে আরবের নৌবহর বিনা বাধায় টেমস নদীতে প্রবেশ করতো। অক্সফোর্ডের শিক্ষালয়গুলোতে বাইবেলের পরিবর্তে আজ কুরআনের ভাষ্য পড়ানো হতো। সেখানকার গির্জাগুলো উদাত্তস্বরে ইসলামের মহিমা ঘোষণা করতো।

অতঃপর হাকামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুর রহমান [২য়] স্পেনের সুলতান নিযুক্ত হলেন। তিনি কিছুটা স্বস্তির সঙ্গে স্পেন শাসন করেন। তিনি কর্ডোবার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তার সময়ে দেশ সুখ সমৃদ্ধিতে ভরে ওঠে।

আবদুর রহমানের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় আবদুর রহমান মাত্র একুশ বছর বয়সে স্পেনের সিংহাসনারোহণ করেন। ইতোমধ্যেই তৃতীয় আবদুর রহমানের বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তা স্পেনীয় জনগণকে মুগ্ধ করেছিল। সেই আবদুর রহমান সিংহাসনের অধিকারী হলে স্পেনের জনগণ তাঁকে বিপুল সমর্থন জানায়।

পূর্বপুরুষদের হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে আবদুর রহমানের সুদীর্ঘ আঠারো বছর লাগলো। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সুলতানদের বশ্যতা স্বীকার করলো। বহুদিনের গণ্ডগোল ও অরাজকতার পর স্পেনে আবার শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে এলো।

খলিফা বিখ্যাত ইহুদি চিকিৎসক হাসাদাইকে সংকোর চিকিৎসার্থে পাঠালেন। হাসাদাই যেমন চিকিৎসক ছিলেন তেমনি ছিলেন একজন বিখ্যাত কূটনীতিবিদ। তিনি সংকোর খলিফাকে ১০টি দুর্গ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। ৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর সত্তর বছর বয়সে আবদুর রহমান মারা যান। আবদুর রহমান মুসলিম স্পেনের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি স্পেনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনামলে সমগ্র দেশ সুখ শান্তিতে ভরে ওঠে। প্রথম শ্রেণির আশিটি নগর এবং দ্বিতীয় শ্রেণির তিনশো নগর তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তাঁর দেশের লোক সংখ্যা তিন কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বার্ষিক রাজস্ব পাওয়া যেতো তিরিশ কোটি ডলারেরও বেশি। আবদুর রহমান আয্ যোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

হাকাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং নিজেও বিদগ্ধ পাঠক ছিলেন। তাঁর সভায় বহু জ্ঞানী বিদ্বান ব্যক্তির আশ্রয় হয়েছিল। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কর্ডোবাতে সাতাশটি অবৈতনিক উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়কে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। তার লাইব্রেরিতে চার লক্ষ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হয়েছিল।

স্পেনের করুণ পতন

৭১২ সালে এক সেনাপতি মূসা যে রাজ্যের পত্তন করেন ৭৮০ বছর পরে ১৪৯২ সালে ঐ নামের আরেক সেনাপতির হাতে একই রাজ্যের পতন ঘটে। আর সেই সঙ্গেই স্পেনের মুসলমানদের ভাগ্যে নেমে আসে বিড়ম্বনা, দুর্ভোগ ও বিপর্যয়। দীর্ঘ দু'মাস দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ থাকার পরও তুরস্ক ও মিসরের সুলতানের কাছ থেকে যখন কোনো সাহায্য এলো না তখন ১৪৯২ সালে ৩ জানুয়ারি বু-আবদিল ফার্দিনান্দকে নগর ছেড়ে দিলেন।

"বিদায় হে মোর সাধের গ্রানাডা, হিস্পানিয়ার পুষ্পবন
বু-আবদিল চলিল আজি লভিবারে চির নির্বাসন।"

www.pathagar.com

তাঁর জননী আয়েশা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন, "পুরুষের মতো যা রক্ষা করতে পারোনি, মেয়ের মতো তাঁর জন্য ক্রন্দন করা তোমার মতো রাজারই উপযুক্ত কাজ বটে।" বিদায়ের দিনে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে বু-আবদিল জন্মভূমির জন্য কেঁদেছিলেন সে জায়গাটি আজও অল আলতিমো সমপিরো দেল মুর বা মুরের শেষ দীর্ঘশ্বাস নামে পরিচিত। মুসলিমদেরকে ধর্মত্যাগ করার প্রথম কাজ হিসেবে ধরপাকড় শুরু হলো। খ্রিস্টানদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে কয়েকজন মুসলিমকে গ্রেফতার করা হলো। ফার্দিনান্দ মুসলিম জনগণের ওপরে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালান। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কিংবা মৃত্যু গ্রহণ এই মর্মে আদেশ জারি করলেন। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ঘরবাড়ি বিষয় সম্পত্তি সব ত্যাগ করে আল বাশারতের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্রিস্টানরা সেখানে আক্রমণ করে মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মসজিদ পরিণত হয় মানুষের কসাইখানায়, ঘরবাড়ি পরিণত হয় নরহত্যা পরীক্ষাগারে। এত নির্যাতনের মুখেও যারা আত্মগোপন করেছিল তারা কোন দিনই তাঁদের মহান দীক্ষা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'– এই অমোঘ মন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়নি। মুসলিম মেয়েদের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় খ্রিস্টান মিশনারিতে। খ্রিস্টান ধর্মমত ছাড়া বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। অবশ্য মুসলিমরা নিজ বাড়িতে এসে পুনরায় মুসলিম মতে বিয়ে করতো। কিন্তু খ্রিস্টানরা এটা জানতে পারলে তাঁদেরকে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে জীবন্ত দগ্ধ করতো। পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ-এ জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও গোসল করা নিষিদ্ধ করা হলো। আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল হয়েছে বলে তা বাতিল করা হলো; অথচ স্পেনে তখনো ভাষা সুসংগঠিত হয়নি। বর্তমান স্প্যানিস ভাষাও আরবি কর্তৃক প্রভাবিত। মুসলিমরা বিশ্বাস করে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন" এবং "জ্ঞানার্জনের জন্য প্রয়োজনে চীনে গমন" করতে হবে– এই জন্য স্পেনে জ্ঞানার্জনের সব পথ বন্ধ করা হলো। মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠাগার, গ্রন্থাগার সব পুড়লো। মান মন্দির, গবেষণাগার ও বিজ্ঞানাগার লুট হলো। পরবর্তীতে পাশ্চাত্যে ইতিহাসবিদরা পর্যন্ত আর্তনাদ করে বলেছেন, 'হে খ্রিস্টান এই তোদের মানবিক মূল্যবোধ "এই তোদের পরধর্ম সহিষ্ণুতা! বিপথগামী স্পেনীয়রা জানতো না যে তারা কী করছে। তারা বুঝতে পারেনি যে, তারা তাদের স্বর্ণপ্রসবিনী রাজহংসীকে হত্যা করছে। বহু শতাব্দী ধরে স্পেন সভ্যতার কেন্দ্র শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষা দীক্ষার পীঠস্থান ছিল। ইউরোপের কোনো দেশই মুরদের এই সুসভ্য রাজ্যে সমান হতে পারেনি। মুরেরা একদিন যে ক্ষেতে ইক্ষু জলপাই ও হরিৎ শস্যের জন্ম দিত তা আজ অনুর্বর ও বিরান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। যেখানে জ্ঞান ও বুদ্ধির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল আজ সেখানে অজ্ঞ ও নির্বোধের উপস্থিতি।" ১৬০৯ সালে মরিসকোসদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের শিল্পের ক্ষতি হয়, দ্রব্যমূল্যও বেড়ে যায়। মুসলিম বহিষ্কারের জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে স্পেনের রাজস্ব মাত্র তিন লক্ষ ডলারে নেমে আসে অথচ সাতশো বছর আগে তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজস্বের পরিমাণ ছিল এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে শুধু কাস্তাইলের লোকসংখ্যা ছিল ৬,৭০০,০০০ অথচ ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র স্পেনের লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৬,০০০,০০০। ১৭৮৮ সালে আইবেরিয়ায় ১৫০০টি পরিত্যক্ত নগর ছিল। ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী বলে ১৫৯১ সালে কর্ডোবার চতুর্দিকস্থ এলাকা বিক্রি করে দেয়া হয়। অথচ মুর শাসনের সময়ে এসব এলাকাই সুস্বাদু ফল ও শস্যের ফলনক্ষেত্র ছিল।

www.pathagar.com

স্থাপত্য শিল্পে স্পেন

কর্ডোবার মসজিদ স্থাপত্যের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। ৭৮৪ সালে আবদুর রহমান এই মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর ক্ষেত্রফল ছিল ২৬,৫০০ বর্গগজ। দৈর্ঘ্য ১৪০ গজ, প্রস্থ ১৯৫ গজ। উত্তর দিকের প্রাচীরের উচ্চতা ৩০ ফুট এবং নদীর তীরের দিকে এর উচ্চতা ছিল ৭০ ফুট। মসজিদের ছাদের ভিতরের দিকে ছিল প্রায় এক ইঞ্চি পুরো সিসার পাত। মসজিদের স্তম্ভের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪০০টি। মেঝে সাদা পাথরের তৈরি। খিলানের সম্মুখ ভাগ ছিল রক্তবর্ণ ইটের তৈরি।

মুসলিম স্পেনে শিক্ষা

মুসলিম স্পেনে শিক্ষা ছিল সার্বজনীন। কোনো মুসলমান অশিক্ষিত থাকলে তা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার ছিল। প্রত্যেকটা মসজিদের সঙ্গেই ছিল বিদ্যালয় ও মক্তব। একমাত্র কর্ডোবাতে এরকম স্কুলের সংখ্যা ছিল ৮০০টি। ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলিম সকলে একই সঙ্গে একই স্কুলে পড়তে পাড়তো। দ্বিতীয় পোপ সিলভারস্টার জারবার্ত এর শিক্ষালাভ ঘটেছিল কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে। নবম শতাব্দীতে কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল এগার হাজার। এখানকার শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন ইহুদি ও খ্রিস্টান। মুসলিমদের গৌরবের যুগে স্পেনে ছিল সত্তরটি সাধারণ গ্রন্থাগার। এ ছাড়াও প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের বাড়িতে সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে কার কতগুলো মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বই আছে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলতো। আল মেরিয়ার উযীর ইবনে আব্বাসের পুস্তকালয়ে অসংখ্য পত্রপত্রিকা ছাড়াও চার লক্ষ বই ছিল। সুলতান হাকামের পুস্তক তালিকা পঞ্চাশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং তার প্রতিখণ্ডে পঞ্চাশ তা কাগজ ছিল। শোনা যায় জনৈক মুসলিম চিকিৎসককে সমরকান্দে আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি সেখানে যেতে পারেননি। কারণ তার সমস্ত বই বহন করতে চারশো উটের প্রয়োজন ছিল। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং প্রত্যেকটি পুস্তক সুদক্ষ নকলনবিশের নিপুণ হস্তে লিখিয়ে নিতে হতো, তখন মিসরের সুলতান মোস্তানসিরের লাইব্রেরিতে আশি হাজার ত্রিপোলীর লাইব্রেরিতে দুই লক্ষ স্পেনের খলিফা দ্বিতীয় হাকামের লাইব্রেরিতে ছয় লক্ষ ও কায়রোর ফাতেমিয়া খলিফাদের লাইব্রেরিতে দশ লক্ষ পুস্তক ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হালাকুর হস্তে যখন বাগদাদ নগর ধ্বংস হয় তখন, নিক্ষিপ্ত পুস্তকের কালিতে তাইগ্রিস নদীর বুক আচ্ছন্ন ও তার জলরাশি কালো হয়ে যায়; আর এর চেয়ে বেশি পুস্তক বর্বর মোঙ্গলীয়রা অগ্নিতে দগ্ধ করে।

আন্দালুসিয়ার [স্পেনের] বিজ্ঞানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেই বলা যায় যে, তাঁরা জ্ঞানার্জনে কত আগ্রহী ছিল। তাঁরা একজন জ্ঞানী ও আরেকজন নিরক্ষর লোকের মধ্যে কে বেশি সম্মানের অধিকারী তা ভালো করে জানতো। বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষাকে এত গুরুত্ব ও সম্মান দেয়া হতো যে, যে লোক আল্লাহপ্রদত্ত প্রতিভা না নিয়ে জন্মগ্রহণ করতো সে যাবতীয় উপায়ে তাঁর প্রতিভা বিকাশের চেষ্টা করতো এবং জনগণের কাজে তার অজ্ঞতা গোপন করতো। কারণ একজন অজ্ঞ লোক সব সময়েই বিতৃষ্ণার বস্তু বলে প্রমাণিত হতো। এজন্য জ্ঞানী লোকদের মধ্যে প্রায়ই শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা হতো। কে কত ভালো কবিতা বা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে কিংবা কার লাইব্রেরিতে কতটি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে এ নিয়ে

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা চলতো। তাঁর অসমাপ্ত চল্লিশ খণ্ড ক্যাটালগে বিভক্ত লাইব্রেরি নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। তেরশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় শিক্ষাদান শুরু হয়। আবু রুশদ, আবু পাজা, ইবনে তোফায়েল, ইবনে যোহর, কাবালা ও মেইমনিদ এর গ্রন্থসমূহ ইউরোপের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে পড়ানো হতো। ফরাসি ও স্পেনীয় ভাষার ওপরেও আরবি ভাষার প্রভাব পড়ে। হাজার হাজার আরবি শব্দ এই ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে ভাষার লালিত্যে। আরবিতে যেমন 'ট' ও 'ড' শব্দ নেই, ফরাসি ও স্পেনীয় ভাষাতেও তেমনি 'ঞ' তে 'উ' তে পরিণত হয়েছে। এই দুই ভাষার অধিকাংশ শব্দই এসেছে আরবি থেকে। কর্ডোবার আল মুসত্যকফীর কন্যা ওয়াদাল্লাহ ছিলেন একজন প্রথম সারির মহিলা কবি। ছন্দ প্রকরণে তার অসম্ভব ব্যুৎপত্তি ছিল। অলঙ্করণ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন সুনিপুণা। তাঁর প্রতিভা এত উজ্জ্বল ছিল যে, সারা বিশ্বে তিনি 'আরবের সফো' নামে পরিচিত। কর্ডোবার রাজপুত্র আহমদের মেয়ে আয়েশা ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ মহিলা বক্তা। সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর বক্তৃতামালা কর্ডোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। তিনি ছাত্র ও সাধারণ শ্রোতাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে এক বিশাল ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। দার্শনিক লাবানা একজন স্পেনীয় মুসলিম রাজকন্যা ছিলেন। তিনি তাঁর যোগ্যতার বলে স্পেনীয় খলিফার ব্যক্তিগত সচিব হতে পেরেছিলেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনের অবদান

জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে স্পেনীয় মুসলমানরা আশ্চর্যজনক উন্নতি সাধন করেন। তারাই ইউরোপে প্রথম মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সৌরজাগতিক গবেষণার জন্য জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ জাবির ইবনে আফলাহ ১১৯৪ সালে সেভিলের বিখ্যাত জিরাল্ডা স্তম্ভটি স্থাপন করেন। মুসলিম রাজত্বের অবসানে মূর্খ খ্রিস্টানরা এই স্তম্ভটি গির্জার ঘন্টা দেয়ার জন্য ব্যবহার করত। রসায়নবিদ হিসেবে জাবিরের নাম অমর হয়ে আছে। তিনি সোনা গলানোর জন্য Aqua regia এবং যবক্ষার দ্রাবক আবিষ্কার করেন। স্পেনীয় মুরোরাই প্রথম কামানের গোলা আবিষ্কার করেন। মুসলিম রসায়নবিদের আনুকূল্যেই সাবান, সিরাপ, জোলাপ ও জৈবরসায়নের উৎপত্তি হয়। কর্ডোবা এবং অন্যান্য শহরে বোটানি বা উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রদের জন্য 'বোটানিক্যাল গার্ডেন' ছিল। প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা দেয়া হতো। মুসলিম চিকিৎসকরাই সর্ব প্রথম চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করেন এবং চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে সিনার চিকিৎসাপদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রের পাঠ্য ছিল। এ সকল কলেজে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসক স্পেনে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় ইউরোপের সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন সমাজে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের যুগ-যুগান্তরের অধ্যয়ন ও পরীক্ষালব্ধ বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধিত হয়। তেহরান ও কায়রোর কলেজে গৃহীত হয়ার পূর্বেই কর্ডোবার ছাত্ররা ইবনুল হায়ছাম ও আলী ইবনে ঈসার গ্রন্থাবলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। খলিফাদের লাইব্রেরিতে প্রত্যেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পুস্তকই পাওয়া যেতো। জানা যায় শুধু কর্ডোবাতেই পঞ্চাশটি হাসপাতাল ছিল।

www.pathagar.com

সে সময় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরী : কর্ডোবা

কর্ডোবার সুরম্য অট্টালিকা, বিলাসবহুল বাগান, পণ্যে ভরা বাজার সব কিছুই আধুনিক সভ্য জগতের হিংসার বস্তু। আবদুর রহমানের স্থাপিত রাজধানী কর্ডোবা নগরী ইউরোপের মুকুটে পরিণত হয়। এর বিশালত্ব ও সৌন্দর্যের সুনাম এর শত শত মার্বেল নির্মিত বাড়িঘর, এর তিনটি উপশহর, সূর্যের নিচে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জনতার ভিড় সবকিছুই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। উমাইয়ারা কর্ডোবাকে বানিয়েছিল পাশ্চাত্যের সব বিজ্ঞান ও কলার কেন্দ্রস্থল। স্টেনলি লেনপুলের ভাষায় : তার অধ্যাপক এবং শিক্ষকরা একে ইউরোপীয় কৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে। ইউরোপের সকল অংশের ছাত্ররা তার শিক্ষকদের অধীনে পড়তে আসতো।

তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে কর্ডোবার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। নগরটি একই সঙ্গে ছিল বুরোক্র্যাটিক, সংস্কৃতমনা, শিক্ষিত এবং বাণিজ্যলক্ষ্মী। কর্ডোবা নগরী ছিল দৈর্ঘ্যে দশ মাইল, পরিধিতে সাড়ে সাত মাইল। উত্তর দক্ষিণে এটা ছিল দুই মাইল বিস্তৃত। অন্যান্য মতে শহরতলিসহ কর্ডোবার আয়তন ছিল ৫১ মাইল। রাজপ্রাসাদ অবস্থিত ছিল দুই বর্গমাইল জায়গাজুড়ে। সমস্ত শহরকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক অংশ সুউচ্চ দেয়াল ও স্তম্ভ দিয়ে ঘেরা ছিল। সাতটি তোরণ দিয়ে বিভিন্ন অংশে যাতায়াত করা যেত। এ পাঁচটি পাড়ার একটিতে বাস করতো ইহুদিরা। অন্যটিতে বাস করত খ্রিস্টানরা এবং বাকি তিনটিতে বাস করতো মুসলমানরা। কর্ডোবার আশপাশে ২১টি শহরতলি ছিল। এসব শহরতলিতে ন্যূনধিক পাঁচ লক্ষ লোক বাস করতো। এসব শহরে ছিল বাজার, মসজিদ, হাসপাতাল ও শিক্ষাকেন্দ্র। আটটি শহর এবং তিন হাজারেরও বেশি ছোট ছোট শহর কর্ডোবার অধীনে ছিল। প্রতি বছর রাজস্ব পাওয়া যেত আঠারো কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। শহরে তিনটি রাস্তার ধারে রাত্রে সরকারি বাতি জ্বলতো। অথচ এর সাতশো বছর পরও লন্ডনের রাজপথে কোনো বাতির অস্তিত্ব ছিল না। রাজকর্মচারীদের প্রাসাদ ছাড়াও সাধারণ লোকদেরই ১,১৩,০০০ প্রাসাদ, ৩,৮০০ মসজিদ, ৯০০ স্নানাগার ও ৮৪,০০০ দোকান ছিল। আধুনিক কোনো ইউরোপীয় শহরও এত সমৃদ্ধশালী কিনা সন্দেহ। কর্ডোবার বিজ্ঞানীরাই প্রথম জলঘড়ি আবিষ্কার করেন। পানির বিন্দু পড়ার সাথে সাথে কীভাবে ঘড়ির কাঁটা আবর্তিত হতো তা আজো আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়ের ব্যাপার। টেলিগ্রাম, কম্পাস, ৩২ ফুট ওপরে পানি তোলার উপযোগী নলকূপ ইত্যাদি তৈরি করেন এই কর্ডোবার বৈজ্ঞানিকরাই।

খ্রিস্টানরা কর্ডোবার মসজিদগুলিকে গির্জায় পরিণত করে; রাজপ্রাসাদগুলিকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়। মন্দিরগুলোকে গির্জার ঘণ্টা ঘর হিসেবে ব্যবহার করে; লাইব্রেরির লক্ষ লক্ষ বই পুস্তকে আগুন ধরিয়ে দেয়। মুসলিম ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ওরা মুসলিম কীর্তির সব কিছুই ধ্বংস করে। পরিণামে আজ কর্ডোবা অজানা, অখ্যাত ও অনুন্নত একটি শহর মাত্র। Stanley Lanepool, The Moors in Spain.

www.pathagar.com

বদরযুদ্ধ : মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়

এ বি এম মুহিউদ্দীন

ইসলামের ইতিহাসে বদরযুদ্ধ একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ যুদ্ধে বিজয় লাভের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর বুকে পবিত্র ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বদরযুদ্ধকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আজ সত্য বিজিত হলো, মিথ্যা পরাজিত হলো। নিশ্চয় মিথ্যা সর্বদা পরাজিত।' এ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর বিশ্বময় ইসলামের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামের জনপ্রিয়তা বহু গুণে বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, প্রায় তিন গুণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক অভাবনীয় বিজয় লাভের পর নওমুসলিম সাহাবিদের ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [সা]-এর প্রতি আনুগত্যের পরিসর সুউচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কাফিরদের ওপর মুসলমানদের এমন বিজয় সত্যের পতাকাবাহীদের পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করে। বস্তুতপক্ষে বদর কোনো যুদ্ধ নয়, বরং এটি ছিল মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নির্ণিত হওয়ার একটি শুভক্ষণ। এ যুদ্ধে মুমিনগণ তাদের ঈমানের সুকঠিন পরীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়েছেন। বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মহানবীও [সা] বিশেষ সম্মান প্রদান করেছেন। সব মিলিয়ে এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ঐতিহাসিক বিজয়। যে বিজয়ের ময়দানে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি তাঁর পথে জিহাদরত মুসলমানদের সাহায্য করেছেন।

বদরযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর সেখানে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোকেদের সমন্বয়ে মদীনার সনদের ভিত্তিতে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন তার অধিপতি। মদীনায় মহানবী [সা] তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শতধা বিভক্ত জাতিকে একটি সুশৃঙ্খল জাতিতে [উম্মাহ] পরিণত করেন। একটি নতুন ধর্ম ও রাষ্ট্রের উত্থান এবং মহানবী [সা] ও মুসলমানদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মক্কা-মদীনার ইসলামবিরোধী শক্তিগুলোর জন্য প্রবল আতঙ্ক ও গাত্রজ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া একটি নতুন ধর্মের উন্মেষে নিজেদের প্রাধান্য খর্ব হওয়ায়, স্বতন্ত্র একটি মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত কুরাইশদের যে অবাধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল তাতে বিঘ্ন

www.pathagar.com

সৃষ্টি হওয়ায়, মদীনার উপকণ্ঠে কুরাইশদের দস্যুবৃত্তির সুযোগ বন্ধ হওয়া এবং নাখলার খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি কারণ মক্কার কুরাইশদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করে। দ্বিতীয় হিজরির রমজান মাসের ৮ তারিখ সোমবার আনসার ও মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত মাত্র ৩১৩ জনের একটি মুসলিম বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের এক হাজার সৈন্যের একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীর গতি রোধ করার জন্য মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন। ৩১৩ জন মুজাহিদের এই বাহিনীতে ছিল মাত্র তিনটি ঘোড়া আর উট ছিল ৭০টি। [মুখতাসার সিরাতুর রাসূল]

অসামান্য রণনৈপুণ্য, অপূর্ব বীরবিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সাথে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ গুরুত্বপূর্ণ বদরযুদ্ধে বিধর্মী কুরাইশদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ কাফির নিহত হয় এবং সমসংখ্যক সৈন্য বন্দি হয়। অপর দিকে ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। কুরাইশ নেতা আবু জাহিল এ যুদ্ধে নিহত হয়।

বদরযুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য

পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং সিরাত ও ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে বদরযুদ্ধ সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বদরযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আগ থেকেই মহান আল্লাহ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয়দান করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

সূরা আনফালের ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেই সাহায্যের কথা তুলে ধরে বলেন, 'তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় রবের কাছে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করলেন যে, আমি তোমাদের সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত ফেরেশতার মাধ্যমে।' অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেবো, কাজেই তাদের গর্দানের ওপর আঘাত হান এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় কাট।' [সূরা আনফাল, আয়াত-১২]

এ ছাড়া এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের কাছ থেকেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন : হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'বদরের দিন ছাড়া ফেরেশতারা আর কখনো যুদ্ধ করেননি।' তিনি আরো বলেন, 'বদরের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ি পরিহিত ছিল। যুদ্ধের জন্য তাদের অগ্রভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল।'

বদরযুদ্ধের গুরুত্ব

ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, 'বদরযুদ্ধ ইসলামের প্রথম সামরিক বিজয়। আমরা নিবিষ্টচিত্তে এটি অনুধাবন করেছি। কারণ এটি স্বজাতীয় দেশবাসীর ওপর মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।' এটি অবিসংবাদিত সত্য যে, বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে কাফির বাহিনীর ওপর মুমিনদের বিজয় লাভে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়া একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাহস, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয় বহু গুণ বেড়ে যায়। বদরযুদ্ধে বিজয়ের পর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের দাওয়াত প্রসারিত হতে থাকে। নওমুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকে অতি দ্রুত। হেল বলেন, 'এ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর আরবদের অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে।' আরব ভূখণ্ড পেরিয়ে ইসলামের জনপ্রিয়তা পৌঁছে যায় দূর-দূরান্তে। হিট্টি

www.pathagar.com

বলেন, 'বদরযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে [৬২৪-৭২৪] ইসলাম পশ্চিমে আফ্রিকা থেকে পূর্বে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।' এ যুদ্ধে জয়লাভ না করলে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র হিসেবেই নয়, বরং মূলত ধর্ম হিসেবে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিন্তু এ যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি মুমিনদের সাহায্য করার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছেন। এটি হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিসহ দুনিয়াব্যাপী ইসলাম প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই সব দিক বিবেচনায় বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের ইতিবৃত্তের শুধু একটি বিখ্যাত যুদ্ধই নয়, এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম।

পরিশেষে, ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায়, বদরযুদ্ধে বিজয় অর্জন শুধু একটি যুদ্ধে বিজয় অর্জনই নয়। এ বিজয় ছিল মিথ্যার ওপর সত্যের বিজয়। এ বিজয় ছিল কাফিরদের ওপর মুমিনদের বিজয়। এ বিজয় ছিল ইসলামী আদর্শের বিজয়। এ বিজয় ছিল বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মানুষের বিজয়। সুতরাং বদরযুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী [Turning-point] ঘটনা বলা যেতে পারে।

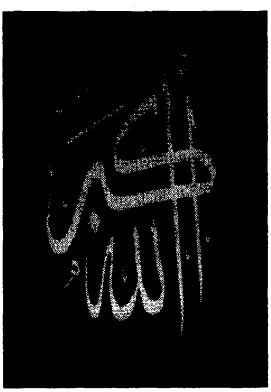

www.pathagar.com

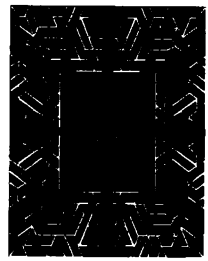

বিশ্ব সভ্যতায় হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর অবদান

ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান

বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে হযরত মুহাম্মাদ [সা] সর্বপ্রথম এমন এক সভ্যতা সংস্থাপন করলেন যা ছিল সত্যিকার অর্থেই মানবিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ। তাঁর আগমন পূর্ব যুগটি ছিল দলাদলি, হানাহানি ও রক্তারক্তির যুগ। মানুষে মানুষে ছিল রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও আভিজাত্যের দুর্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর। সমাজ ছিল তখন পশুত্ব ও পৌত্তলিকতার নিকষকালো অন্ধকারে আচ্ছাদিত। মানুষ ছিল তখন শান্তিহারা, অধিকারহারা, নির্মমভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। নারী জাতির অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। এক কথায় তৎকালীন মানবসমাজে মুক্তি, শান্তি ও প্রগতির আশা হয়ে উঠেছিল সুদূর পরাহত। মানব ইতিহাসের এই ঘোর দুর্দিনেই বিশ্ব মানবতার পরম বন্ধু মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] মানবতার মুক্তির সনদ নিয়ে সুন্দর এই বসুন্ধরায় আগমন করেছিলেন। আধুনিক সভ্যতার সব ভালো, সব সুন্দরের ভিত্তি মহানবী [সা]-ই স্থাপন করেছিলেন। মূলত তাঁর আগমনই ছিল মানবকুলের জন্য অপূর্ব নিয়ামত, রহমত ও চিরন্তন শান্তির মহান সওগাত। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি।" [সূরা আম্বিয়া : ১০৭]

ধর্মীয় মুক্তি

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য জগৎ বিশৃঙ্খলার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। মানব জাতি বর্বরতার এমন এক চরম অবস্থায় ফিরেছিল যেখানে প্রতিটি জাতি, গোত্র একে অপরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-বিবাদে লিপ্ত ছিল, আইন-শৃঙ্খলা ছিল না, শৃঙ্খলার বদলে বিভেদ ও ধ্বংসের কাজ চলছিল। এমনি এক সময় বিশ্ব জগতের জন্য, তিনি বিশ্ব মানবতাকে এমন এক সভ্যতা দান করলেন, যা তাওহীদ ও রিসালাতের নীতি দ্বারা গঠিত। মহান আল্লাহ বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" [আলে-ইমরান : ১৯]

অর্থনৈতিক মুক্তি

প্রিয়নবী [সা] বিশ্ব মানবেতিহাসে সর্বপ্রথম ধন-সম্পদে দরিদ্রদের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করেন। দারিদ্র্য নিরসনে মহান আল্লাহর বাণী, "যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।" এই বাণীর প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে মহানবী [সা]

www.pathagar.com

মনবজীবনের অন্যান্য দিকে ন্যায় অর্থনৈতিক দিকেরও বাস্তব সমাধান দিয়ে গেছেন। সুদভিত্তিক ঋণ, জুয়া, লটারি ইত্যাদি শোষণমূলক ব্যবস্থা চিরতরে নিষিদ্ধ করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণে আজও মানবজাতিকে রাষ্ট্রের দাসত্ব ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত আযাদ ও সুখি করা সম্ভব।

রাজনৈতিক মুক্তি

মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে একটি সত্যনিষ্ঠ বিশ্ব ভ্রাতৃ-সমাজ গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই যে কেবল একটি সত্যিকার শান্তির পৃথিবী সংস্থাপন করা সম্ভব সেই শিক্ষা প্রিয় নবী [সা] দিয়েছেন এবং সেই শান্তির দুনিয়া গড়ার নমুনা হিসেবে মদীনা মুনাওয়ারায় একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। একনায়কত্ব ও রাজতন্ত্রের চির অবসান ঘটানো সেই রাষ্ট্র বিশ্ব মানব সভ্যতার ইতিহাসে দীর্ঘকালব্যাপী সোনালি অধ্যায় রচনা করেছে। আজকের যে চরম উৎকর্ষ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা সেই সভ্যতারই ফসল। তাই তো পাশ্চাত্যের খ্যাতিমান মনীষী জর্জ বার্নার্ডশ স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "I believe if a man like Mahammad [sm] were to assume the dictator ship of modern world, he would succeed in solving the problems in way that would bring much needed peace and happiness".

সামাজিক মুক্তি

ষষ্ঠ শতকের আরব ছিল পাপের কলুষ কালিমায় আচ্ছন্ন। 'জোর যার মুলুক তার' ছিল তখনকার প্রচলিত নীতি। এক কথায় নির্যাতিত মানবতা অমানুষিক পশু শক্তির শিকারে পরিণত হয়েছিল। এরূপ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য গুমরে মরছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত অসহায় মানুষের আত্মা। এমতাবস্থায় মহানবী [সা] ঘোর অজ্ঞানতার কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্ব সমাজে ইসলামের সুবিমল জ্যোতি বিকিরণ করেন। নিঃস্ব ও অসহায়দের সেবা, অত্যাচারীদের বাধা প্রদান, বঞ্চিতদের আশ্রয় এবং বিভিন্ন গোত্রের মাঝে পারস্পরিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা প্রভৃতি কর্মসূচি সামনে রেখে যৌবনকালে তিনি যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' নামে কল্যাণধর্মী একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। আমৃত্যু তিনি সংগ্রাম করে গেছেন সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায়। আজকের এ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমাজেও মহানবীর [সা] আদর্শ অনুসরণে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বিখ্যাত মনীষী David Urquhart বলেন, "Let them investigate fully for themselves: Let them read the Holly Quran, Let them try to understand and they may find peace which all are seeking".

নারী মুক্তি

ইসলাম আগমনের পূর্বে দুনিয়া নারীকে অকেজো ও অকল্যাণকর সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিপন্থী বা তার প্রতিবন্ধক মনে করে জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে একেবারে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, নিষ্ক্রিয়তার এমন এক গহ্বরে যেখান থেকে উঠে আসা ও উত্থান-অগ্রগতি লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। মানবতার পরম বন্ধু মহানবী [সা] তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। নারী সমাজকে হীনতার নিম্নতম পঙ্ক

www.pathagar.com

থেকে তুলেছেন অনেক উর্ধ্বে। দিয়েছেন তাদের তুলনাহীন মর্যাদা, ন্যায্য অধিকার। দিয়েছেন সামাজিক আর্থিক নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা। সম্পদে নারীর অধিকার করেছেন প্রতিষ্ঠা। ঘোষণা দিয়েছেন, নারী-পুরুষ উভয়ে উভয়ের জন্য ভূষণস্বরূপ। মেয়েদের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী [সা] বলেন, "নিশ্চয় সন্তানের বেহেস্ত মায়ের পদতলে।" সম্মান, সেবা ও সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে মায়ের কথা তিনি তিনবার উল্লেখ করেছেন এবং একবার উল্লেখ করেছেন পিতার কথা।

বর্তমান বিশ্বে 'নারী অধিকার' ইস্যু নিয়ে যে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে এবং ব্যয়িত হচ্ছে লক্ষ-কোটি বিলিয়ন ডলার তার সমাধানে আল্লাহ প্রদত্ত ও মহানবী [সা] প্রদর্শিত বিধান মেনে চললেই নারী অধিকারসহ বিশ্ব মানবতার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

শিক্ষার মুক্ত পরিবেশ

সভ্যতার প্রধান উপাদান শিক্ষা। আর সুশিক্ষা হচ্ছে আদর্শ মানুষ ও সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার। তাই মহানবী [সা] বলতেন, "হে আল্লাহ! যে জ্ঞান উপকারে আসে না আপনার নিকট তা থেকে পানাহ চাই।" মানুষ কেবল অন্যান্য জীবের মতো নয়, বরং আধ্যাত্মিক তথা আদর্শিক জীবও বটে। যৌক্তিকতার মানদণ্ডে উন্নত মানুষই প্রকৃত মনুষ্যত্বের মানদণ্ড। মহানবী [সা] বলেছেন, "পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের সুশিক্ষা দেয়ার চাইতে উত্তম আর কিছুই দিতে পারে না।" Stanely Hall যথার্থই বলেছেন, "If you teach your child the three 'R' Reading, Writing and Arithmetic and leave the 4th 'R' Religion you will set a 5th 'R' Rascality. তাই মহানবী [সা] প্রত্যেক নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক [ফরয] করে দিয়েছেন।

সংস্কৃতির উন্নয়ন

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির দর্পন। সংস্কৃতি হচ্ছে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, ধ্যান-ধারণা, নৈতিকতা, নিয়ম-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, সাহিত্য, ঐতিহ্য সব কিছুর সমাহার। মহানবী [সা] যে সাংস্কৃতিক সৌকর্য স্থাপন করেছিলেন তা মানবতার প্রকৃত মর্যাদা নিরূপণ করে দেয়। প্রিয়নবী [সা] যে সংস্কৃতি সংস্থাপন করলেন তার দিক-নির্দেশনা কুরআন মাজীদের "ঈমান আনো এবং সৎকর্ম করো" এই নির্দেশরই বাস্তবায়ন।

উপসংহার

পাপ-পঙ্কিলতা, অসভ্যতা ও অশ্লীলতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাই হচ্ছে তাকওয়ার মূল আবেদন। এর আলোকেই গড়ে ওঠে এক অনন্য সভ্যতা যা বিশ্ব মানব ইতিহাসে সুন্দরতম সভ্যতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর সে সভ্যতার; আলোকধারা পৃথিবীর মানুষকে আলোকিত করে আসছে যুগ পরম্পরা মহানবী [সা]-এর বদৌলতেই। প্রকৃতই মহানবী [সা] বিশ্বকে যে সভ্যতা শিক্ষা দিয়েছেন তা অনন্যতায় ভাস্বর। অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক নীতি, ধর্মীয় নীতি অর্থাৎ মানবজাতির প্রয়োজনের সর্বক্ষেত্রের জন্য তিনি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা দিয়েছেন ও সেগুলো স্থাপন করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ।" [সূরা আহযাব : ২১]

www.pathagar.com

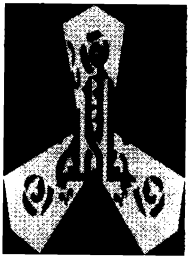

বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্

আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি, যাতে মানবজাতিকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা প্রদান করতে পারি। –আল হাদীস

শিক্ষা মানবতার চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যম, আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি। আত্মবিকাশ ও সুকোমলবৃত্তির পরিস্ফুটন ও জীবনের সকল সমস্যার দিকনির্দেশক। মানবজাতিকে নৈতিক শিক্ষার পবিত্র স্পর্শে একটি সুসভ্য ও সুশীল মানবিক গুণসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করতে যে মহামানব বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি আরবের নবী করুণার ছবি হযরত মুহাম্মাদ [সা]।

সমগ্র বিশ্ব যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] এমন সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও মানবিক সৌন্দর্যবোধের কলাকৌশল অর্জনকে ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে ওহীর জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে মানুষের লক্ষ কোটি বছরের অজানা রহস্যের সমাধান প্রদান করেন। তাঁর মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হয়। ইসলামের সূচনা তাই পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। প্রথম নাজিলকৃত ওহী তার বাস্তব প্রমাণ :

পড়ুন হে নবী! আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটরক্ত হতে। পড়ুন এবং আপনার রব বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন, যা সে জানত না। -আল কুরআন, সূরা আলাক।

সুশিক্ষিত জাতি গঠনের লক্ষ্যে মহানবী ঘোষণা করেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ। ঘোষণা করেন, "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর।" হে মানুষ! জেনে নাও, আমি তোমাদেরকে উত্তম চরিত্র অর্জনের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ্র পক্ষ হতে এ পৃথিবীতে শিক্ষকরূপেই প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ্ আমাকে এজন্য পাঠিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাদের তাওহীদ শিক্ষা দিতে পারি। আমি যেন মানুষের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও জুলুমের অবসান ঘটিয়ে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করতে পারি। আর তাজকিয়ায়ে নফ্স তথা

www.pathagar.com

মানুষের অন্তরের কলুষ-কালিমা দুরীভূত করে প্রতিটি মানুষকে ইনসানে কামিলরূপে গড়ে তুলতে পারি।

মহানবী [সা] নবুওয়তের সূচনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ নিজগৃহ হতে আরম্ভ করেন। প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা [রা]-কে ইহকাল ও পরকালের মুক্তির শিক্ষা প্রদান করেন। তারপর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা, চাচাত ভাই কিশোর আলী ও বন্ধু আবু বকর [রা]কে সর্বজনীন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জগৎবাসীর জন্য সুযোগ্য নাগরিক ও শ্রেষ্ঠ প্রশাসকরূপে গড়ে তোলেন।

চরম প্রতিকূলতা ও কাফিরদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় মানবতার নবী অতি গোপনে সাফা পর্বতের পাদদেশে সাহাবী হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম [রা]-এর গৃহে এক ঐশী শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেন। 'দারুল আরকাম' নামে খ্যাত এ শিক্ষাকেন্দ্রে নওমুসলিমগণ আল্লাহ্‌র নবীর সান্নিধ্যে আসতেন। মদীনা থেকে, সুদূর ইথোপিয়ায় গমনাগমনকারী সাহাবীগণ অতি গোপনে নবীজীর নূরানী শিক্ষায় আলোকিত হতেন। একদিন এ গোপন শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণকালীন নিজের ভুল ও আমিত্ব ত্যাগ করে মহানবী [সা]-এর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বীর ও মর্যাদাবান পুরুষ হযরত ওমর [রা]।

'মানব মুকুট'-এর প্রখ্যাত লেখক মুহাম্মাদ এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁর গ্রন্থের প্রস্তাবনায় লিখেছেন, "যেসব মহানপুরুষের আবির্ভাবে এই পাপ-পঙ্কিল পৃথিবী ধন্য হয়েছে, যাদের প্রেমের অমৃত সেচনে দুঃখ-তপ্ত মানবচিত্ত স্নিগ্ধ হয়েছে, যারা মানব সমাজের যুগ-যুগান্তরের কুক্ষিগত কালিমার মধ্য হতে প্রভাত সূর্যের মতো উত্থিত হয়ে পাপের কুহক ভেঙেছেন, ধর্মের নবীন কিরণ জ্বালিয়েছেন ও পতিত মানবকে সত্য ও প্রেমে সঞ্জীবিত করে নবজীবন লাভের পথে টেনে এনেছেন, ইসলাম ধর্মের প্রচার ও পরিপূর্ণতা দানকারী হযরত মুহাম্মাদ [সা] তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমাজউদ্দীন আহমদের মতে, [তিনি বলেন] "আমি জনাব চৌধুরীর সাথে একমত হয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে শুধু এটুকু সংযোজন করতে চাই– হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রনায়ক।"

পরশ পাথরের সংস্পর্শে এসে পরিত্যক্ত মাটির ঢেলা যেমন খাঁটি সোনায় পরিণত হয় ঠিক তেমনি আল্লাহ্‌র নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মানুষগণ এক একটি উজ্জ্বল প্রদীপের মতো জগৎকে আলোকোজ্জ্বল করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশিদীন, সাহাবায়ে আজমায়ীন, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, ইমামে আজমায়ীন ও যুগে যুগে আগত নবীর ওয়ারিস আলিম-ওলামা, হক্কানী পীর-মাশায়িখগণ মসজিদে নববী বিশ্ববিদ্যালয়ের আসহাবে সুফ্‌ফার এক একজন প্রতিনিধি। এঁরা মহানবীর শিক্ষা ও আদর্শকে বুকে ধারণ করে পৃথিবীর রূপ বদলে দিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শাসন-প্রশাসনে, ইন্‌সাফ ও আদলে, আর্তমানবতার কল্যাণে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবীর সুন্নাহ্ ছিল তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁরা এ দু'টিকে ধারণ করেছিলেন ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির বাহনরূপে।

একটি নয়াজাতির প্রতিষ্ঠাতা ও বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষকের পরিচয় কবি কত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন :

www.pathagar.com

"তব আহ্বানে মাটির পুতুল ত্যাজিয়া মানুষ সবে
শুরু করে দিলো আহাদের নাম গান,
অমার আঁধারে সত্য-সুরুষ উদিল মরুর নভে,
মানুষ জানিল : মানবতা মহীয়ান।

তোমার সত্য চিরন্তনের শক্তি-উৎস-মুখ :
মরু-সেনাদের বাজুতে বাজুতে দানিল নবীন বল;
নিখিল ধরণী তাদের সকাশে হেরে যেতে উৎসুক,
তাদের কৃপাণে ধূলিসাৎ হলো সকল মিথ্যা ছল।

একতার বাণী, সাম্যের বাণী প্রথম হাঁকিলে তুমি,
তুমিই শিখালে : মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই;
মিলনের গানে মুখরিয়া দিক্ জাগিল বিশ্বভূমি,
জানিল মানুষ : মানুষেরা ভাই ভাই।"

[বিশ্বনবী ॥ আবুল হাসান শামসুদ্দিন]

আধ্যাত্মিক জ্ঞান সাধক মহাবীর আলী [রা]-এর বিদ্যা শিক্ষার প্রসার ও প্রচারণা নবীজীর জ্ঞান নগরীতে প্রবেশের সিঁড়ি। নবীগৃহ ছিল আর এক শিক্ষাকেন্দ্র। জান্নাতে নারীকুলের সর্দার নবীকন্যা মহীয়সী ফাতেমা [রা] তাঁদের পুত্র হযরত হাসান ও হোসাইন [রা] তাঁর শিক্ষা মিশনকে এগিয়ে নেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রত্যেকেই ছিলেন অসামান্য বিদুষী। মা আয়েশা সিদ্দিকা [রা] সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি দীর্ঘ হায়াতে জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন।

প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদের মতে, "নবীজীর গোটা জিন্দেগী মানবতার জন্য আদর্শ পাঠ। যে কেউ তা থেকে শিক্ষা নিয়ে উপকৃত হতে পারেন। তিনি নীতি কথা প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, নৈতিকতা ও উচ্চ আদর্শ তার অস্থিমজ্জার সাথে একেবারে মিশে গিয়েছিল। কোনো শ্রমের কাজকে তিনি হেয় মনে করতেন না। কাপড় সেলাই, জুতা সেলাই, ঝাড়ু দেয়া, মেষ চরাণ, জ্বালানি কাষ্ঠ কুড়িয়ে আনা, রন্ধন, পরিখা খনন প্রভৃতি কোনো কাজ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না।"

শিক্ষা ও গবেষণাকে মহানবী আবেদের একটানা ইবাদত-বন্দেগীর চাইতে উত্তম মনে করতেন। মসজিদে নববীতে যখন সাহাবীদের দু'দলের অধিকাংশ যিকির-আযকার ও কিছুসংখ্যক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তখন নবীজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচকদের পাশে বসলেন। তিনি ঘোষণা করলেন– "এক ঘণ্টা চিন্তা-গবেষণা করা সারা রাত্রি জেগে ইবাদত-বন্দেগীর চাইতে উত্তম।"

এ মহামূল্যবান শিক্ষার আলোকে নবী পরবর্তী যুগে মুসলিম জনপদে শিক্ষা বিপ্লব সূচিত হয়। মদীনা, মক্কা, দামেস্ক, বাগদাদ, কুফা, সমরখন্দ-বোখারা, কায়রো, বসরা, শিরাজ, ইস্পাহান, আঙ্কারা, কর্ডোভা, গ্রানাডা এবং সুদূর দিল্লী পর্যন্ত শিক্ষা, গবেষণা ও নব নব আবিষ্কার সারা বিশ্বে মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করে।

www.pathagar.com

এই হলো মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুদূরপ্রসারী ফল। প্রতিটি মসজিদ এক একটি বিদ্যালয়। কুরআন হাদীস শিক্ষাকেন্দ্র। প্রতিজন ইমাম-মুয়াজ্জিন এক একজন মুয়াল্লিম, মুবাল্লিগ ও মুহাদ্দিস।

কী গৃহে, কী মসজিদে, কী পথ চলার কাফেলায়, কী রণাঙ্গনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহানবী [সা] এর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ বিদ্যমান।

আজও কেউ যদি তাঁর শিক্ষার আদর্শকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যায় তবে তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উপনীত হতে পারবেন। মহানবী জগতের সকল শিক্ষকের শিক্ষক। তাঁর জীবনই এ সত্যের একমাত্র সাক্ষ্য। পরবর্তী প্রজন্মে, যুগে যুগে তা বিকশিত ও প্রসারিত হয়েছে।

রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের কবিতা আমাদের তা-ই বলে যায় :

"হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি 'সিরাজাম-মুনিরা' তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুৎকণা-স্ফুলিঙ্গে লুকানো রয়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিন্নরাইন, আলী নবীন
ঘুম ভেঙে যায় আল ফারুকের হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।
তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখানো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদাত অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে
নিখিল ব্যথিত 'উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে।
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।
চলছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা বয়ে জিলানের বীর, চিশতী বীর
রংগিন করি মাটির সুরাহি নক্‌শবন্দের নয়নে নীর,
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায়বেরেলির জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিদ
ওরা গেছে বহি তোমার নিশান রেখে গেছে পথে সেই নিশানি,
তবু সে চলার শেষ নাই আর কোন দিন শেষ হবে না জানি।
লাখো শামাদান জ্বলে অফুরান রাত্রি তোমার রশ্মি স্মরি
সে আলো বিভায় মুখ তুলে চায় প্রাণ পিপাসায় এ শর্বরী।
তাদের সঙ্গে সালাম জানাই হে মানবতার শাহানশাহ্
হে নবী। সালাম : সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্।"

[সিরাজাম মুনিরা ॥ ফররুখ আহমদ]

www.pathagar.com

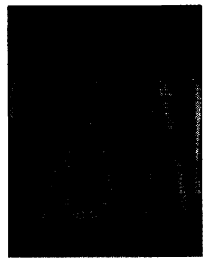

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতদার নবী মুহাম্মাদ [সা]

জাফর আহমাদ

মানব সভ্যতার ইতিহাসের সমস্ত উপাদানকে বারবার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যার পদচারণা ঐতিহাসিকের কলমকে নাড়া দিয়ে যায়, তিনি মুহাম্মাদ [সা] ছাড়া আর কে হতে পারেন? He is a great Hero of the world History. কারণ তিনিই তো পৃথিবীর বহু কাঙ্ক্ষিত প্রশংসিত 'আহমাদ'। মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর চরিত্রের পরিপূর্ণতা দিয়েই তাঁর নাম 'আহমাদ' রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন মানবজীবনের পূর্ণতা দানের জন্য। রাসূল [সা] বলেছেন, 'সব নবী একটি ঘরের অসংখ্য ইটের মতো যে ঘরের একটি ইট বাকি ছিল। তিনি এসেছেন সে ঘরের পূর্ণতা দানকারী ইট হিসেবে।' মানবজীবনের এমন কোন বাঁক নেই যেখানে তাঁর অবদানের ছোঁয়া লাগেনি। যার স্বীকৃতিস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে [জীবনব্যবস্থা] পূর্ণতা দান করলাম।" একজন মানুষ জীবনের কোনো একটি বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করে। ব্যক্তিজীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিভাগে পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু রাসূল [সা] জীবনের প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ বলেই প্রতিটি বিষয়ে তিনি অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। তাই জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি বাঁকে তাঁকে অনুসরণ করতে হবে অন্যথায় তা হবে অসম্পূর্ণ জীবনের অসম্পূর্ণ সমাধান।

আমানত একটি ব্যাপক পরিভাষাগত শব্দ। সাধারণ অর্থে এটি হলো 'একজন অপরজনের কাছে কিছু মালামাল গচ্ছিত রাখল, নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে আমানতদার ব্যক্তিকে যথাযথভাবে মালামাল ফিরিয়ে দিলো কিন্তু ব্যাপকার্থে আল্লাহর খলিফা হিসেবে খিলাফতের দায়িত্ব আদায় বা পালন করার নাম আমানতদারিতা। যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন তিনি একজন সত্যিকারের আমানতদার। অর্থাৎ প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এ আমানত [আল-কুরআন তথা খিলাফতের দায়িত্ব] পেশ করলাম। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না, তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তার স্কন্ধে তুলে নিলো।" [সূরা আহযাব : ৭২] আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, "অচিরেই আমি তোমার ওপর একটি ভারী কিছু রাখতে যাচ্ছি।" [সূরা মুযযাম্মিল : ৫]

সাধারণ এবং ব্যাপক উভয় অর্থে রাসূল [সা] ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতদার। নবুওয়তের আগে যেই সময় আমানতদারিতার কল্পনাই করা যেত না সে সময়ও তিনি আমানতদারিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষগুলোও তাঁকে আল-আমিন [বিশ্বস্ত] খেতাব দিতে কৃপণতা করেনি। নবুওয়তের পরও হিজরতের

www.pathagar.com

প্রাক্কালে জনগণের আমানত ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তিনি হযরত আলীকে [রা] দায়িত্ব দিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। ব্যাপকার্থে তিনি পরিপূর্ণ ও সঠিকভাবে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আমানতদারিতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন। পৃথিবী সাক্ষী, কালের সাক্ষী হয়ে আজো মজুদ আছে সুবিস্তৃত আরাফাতের ময়দান, যেখানটায় দাঁড়িয়ে পূর্ণাঙ্গ মহামানব বিশাল জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্নাকারে বলেছিলেন, "আল্লাহর দরবারে আমার সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কী বলবে? সাহাবীগণ বলেন, আমরা বলবো, আপনি আমাদের কাছে পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন এবং আপন কর্তব্য পালন করেছেন। তিনি আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে তিনবার বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।" এ সময় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয় : "আজকে আমি দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।" এরপর তিনি সব মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেন : "উপস্থিত ব্যক্তিগণ [এসব কথা] অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়তো বা কিছু উপস্থিত লোকের চেয়ে কিছু অনুপস্থিত লোক এ কথাগুলো অধিকতর ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে এবং সংরক্ষণ করবে।"

রাসূল [সা] এর উল্লিখিত ভাষণটির মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যেটি বাদ দিলে রাসূলের [সা] পুরো ভাষণটিই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে তা হলো, "উপস্থিত ব্যক্তিগণ [এসব কথা] অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিও। হয়তো বা কিছু উপস্থিত লোকের চেয়ে কিছু অনুপস্থিত লোক ও কথাগুলো অধিকতর ভালোভাবে মনে রাখতে পারবে এবং সংরক্ষণ করবে।" এ বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল [সা] বিশ্ব-মুসলিমের ওপর এক বিশেষ আমানত তথা গুরুভার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। এ কাজ ও দায়িত্ব থেকে কেউ মুক্তি পেতে পারেন না। অর্থাৎ দুনিয়ার শান্তি ও কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াতী কাজের কোনো বিকল্প নেই। এ বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসূল [সা] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআন ও আমার সুন্নত।" আল্লাহ তায়ালা বলেন : "তোমরাই হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে।" [সূরা আলে ইমরান : ১১০]

যারা আমানত রক্ষা করে না তাদেরকে খিয়ানতকারী বলা হয়। খিয়ানত করা কবিরাহ্ গুনাহ। খিয়ানতকারী একজন পূর্ণাঙ্গ মুনাফিকও বটে। মহান আল্লাহ তায়ালা এবং নবী [সা] কুরআন তথা মানবজীবন সুপথে পরিচালিত করার উত্তম গাইড হিসেবে আমাদের কাছে আমানত রেখেছেন সেটি যদি আমাদের ব্যক্তি-জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার আবশ্যিক দায়িত্ব পালন না করি, তবে আমানতের খিয়ানতকারীর মতো একটি মারাত্মক অপরাধ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে কুরআনের সমাজব্যবস্থা কায়েমের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। এবং আল কুরআনের আদেশ নিষেধকে গোপন করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। একধরনের ভুলপন্থা অবলম্বনের মারাত্মক শাস্তি সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণাই শুনুন এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করুন। আল-কুরআন বলেছে : "যারা আমার নাজিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও জীবনব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ তা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজ কীভাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাদের ওপর লানত করেছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীও তাদের ওপর অভিশাপ নিক্ষেপ করছে।" [সূরা আল-বাকারা :

www.pathagar.com

১৫৯] আল কুরআনে আরো উল্লেখ আছে যে, "বস্তুত যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলত নিজেদের পেট আগুন দ্বারা ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষণা করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। [সূরা আল-বাকারা : ১৭৪] আবার যারা কুরআনের কিছু অংশ পালন করে কিছু অংশের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ অবিশ্বাস কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কী শাস্তি হতে পার যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ, তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।" [সূরা আল বাকারা : ৮৫] এ আয়াতের আলোকে বিবেকের কান আর চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করুন আমাদের খিয়ানতের কারণে কীভাবে অনিশেষ এক ঘোর অমানিশা বিশ্ব মুসলিমকে গ্রাস করার নিমিত্তে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। বিবেককে একটু বলুন পৃথিবীটা এক চক্কর দেখে আসতে। কীভাবে সম-অধিকারের এ পৃথিবীটা মুসলমানদের জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। অথচ আল্লাহ তাঁর হাবিবকে বলেছেন, "ত্বা-হা। হে নবী আমি কুরআন এ জন্য নাজিল করিনি যে, তুমি এর দ্বারা কষ্ট পাবে।" [সূরা ত্বাহা : ১-২] এ আয়াতের আলোকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে তাহলে পৃথিবীজুড়ে এ কুরআনওয়ালা মুসলমানরাই আজ কষ্ট পাচ্ছে কেন, গোটা পৃথিবী তাদের জন্য কেন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। তাহলো আল কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া ও কুরআনের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেয়ার কারণে। সূরা ত্ব-হাতেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর কারণ বলে দিয়েছেন, "আর যে ব্যক্তি আমার জিকির [কুরআন] থেকে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়ার জীবন হবে সঙ্কীর্ণ, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম। তবে কেন আমাকে অন্ধ করে তুললে? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, এমনিভাবে যখন আমার আয়াতগুলো তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভুলে গিয়েছিলে। ঠিক সেভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এভাবেই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী এবং যে তার রবের আয়াতের ওপর ঈমান আনে না তাদের শাস্তি দিয়ে থাকি আর পরকালের আজাবই হচ্ছে খুব কঠিন এবং অধিক স্থায়ী।" [সূরা ত্ব-হা : ১২৪-১২৭]

এ কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং সুন্দর এক পৃথিবী অবলোকনের জন্য রাসূলের আদর্শে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে অর্থাৎ রাসূল [সা] আল্লাহর দেয়া আমানত তথা দায়িত্ব পালন করে পৃথিবীর সামনে মদীনা নামক ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করে আমানতদারিতার মডেল কায়েম করে গেছেন, আমাদেরকেও সেই মডেলের অনুসরণ করে আমানতের হক আদায় করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের [সা] দেয়া আমানত বা দায়িত্ব রাসূলের [সা] দেখানো পথ অনুযায়ী পালন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে সর্বোত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎ কাজ করে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমান।" [সূরা হা-মীম আস সিজদা : ৩৩] এ আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত তাফসিরকারক লিখেছেন "প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন এটি সেই সময়কার আয়াত যখন কোনো ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার কথা প্রকশ করতো সে হঠাৎ করেই অনুভব করতো যেন হিংস্র শ্বাপদ ভরা কোনো এক অরণ্যের গভীরে জেনেশুনে প্রবেশ করেছে যেখানে সবাই তাকে ছিঁড়ে ফেলে খাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং তার দিকে প্রাণপণে ছুটে আসছে।

www.pathagar.com

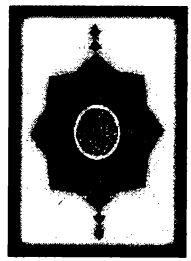

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী [সা]

ড. মো. জাহিদুল ইসলাম

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে 'মানবাধিকার' একটি বহুল আলোচিত বিষয়। সরলার্থে মানুষের সহজাত অধিকারই মানবাধিকার হিসেবে পরিচিত। মানুষের জন্মগত অস্তিত্ব ও স্বকীয়তার সংরক্ষণ, সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভার সৃজনশীল বিকাশ এবং মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনের অধিকারকে সমুন্নত রাখার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার স্বত্বই হচ্ছে মানবাধিকার। মানবাধিকার একটি যৌগিক শব্দ।

জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী মানবাধিকার হলো মানুষের সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য ও অলঙ্ঘনীয় এমন কিছু জন্মগত অধিকার ও অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা, যা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেককে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আত্মিক আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। লক্ষণীয় যে, মানবাধিকার শুধুমাত্র মৌল-মানবিক চাহিদা পূরণই নয়, মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন, চিন্তা-বিশ্বাস, প্রতিভার বিকাশ ও সৃজনশীলতার লালন ইত্যাদিও এর আওতাভুক্ত।

পৃথিবীর প্রারম্ভিক যুগ থেকে দুর্বলের ওপর সবলের নিয়ন্ত্রণ কিংবা মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণি কর্তৃক বিপুল জনগোষ্ঠীর ওপর শাসন-শোষণকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বহুবিধ নিয়ম-নীতি, আইন-প্রথা আরোপিত হয়েছে। ফলে মানবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে অধিকার বঞ্চিত হয়েছে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী। তাই বরাবরই মানবসমাজ স্বীয় অধিকার পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা এবং শৃঙ্খল মুক্তির জন্য জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। যুগে যুগে রচিত হয়েছে মানবাধিকারের লিখিত ও মৌলিক সনদ।

অধুনাপ্রাপ্ত তথ্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর প্রাচীনতম যৎসামান্য মানবাধিকার সম্বলিত লিপিবদ্ধ আইন [প্রণয়নকাল-আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২১৩০-২০৮৮] ব্যাবিলনীয় রাজা হাম্মুরাবী প্রণয়ন করেন। যা ইতিহাসে 'ব্যাবিলনীয় কোড' বা 'হাম্মুরাবী কোড' হিসেবে খ্যাত। এছাড়াও প্রাচীন গ্রিক, রোম, মিশরীয়, চৈনিক ইত্যাদি সভ্যতায় নাগরিকদের অংশগ্রহণে অধিকার প্রয়োগের কথিত প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে মানবজাতির যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটে মহানবী [সা]-এর মাধ্যমে ইসলামের বদৌলতে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, মহানবী [সা]-এর জীবনাদর্শ,

www.pathagar.com

হিলফুল ফুযূল, মদীনার সনদ, বিদায় হজে প্রদত্ত ভাষণ, মুহাম্মাদ [সা]-এর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, শাসন, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি মানবাধিকারের যুগশ্রেষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক প্রামাণ্য দলিল ও জীবন্ত সনদ। কাল পরিক্রমায় মানবগোষ্ঠী ইসলামের মৌল থেকে বিচ্যুত হওয়ায় মানবাধিকার পুনঃবিপর্যয়ে নিপতিত হয়। ফলে পুনরায় এটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১০৩৭ সালে বৃটেনে রাজা ২য় কনরাড ফরমান জারি করে পার্লামেন্টের ক্ষমতা নির্ধারণ করে দেন। তবে ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে আইবেরিয়ান ব-দ্বীপে সামন্ত প্রভু ও অভিজাত শ্রেণি রাজা আলফনসোর নিকট থেকে অন্যায় আটকের নীতিমালাসহ কিছু মৌলিক অধিকার আদায় করে নেয়। ১২২২ খ্রিস্টাব্দে হঙ্গেরীর রাজা দ্বিতীয় এন্ড্রু 'স্বর্ণ আদেশ' নামে অভিজাত শ্রেণির জন্য দীর্ঘ তালিকা সম্বলিত অধিকার বাস্তবায়নের ঘোষণা দেন। বর্তমান মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বিবেচনা করা হয় ১২১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুন ইংল্যান্ডের রাজা জন কর্তৃক রাজা ও ব্যারণদের সম্পাদিত Magna Carta চুক্তি। বৃটেনে এটি ছিল মৌলিক অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টিকারী দলিল। ১৩৫৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট Magna Carta-এর স্বীকৃতি দিয়ে আইনগত সমাধান অন্বেষণের বিধান মঞ্জুর করে। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে মেকিয়াভেলীর দর্শনের জয়জয়কার ছিল। এছাড়া ইংল্যান্ডের Charter of English Liberties চুক্তি, ১৬২৮ সালের The petition of Rights ও ১৬৮৯ সালের The Bill of Rights দলিলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। ১৬৯০ সালে জনলক Treaties on Civil Government গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক চুক্তির মতবাদ পেশ করেন। ১৭৬২ সালে ফরাসী দার্শনিক রুশো সামাজিক চুক্তি শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যা পরবর্তীতে ফরাসী বিপ্লবের পথ সুগম করে। আমেরিকাবাসী ১৭৭৬ সালের ২২ জুন ভার্জিনিয়াতে একটি Bill of Rights গ্রহণ করে। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই জর্জ ওয়াশিংটনের The Declaration of endependence ঘোষণা এবং ১৭৮৯ সালের ২৬ আগস্ট ফ্রান্সের Declaration of Rights of man and of the citizen নামক ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র উল্লেখযোগ্য। বিশেষত আমেরিকা ও ফ্রান্সের মানবাধিকার আন্দোলনের প্রভাব উনবিংশ ও বিংশ শতকে গোটা আমেরিকা ও ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলে। কালক্রমে মানবাধিকারের এই আন্দোলন এশিয়া, আফ্রিকাসহ সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করে।

১ম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পটভূমিতে জার্মানিসহ ইউরোপীয় বিভিন্ন নব রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গঠন করা হয় লিগ অব নেশনস। এ লিগ অব নেশনস বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকারের কোনো প্রকার রূপরেখা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে গর্জে উঠে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। এই সর্বনাশা ধ্বংসযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে সমগ্র বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মানবিকতার খোঁজে আত্মহারা হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক এইচ জি ওয়েলস তাঁর New world order গ্রন্থে মানবাধিকারের একটি সনদপত্র ঘোষণার পরামর্শ দেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট স্বাধীনতার সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কংগ্রেসের নিকট আবেদন করেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে মানবাধিকারের সাথে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আটলান্টিক ঘোষণায় স্বাক্ষর করা হয়। ফ্রান্স তার ১৯৪৬ সালের সংবিধানে ১৯৮৯ সালের মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত

www.pathagar.com

করে। একই বছর জাপান সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংযুক্ত করে। ইতালীও তার সংবিধানে ১৯৪৭ সালে মানবাধিকারের ঘোষণা শামিল করে। ১৯৪৮ সালের বোগোটা সম্মেলনে আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ মানবাধিকার ও কর্তব্যের ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯ ও ২০ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সমূহের সংযোজনের জয়জয়কার পড়েছিল।

১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকারের পক্ষে পরিচালিত চেষ্টা-সাধনার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের 'মানবধিকার সনদ' ঘোষিত হয়। ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘের অধীন UNASCO নামের আরেকটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এর পক্ষ থেকেও মানবাধিকারের কয়েকটি সুপারিশ করা হয়। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার বলতে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত The Universal Declaration of Human Rights বা "মানবাধিকার সনদ"-কেই বুঝায়। বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল এই ঘোষণাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ অভিধায় অভিহিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীজুড়ে একই চ্যালেঞ্জ তাদের আবর্তিত করেছিল। যা বহুলাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

মানবাধিকারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার সনদের পূর্বে ইসলাম ব্যতীত যে সমস্ত সনদ প্রণীত হয় তা ছিল রাজা-বাদশাহ ও সামন্ত অভিজাত শ্রেণির বিষয়। এক্ষেত্রে শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট সাধারণ জনগণ ছিল বঞ্চিত। তবে জাতিসংঘ এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হয়ে সাধারণ মানুষকে লিখিত অধিকার প্রদানে দয়ার্দ্র হয়েছে। আজ পঁয়ষট্টি বছর অতিক্রম হলেও জাতিসংঘ মানবাধিকার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু জাতিসংঘ আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়ত মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে; অমানবিক পশুশক্তি কর্তৃক দলিত-মথিত, লাঞ্ছিত, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। বিশ্বের পরাশক্তি জাতিসমূহ দুর্বল জাতিসমূহের ওপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নগ্ন থাবা বিস্তার করছে। অনেক দেশে গণতন্ত্রের লেবাসে, কোথাও একনায়ক কিংবা স্বৈরশাসকের বেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কোথাও জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস চলছে। কিন্তু জাতিসংঘ নামক বিশ্ববিবেক আজ সাক্ষীগোপাল কিংবা কাজীর গরু, যা কেবল কেতাবে আছে বাস্তবে নেই।

সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই ব্যাপকতা সম্প্রতি গোটা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলছে। বিভিন্ন সম্মেলনে, সংসদে, সুপারিশমালায়, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে, আলোচনায়, লেখনীতে, মিডিয়া জগতে এর কারণ, উৎপত্তি, প্রকৃতি, কুফল, প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়ে আসছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হাজারো প্রচেষ্টা, শত শত কোটি ডলারের বাজেট শুধু ব্যর্থতার হাতছানি দিয়েই ফিরছে। তাই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মানবতাবিরোধী যে জিঘাংসা প্রতিনিয়ত সীমাহীন শংকা ও উদ্বেগ তাড়িত করে, তার সমাধান বা কর্মপদ্ধতি কী? এর অনুসন্ধানস্বরূপ মানবাধিকার ও সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয়, একটি মাত্র আদর্শ স্বীয় প্রজ্ঞা প্রদর্শিত পন্থায় সমস্যাটির সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবনতি মোকাবেলায় পুরোপুরি সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

www.pathagar.com

আর এ সাফল্য এসেছে অতি অল্প সময়ে, এক প্রজন্মেই। সাফল্যমণ্ডিত কার্যকর এই আদর্শের নাম হলো ইসলাম, যা এসেছে সমগ্র বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং বাস্তবায়িত হয়েছে মানবতার মুক্তি দূত সভ্যতার বাহক মহানবী মুহাম্মাদ [সা]-এর মাধ্যমে।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের সেই মহা তমসাচ্ছন্ন যুগে পৃথিবীর বুকে আলোর দিশারি হিসেবে আবির্ভূত হন রাসূল মুহাম্মাদ [সা] গোটা পৃথিবী তখন মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নৈতিক অবক্ষয়ের চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই চলছিল মানবতা বিধ্বংসী সন্ত্রাস, জিঘাংসা, হত্যা, বর্বরতা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, প্রতিশোধ আর আত্মশ্লাঘার প্রতিযোগিতা। এমনই এক দুঃসময়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানববিধ্বংসী এ জাতীয় কার্যকলাপের মূলোৎপাটন ও প্রতিরোধ এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে মহানবী [সা] এক কার্যকরী, যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে মহানবী [সা] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র পরিণত হয় মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত, শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল কল্যাণ রাষ্ট্রে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার রূপকার মহানবী মুহাম্মাদ [সা] মানব পরিবারের সকল সদস্যের জন্য সর্বজনীন, সহজাত, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অলঙ্ঘনীয় যে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা প্রধানত ছয়টি বিষয়ে বিস্তৃত ছিল। এক: রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়, দুই: অর্থনৈতিক, তিন: সামাজিক, চার: ধর্মীয়, পাঁচ: নৈতিক, ছয়: শিক্ষা-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক।

১. রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়

রাজনৈতিক অধিকার হলো মানবজাতির অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার। সাধারণত দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডপরিচালনায় এবং শাসনকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। পবিত্র কুরআন মানবজাতির সামনে রাজনৈতিক অধিকারের ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা পেশ করেছে। এ নীতিমালা বিশ্বমানবতার অগ্রদূত রাসূল মুহাম্মাদ [সা] মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রে সফলতার সাথে প্রয়োগ করে মানবজাতির সামনে পবিত্র কুরআন প্রদত্ত রাজনৈতিক অধিকারের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করেছেন। এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমঅধিকার, জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমিতি, সংগঠন ও জনমত গঠন, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার, পররাষ্ট্রনীতি, সামরিক অভিযানে শৃঙ্খলতা, ভারসাম্যপূর্ণ যুদ্ধনীতি ও বন্দিনীতি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন, রাষ্টপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের জবাবদিহিতা পরামর্শভিত্তিক শাসনকার্য পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক অধিকারের চরম দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল আহ্বান হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাই কোনো ব্যক্তি, দল বা জনগণ ক্ষমতার মালিক নয়, একমাত্র আল্লাহই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই" [আল-আন'আম : ৬২] "মহান স্রষ্টা আল্লাহর জন্যই যাবতীয় বিধান" [আল-মুমিন : ১২]। তাই আল্লাহর বিধান মতে মানুষ আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। মানুষ কোনো অবস্থাতেই রাষ্ট্র কিংবা জনগণের প্রভু না হয়ে মানুষের সেবক হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবে মাত্র। বলা হয়েছে, "তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে তার খলীফা নিযুক্ত করেছেন"

www.pathagar.com

[আল-আন'আম : ১৬৫]। জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান সম্পর্কে মহানবী [সা] বলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই জিম্মাদার বা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে" [বুখারী]। মদীনার সনদের ১৩ নং শর্তে বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে যে, খোদাভীরু ঈমানদারদের ঐক্যবদ্ধ হস্ত ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হবে, যারা বিদ্রোহী, বিদ্বেষপোষণকারী, অত্যাচারী, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী। এক্ষেত্রে সকলে সমভাবে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, যদি কারো নিকটাত্মীয় এমনকি পুত্রও হয়। ইনসাফপূর্ণ সুবিচারের ক্ষেত্রে আল-কুরআনে বলা হয়েছে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে যখন কোনো ব্যাপারে তোমরা ফায়সালা করবে, পূর্ণ সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফের সাথে ফায়সালা করো, আল্লাহ তোমাদের কতই না ভালো উপদেশ দিচ্ছেন" [আন নিসা: ৫৮]। মহানবী [সা]-এ বিষয়ে বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সর্বদা নিরপেক্ষ ইনসাফ কর। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে জেনে রেখ, নিঃসন্দেহে আমি তারও হাত কেটে দিব" [বুখারী, কবি হাসানুল বারি। মুসলিম কবি কাতরিস সারিকি]। অন্য ধর্মাবলম্বী তথা সংখ্যালঘু নাগরিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিকের ওপর নির্যাতন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে হাশরের ময়দানে আমি তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব" [আবূ দাউদ]।

এভাবে মহানবী [সা] উপযুক্ত প্রতিটি বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান ও সকল দায়িত্বশীলগণকে সরাসরি জবাবদিহিতার আওতায় এনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় অধিকারকে বাস্তবসম্মতভাবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

২. অর্থনৈতিক

মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকারের অন্যতম প্রধান হলো অর্থনৈতিক অধিকার। কেননা মানুষের প্রথম ধাপ থেকে প্রতিটি পদক্ষেপে অর্থনীতির অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক অধিকারে মানুষ লাভ করে প্রয়োজন মোতাবেক সম্পদ অর্জন ও ভোগ করার মালিকানা; সম্পদকে কুক্ষিগত ও পুঞ্জীভূত করার অধিকার লাভ করে না। আইনসঙ্গত স্বাধীন উপায়ে সে সম্পদ উপার্জন করে সচ্ছল হতে পারবে, কিন্তু এ সম্পদে অসচ্ছলদের করুণা নয়, অধিকার থাকবে। মুহাম্মাদ [সা] প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রাষ্ট্রে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের নিশ্চয়তা, বৈধ জীবিকা অর্জন, সম্পদের মালিকানা লাভ ও সংরক্ষণের অধিকার, শ্রম ও শ্রমিকের অধিকার, যোগ্যতানুযায়ী কর্মসংস্থান, ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার, পারস্পরিক লেনদেন, যাকাত ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাস্তবসম্মতভাবে।

মহানবী [সা] প্রবর্তিত অর্থনৈতিক অধিকারে সমতা বিধান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সচ্ছল ব্যক্তির অর্জিত সম্পদের মধ্যে অসচ্ছল-বঞ্চিত মানুষের অধিকার রয়েছে। সম্পদ উপার্জন ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রে বৈধতা অপরিহার্য। পবিত্র কুরআন মানবজাতিকে এ মানবিক দায়িত্ব পালনে বারবার জোর তাগিদ দিয়েছে। বলা হয়েছে, "তাদের সম্পদের ওপর অভাবী-বঞ্চিত মানুষের অধিকার রয়েছে" [আল-যারিয়াত: ১৯]। অন্যত্র বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসীগণ!

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে তোমরা একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যবসা ব্যতীত" [আন-নিসা : ২৯]। ইসলামী রাষ্ট্র এর রাষ্ট্র প্রধান ও প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক অধিকার সমান চোখে দেখে। এ অর্থ-প্রশাসনের মূল চালিকাশক্তি আল-কুরআনে সম্পদকে ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত করার স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এর মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়, ধনবৈষম্য কমে, সামাজিক বৈষম্য নির্মূল হয় এবং শ্রেণি সংঘাতের অবসান ঘটে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল বা ধনাগার সকল নাগরিকের সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। রাষ্ট্রপ্রধান, কিংবা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা সাধারণ জনগণ কারোরই একচেটিয়া অধিকার বায়তুল মালে নেই। বায়তুলমাল বা কেন্দ্রীয় কোষাগার সম্পর্কে রাসূল [সা] বলেন, "আমি তোমাদেরকে দানও করি না, নিষেধও করি না, আমি তো বণ্টনকারী মাত্র। আমাকে যেরূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সেভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন করে থাকি।"

রাসূল [সা] প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যাকাত ব্যবস্থাকে আল্লাহ সম্পদাধিকারীদের সম্পদের পবিত্রতা এবং তাদের জন্য আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের এক মহামাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যাকাত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যাকাত দাও, যাকাত দানকারী প্রকৃতপক্ষে তার মাল বর্ধিত করে [আর-রূম : ৩৯]। এভাবে মহানবী [সা]-এর প্রশাসন বায়তুল মাল, যাকাত, উশর, সাদাকাতুল ফিতর, আওকাফ, আমওয়াল আল-ফাদিলা, নাওয়াইব, মালে গনীমাহ, খুমুস, আল-ফাই, মুক্তিপণ, কর্যে হাসানাহ, হাদিয়াহ, জিযিয়া, খারাজ ইত্যাদি প্রবর্তন করে এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রমজীবীদের সকল সমস্যার সার্বিক ও ন্যায়ানুগ সমাধান এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে মহানবী [সা] বলেন, "তোমরা মজুরের শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি দিয়ে দিবে" [ইবন মাজাহ]। অন্যত্র তিনি বলেন, "তোমাদের চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসীরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে যেন তার ভাইকে তা-ই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাকে যেন তা-ই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেন তার ওপর না চাপায়" [বুখারী, মুসলিম]।

৩. সামাজিক

মহান আল্লাহ মানব প্রকৃতিতে এমন কিছু উপাদান সংযোজন করেছেন যা মানুষকে সামাজিক বলয়ে থাকার প্রেরণা জোগায়। মানুষের পারস্পরিক জৈব ও সামাজিক নির্ভরশীলতা সমাজ সৃষ্টির প্রধান উৎস। সমাজ ব্যতীত রাষ্ট্র কিংবা জাতি অচিন্তনীয়। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, তিনিই তোমাদের হৃদয়কে জুড়ে দিলেন, ফলে তোমরা তার অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় পরস্পর ভাইয়ে পরিণত হলে" [আলে ইমরান : ১০৩]। মহানবী [সা] এ সম্পর্কে বলেন, "একজন মুমিন অপর মুমিনের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করবে

www.pathagar.com

না, তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে না। যে তার মুমিন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন" [বুখারী]। অন্যত্র বলেছেন, "তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবে না, তার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করবে না" [বুখারী]। সমাজবদ্ধভাবে চলার ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে অপর মানুষের ওপর তার যথেষ্ট অধিকার রয়েছে। মহানবী [সা] প্রদর্শিত শাশ্বত জীবন ব্যবস্থায় সামাজিক অধিকারের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যা তিনি বাস্তবায়নে ত্রুটি করেছেন। কন্যা শিশু ও নারী সমাজের অধিকার, বিবাহ ও পরিবার গঠন, স্বামী-স্ত্রী-সন্তান এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার, প্রতিবেশী ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা, ইয়াতীম-বিধবা, নিঃস্ব-অসহায়-নিরন্ন, অধিকার বঞ্চিত মযলুমের অধিকার, অতিথি আপ্যায়ন, মুসাফির-পথহারাদের মূল্যায়ন, চিকিৎসা সেবা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্মানসহ যাবতীয় সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মহানবী [সা] তৎকালীন অশান্ত সমাজে শান্তির সমীরণ প্রবাহিত করেছিলেন। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, "নিজের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, চলার সাথী, প্রবাসী এবং অধীনস্থদের সাথে ভালো ব্যবহার কর" [আন-নিসা : ৩৬]।

মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত বৈষম্যহীন সামাজিক অধিকারে আমরা দেখতে পাই, পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিই মানব জীবনের সারনির্যাস। এখানে পুরুষ জাতির পাশাপাশি নারী জাতির, পিতার পাশাপাশি মাতার, স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর, ভাইয়ের পাশাপাশি নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীর, মালিক-মনিবের পাশাপাশি শ্রমিক-খাদিমের, শাসকের পাশাপাশি শাসিতের অধিকারের কথা বলা হয়েছে নিরপেক্ষভাবে। এভাবে সামাজিক অধিকার ও কর্তব্যের প্রতিটি দিক ও কোণ সুন্দর ও সুচারুরূপে বর্ণিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে মহানবী [সা]-এর কল্যাণমূলক সমাজে। মহানবী [সা]-এর এই সমাজবদ্ধতা শুধুমাত্র কানুনী বাহ্যিক ঐক্য নয় বরং এটি বাইরে যেমন সকলকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে, তেমনি ভেতরেও সকলকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ ভ্রাতৃত্ব সর্বব্যাপী বিস্তৃত, ব্যাপক ও সর্বজনীন। এ ঐক্য সংকল্প ও হৃদয়াবেগের ঐক্য, বিশ্বাস ও মানবতার ঐক্য, সীমাহীন ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের সামগ্রিক ঐক্য। সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের এই নিবিড় ভালোবাসাকে উপলব্ধিতে আনার জন্য মহানবী [সা] বলেন, "নিশ্চয় পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শনে মুমিনরা একটি দেহের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ কষ্ট অনুভব করে, তখন তার জন্য গোটা দেহই নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকে"। আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত মহানবী [সা] রোগীর পরিচর্যা সম্পর্কে বলেন, "যখন কেউ রোগাক্রান্ত হয়, তার পরিচর্যা করো" [মুসলিম]। অন্যত্র বলেছেন, যে ব্যক্তি রোগীর পরিচর্যা করতে যায়, সে রহমতের দরিয়ায় প্রবেশ করে। আর যখন সে রোগীর কাছে বসে, তখন রহমতের মধ্যে ডুবে যায়" [মুসনাদে আহমদ]।

৪. নৈতিক

যে সকল অধিকার প্রশাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের গণ্ডির বাইরে এবং যেগুলো বলবৎ করার দায়িত্ব মানুষের বিবেক ও সজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে তার সবগুলোই নৈতিক অধিকার। নৈতিকতা সম্বলিত যাবতীয় গুণাবলি সকল প্রকার সৎকর্ম ও কল্যাণের উৎস। নৈতিক বিধান

www.pathagar.com

মানুষকে দায়িত্ব-কর্তব্য ও যোগ্যতা উভয়ের জন্য একযোগে দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করে। সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপ এবং উন্নতির সর্বশেষ ধাপে উন্নীত হওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হওয়ার জন্য অভ্যস্ত করে তোলাই নৈতিক বিধানের লক্ষ্য। মহানবী [সা] পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, চরিত্র বা নৈতিকতা মানুষের অভ্যন্তরীণ বা আন্তরিক অবস্থার নাম, যা পর্যবেক্ষণের আওতাবহির্ভূত। তাই তিনি মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণাদায়ী শক্তি, মানসিক জীবনের গঠন ও নির্মাণের চিন্তা-চেতনা, আকীদা-বিশ্বাস ও ঝোঁক প্রবণতাকে আইনের আওতায় না এনে এগুলো গঠনের জন্য প্রশিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্যক্তি পর্যায়ে মানুষ যদি নৈতিক আদর্শে উজ্জ্বলতম নিদর্শন হতে পারে, তাহলে ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে জাতি বা রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র থেকে কল্যাণময় এক সুনির্মল বিশ্ব উপহার দেয়া সম্ভব। তাই তিনি শ্লীলতার প্রসার, অশ্লীলতা প্রতিরোধ, সৎকর্মের বিকাশ, অসৎকর্মের বিনাস, অনধিকার চর্চা থেকে বিরত, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা, কটু ভাষণ-গালাগাল, গীবত-চোগলখুরী থেকে বিরত, লোকসম্মুখে লজ্জা না দেয়া, উপহাস-তুচ্ছজ্ঞান-অপবাদ-ধোঁকা না দেয়া, হিংসা বিদ্বেষ না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া, কর্মে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, ক্ষমা, উদারতা, ধৈর্য, সু-পরামর্শ দান ইত্যাদি নৈতিক অধিকারের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবী [সা]-এ সম্পর্কে বলেন, "কোনো কটুভাষী ও বদ-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না" [আবূ দাউদ], "কিয়ামতের দিন আমার দৃষ্টিতে সবচাইতে অভিশপ্ত ও দূরে থাকবে বাচাল, অশ্লীলভাষী, জ্ঞানের মিথ্যা দাবিদার ও অহংকারী ব্যক্তি" [তিরমিযী], "তাদেরকে কোনো দোষ বা গুনাহর লক্ষ্য বানিয়ে শরমিন্দা বা অপমানিত করো না" [তিরমিযী]

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তোমরা হলে দুনিয়ার সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল [আলে 'ইমরানঃ ১১০]। মহানবী [সা]-এ সম্পর্কে বলেন, "অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। অতঃপর তোমরা দু'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না" [তিরমিযী]। এভাবে মহানবী [সা] ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিটি মানুষকে আত্মগঠনমূলক মহৎ গুণাবলির সমন্বয়ে সোনার মানুষে পরিণত করেছিলেন। ফলে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর ও বাস্তব পদ্ধতি হিসেবে বিশ্বমানবতায় উপস্থাপিত হয়।

৫. ধর্মীয়

ধর্মীয় অধিকার একটি অন্যতম মানবাধিকার। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানুষের চিন্তা, বাক, কর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে মানবজাতিকে সর্বজনীন ধর্মীয় অধিকার প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "ধর্মের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। একথা সত্য যে, সত্য ও অসত্যের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে" [আল-বাকারাহঃ ২৫৬]। মদীনার ইসলামী সমাজে মহানবী [সা] সাম্প্রদায়িকতাকে মুছে দিয়ে ভিন্নধর্ম, ভিন্নচিন্তা-চেতনা,

www.pathagar.com

পরমত সহিষ্ণুতা, সহ অবস্থান ও সহমর্মিতা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, কোনো মানুষের ওপর বলপূর্বক কোনো ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড চাপিয়ে দেয়া যাবে না, বিবেকের দাবি দলিত করে ধর্মান্তরিত করা এবং ধর্মীয় নেতা ও উপাসনালয়ের অবমাননা করা যাবে না। এ ভাষ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার কোনো অবকাশ নেই। কোনো অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করলে তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার দান এবং জানমাল ও ইজ্জতের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, স্বাধীন ধর্মমত পোষণ ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে। এভাবে মহানবী [সা] ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সুষম অধিকার প্রদান করে যে উদারনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। রাসূল [সা]-এ সম্পর্কে বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ [অমুসলিম] নাগরিকের ওপর যুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের বাইরে কাজ করতে বাধ্য করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াব" [আবূ দাউদ]।

৬. শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মানুষের জীবনে শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রয়োজন মৌলিক। তবে অন্যান্য মৌলিক চাহিদার সাথে এর একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কেননা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করে, আর শিক্ষা-সংস্কৃতি নৈতিকতার ন্যায় ভেতরগত আসল সত্তার চাহিদা পূরণ করে। আর এ জাতীয় সু-শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন করে মহানবী [সা] শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন, "পড়, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা সে জানত না" ['আলাক: ১, ৪, ৫]। শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে মহানবী [সা] বলেন, "প্রতিটি মুসলিমের ওপরই 'ইলম শিক্ষা করা ফরয" [ইবন মাযাহ]। অন্যত্র তিনি বলেন, "একজন ফকীহ বা দ্বীনের গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি শয়তানের পক্ষে এক হাজার আবেদের তুলনায় বেশি ক্ষমতাবান" [তিরমিযী]।

মহানবীর [সা] শিক্ষায় মূর্খের মতো জীবন পরিচালনার অবকাশ নেই। বস্তুবাদী শিক্ষার কুফল অপনোদন করে নিজের হৃদয়কে সঠিক ও সত্য জ্ঞান দিয়ে আলোকিত করে সমাজে কল্যাণময় ভূমিকা রাখাই হলো মহানবীর শিক্ষা। মহানবী [সা]-এর জীবনে সাহিত্যের ঐতিহ্যিক ভিত্তিভূমি অত্যন্ত বাস্তব হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রাসূল [সা] নিজে কবি না হয়েও উদার কাব্য-শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ইসলামকে এমনভাবে সিক্ত করেছেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সাহিত্য সম্পর্কে রাসূল [সা]-এর সূক্ষ্মদর্শী বিবেচনা, প্রজ্ঞাপূর্ণ সমালোচনা, উদার পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে কল্যাণীয় পরিবর্তন বিশ্বের কবি সমাজের অন্তরে শক্তি-সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছে। সকল অপসংস্কৃতির জীর্ণতাকে দূর করে মহানবী [সা] সাংস্কৃতিক জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন।

উপর্যুক্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মাণ হয় যে, আল-কুরআনের অমোঘ বাণী, সুন্নাহর বিভিন্ন দিক ও বিভাগ, হিলফুল ফুযূল, বায়আতুল 'আকাবা, মদীনার সনদ, বিদায় হজের ভাষণ ইত্যাদি লিখিত সনদের পাশাপাশি বাস্তব রূপায়ণে মহানবী [সা] মানবাধিকারকে বিস্ময়করভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সংস্থাপন, শিক্ষা-সভ্যতার সম্প্রসারণ এবং

www.pathagar.com

প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন। মহানবী [সা] প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ও সুযোগ্য সাহাবীগণ দক্ষতা, সততা, দূরদর্শিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা ও জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যে অভূতপূর্ব প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, মানব সভ্যতা ও প্রশাসনিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তা চির অম্লান। তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা, কার্যক্রম ও দৃষ্টান্ত আজকের মুসলিম উম্মাহর গর্বের বিষয়; বিশ্ববাসীর জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় মডেল।

মানবাধিকার সনদের দীর্ঘ ইতিহাস পেরিয়ে জাতিসংঘের The Universal Declaration of Human Rights আমাদের মাঝে সমুপস্থিত। এর অধিকাংশ ধারা মহানবী [সা]-এর আদর্শিক কল্যাণ রাষ্ট্র থেকে সংগৃহীত হলেও কার্যকরণ, বাস্তবায়ন ও তদারকীর অভাবে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও শান্তির অভাব প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী মানুষ আজ চরম ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, বর্বরতা, পাশবিকতা, দলন-পীড়ন, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নৈতিক অবক্ষয় ইত্যাদি মানবতা বিবর্জিত যাঁতাকলে পিষ্ট।

বর্তমান প্রেক্ষাপটেও দেশে দেশে, বিভিন্ন জনপদে বিশেষত বাংলাদেশে লক্ষণীয় যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আদর্শিক সকল পর্যায়ে অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছি আমরা। দিনে-দুপুরে, লোকসম্মুখে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, ধ্বংস, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, জিঘাংসা, রাহাজানি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, জ্বালাও-পোড়াও, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল, অধিকার হরণ, প্রগতির নামে কুসংস্কার লালন, সুদ-ঘুষ ইত্যাদি বিকৃত মানসিকতা ও নৈতিক অবক্ষয় আমাদের সমাজকে কলুষিত করে ফেলেছে। মানবাধিকারের প্রবক্তাগণই প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। তাই আজ প্রমাণ ও বাস্তবায়ন করার সময় এসেছে, মহানবী [সা] প্রদর্শিত মানবাধিকারের আদর্শই কেবল বিশ্ব মানবতার সামগ্রিক কল্যাণ, মুক্তি ও সফলতার সর্বজনীনতাকে নিশ্চিত করতে পারে; কুরআনের অমোঘ বাণী আর রাসূলের সুন্নাহর আদর্শ গ্রহণেই রয়েছে শান্তিকামী মানুষের পথের দিশা। বিশ্ব মানবতা যেন হয় সর্বজনীন। অধিকার বঞ্চিত বনি আদম যেন প্রাপ্ত হয় তার মৌলিক প্রাপ্য, এই প্রত্যাশা আমাদের।

www.pathagar.com

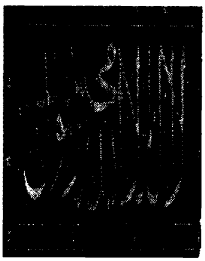

আদর্শ জাতি গঠনে মুহাম্মাদ [সা]-এর অবদান

ড. মীর মনযুর মাহ্‌মুদ

কুরআনুল কারীমের ভাষ্যানুযায়ী দু'জন মানব-মানবীয় মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবজাতির সূচনা। এ সম্পর্কে দার্শনিক, সমাজ গবেষক বা চিন্তাবিদগণ যাই বলুন না কেন, কুরআন বর্ণিত তথ্যই সন্দেহাতীতভাবে সঠিক এবং এটি আমাদের ঈমান-আকীদার অংশ। মানবজাতি আল্লাহ তা'আলার একান্ত পরিকল্পনাপ্রসূত এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আদি পিতা। আদম [আ] কেবল পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী। যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাপ্ত ওহীর নির্দেশনার আলোকেই তিনি তাঁর সন্তানদের গড়ে তুলেছিলেন, করেছিলেন পরিচালনা। অর্থাৎ মানবজাতির পথ চলার শুরু হয়েছিল আসমানি গ্রন্থপ্রসূত নির্দেশনার মাধ্যমে এবং তারা কোনভাবেই জ্ঞানের আলোকবঞ্চিত ছিলেন না। একই ধারাবাহিকতায় শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৃথিবীতে আগমন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা। তারই অনিবার্য কর্মসূচি ছিল তাঁর জাতি গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগ। কুরআন বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছে এভাবে– "হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।" [সূরা আন নিসা, ৪:১]

'জাতি' বা ইংরেজি Nation এবং আরবী قوم পরিভাষাটির ব্যবহার বহুমাত্রিক। ভাষা, অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ নানাবিধ পরিচয়েও পরিসরে শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 'উম্মাহ' শব্দটির ব্যবহারও আমরা দেখে থাকি। যদিও 'উম্মাহ' শব্দটি জাতি শব্দ থেকে একটু ভিন্ন ধরনের এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। প্রবন্ধটিকে জাতি বলতে মুসলিম উম্মাহ গঠনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের জাতীয় কবি নবী [সা] প্রতিষ্ঠিত জাতি সত্তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "আমরা সেই সে জাতি, সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা, বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।" এখানে মুসলিম উম্মাহর একটি বিশেষ পরিচয়ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মহানবী [সা] কর্তৃক রিসালাতের নির্দেশনায় মুসলিম উম্মাহ[১] বা জাতি গঠনের যে গোড়াপত্তন হয়েছিল সেটিকে সামনে রেখে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

---

১. উম্মাহ শব্দটি কুরআনুল কারীমে ৫০ বার এসেছে।

www.pathagar.com

জাতি গঠনের গুরুত্ব

মানবেতিহাসে জাতি গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীতে মানুষের আগমণ ও প্রস্থান একাকী হলেও সৃষ্টিগতভাবে সে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে পছন্দ করে। আর এমন একটি পরিবেশ ব্যতীত তার পক্ষে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম [আ] কে সৃষ্টি করে তার একাকীত্ব ঘোচানো এবং মানববংশ বিস্তারে হযরত হাওয়া [আ]-কে সৃষ্টি করেন। মানব জীবনের এই অনিবার্যতা থেকেই ক্রমান্বয়ে গড়ে ওঠেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নামক বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো। সে গুলোকে সুশৃঙ্খল, সুদৃঢ় ও অর্থপূর্ণ করতেই জাতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাধারণভাবে একটি বিশেষ কোন আদর্শ বা বিশ্বাস জাতি গঠনের ভিত্তি হয়ে থাকে। পৃথিবীতে মানুষের জীবন স্রোতসীনির মত প্রবাহমান। রাত ও দিনের আবর্তনে আমাদর জীবনের সময়কাল অতিক্রান্ত হয়। সাথে সাতে রুচি-প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে সতত। পল-অনুপলে পরিবর্তন ঘটে আমাদের জীবনের। পবির্তন আসে প্রকৃতি পরিবেশের সাথে সাথে মানুষের রুচি-প্রকৃতি ও মননে। এমনকি প্রাত্যয়িক জীবন নির্বাহে আচার-আচররণ, গ্রহণ-বর্জন এবং বিশ্বাস, চিন্তা-কর্ম, ভাঙ্গা-গড়া সবই এই পরিচয় দ্বারা অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। মানবেতিহাসের বহু সন্ধি-চুক্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এই পরিচয়কে সামনে রেখেই; এটি তার অস্তিত্ব রক্ষা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিনির্মাণের ভিত্তিমূল। আর এটি অনিবার্যও বঠে। সুতরাং জাতি গঠনের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কার্যক্রমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে একটি আদর্শের আলোকে জাতি গঠন কার্যক্রমটি অপেক্ষাকৃত সময়সাপেক্ষ এবং শ্রমসাধ্য।

জাতি গঠনের ভিত্তি

সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষ এক জাতির সমস্য; আর তা হলো মানবজাতি। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুবিধার্থে বিভিন্ন গোত্র বা সম্প্রদায়ে ভাগ করেছেন। তিনি বলেছেন,

"হে মানুষ, আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।" [সূরা হুজরাত, ৪৯:১৩] কবির ভাষায়, "কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবার সমান রাঙা।" এভাবেই মানবসমাজ তার যাত্রালগ্ন থেকেই নানা জাতি, গোষ্ঠীর পরিচয়ে বিভক্ত, পরিচিত। সাধারণভাবে জাতি গঠিত হয়ে থাকে কতকগুলো মৌলিক বিষয়কে ভিত্তি করে। যেমন, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, ভৌগলিক সীমারেখা, লিঙ্গ, বর্ণ ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম মদীনা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক যে উম্মাহর গোড়াপত্তন করেছিলেন, তা ছিল ইসলামি আদর্শ নির্ভর। এই উম্মাহর সূচনা বা পরিচালনার কোন স্থানে সমকালীন গোত্রচিন্তা, জাতি-গোষ্ঠী, সাদা-কালো, প্রভু-দাস, ভৌগলিক পরিচয়, ভাষাভিত্তিক কোন শ্রেণি বা চিন্তা কার্যকর ছিল না। এখানে কেবলই কুরআনের নির্দেশনা কার্যকর ছিল। সে জন্য মুসলিম উম্মাহর গঠন, পরিচালনা এবং পরবর্তী সকল কিছুই মহান আল্লাহর নির্দেশনাপ্রসূত হওয়া অনিবার্য। সুতরাং বর্তমান ও ভষিষ্যতে মুসলিম জাতি বা উম্মাহ

www.pathagar.com

গঠনের ভিত্তি হবে অতীতের মতই একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা কেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে সমকালীন সকল কল্যাণচিন্তা কৌশল এর সাথে সম্পৃক্ত হবে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়ার শর্তে।

আদর্শভিত্তিক জাতি গঠনের উপাদান

যে কোন প্রতিষ্ঠাস্বা সংস্থা গঠনের জন্য তার উপাদান প্রয়োজন। আদর্শভিত্তিক জাতি গঠনের জন্যও বিষয়টি অধিকতর প্রযোজ্য। মানবসমাজের অনিবার্য এই প্রতিষ্ঠানটির মূল্য উপাদান মানুষ। আর এই মানব সমষ্টির একত্রীকরণের বা হওয়ার জন্য কতিপয় শর্তপূরণ করা আবশ্যক। আর তার ভিত্তিতেই গঠিত হতে পারে একটি আদর্শ জাতি। আর হতে পারে নিম্নরূপঃ

১. সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ বা দর্শন

আদর্শভিত্তিক জাতি গঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য ও পরিপূর্ণ একটি জীবনাদর্শ বা দর্শন– যা তার সদস্যদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। সে আদর্শের সমকালীন সকল মতবাদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা থাকা আবশ্যক। আর সেখানে থাকবে সার্বজনীন কল্যাণকামিতা, সহজবোধ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা ও অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে ধারণ ক্ষমতা বা সক্ষমতা। এ ছাড়া সে আদর্শের সকল পর্যায়ে স্পষ্টতা থাকা বাঞ্চনীয়।

২. সুযোগ্য নেতৃত্ব ও অনুগত কর্মীবাহিনী

একটি আদর্শ জাতি গঠনে এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। উন্নত জীবনাদর্শ থাকার পাশাপাশি তার আলোকে জাতি গঠনের উপযুক্ত নেতৃত্ব এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একদল যোগ্য ও অনুগত কর্মী বাহিনীর কোন বিকল্প নেই। কারণ একটি জীবনদর্শন মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তার রাজ্যে সদা ক্রিয়াশীল থাকে। আর তার প্রতি সদস্যদের বিশ্বাসকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে প্রয়োজন হয় উক্ত আদর্শের রুপময় প্রকাশ। সুযোগ্য নেতৃত্ব আর অনুগত কর্মী বাহিনী দ্বারাই তা সূচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়। তারপরই আদর্শিক বিশ্বাস ও কর্মের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। পৃথিবীতে বহু দার্শিনিক গত হয়েছেন, কিন্তু এই উপাদানের অভাবে তা কখনও বাস্তবরূপ লাভ করেনি। ইসলাম এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল জীবনাদর্শ।

৩. ঐক্য ও সংহতি

একটি জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান তার সদস্যদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করা। আর এই শর্তটি জাতি গঠন কার্যক্রম পরিচালনায় সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রতিটি সাধারণ সদস্যের জন্যও প্রযোজ্য। তাদের মাঝে আদর্শিক চেতনার আলোকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, আস্থা-বিশ্বাস, ভালাবাসা থাকা অপরিহার্য। তবেই জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। আর এই বন্ধন সর্বাবস্থায় বজায় থাকবে। তিনি বলেছেন, সকল মুমিন একজন মানুষের মত। যদি তার চোখ ব্যথা হয়, তবে সারাদেহে সে কষ্ট অনুভূত হয়। যদি মাথায় ব্যথা হয়, তবে সারাদেহে সেই ব্যথার কষ্ট অনুভূত হয়। [মুসলিম] কুরআন বিষয়টিকে উদ্বুদ্ধ করেছে এভাবে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। [সূরা আস-সাফ, ৬১:৪]

www.pathagar.com

৪. স্বতন্ত্র কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

কৃষ্টি ও কালচার মানবসমাজের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচায়ক। এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসজাত একটি বিষয় এবং তাদের দৈনন্দিন চিন্তা-কর্মের বাস্তব প্রতিফলন। একটি জাতির প্রতিষ্ঠা ও তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য বিকল্পহীন নিয়ামক; তার জাতির মর্যাদা ও আদর্শের প্রতীক। এর বেলাভূমিতে নোঙ্গর করে নিজস্ব জাতীয়তাবোধ ও আদর্শিক চেতনার বাহন। সে জন্য একটি স্বাধীন জাতিসত্তার রক্ষাকবচও বটে।

৫. বাস্তবসম্মত কর্মসূচি

আদর্শ জাতি গঠনের জন্য একটি সফল নেতৃত্বের অধীনে সমাবেত অনুগত কর্মী বাহিনীকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বাস্তবসম্মত কর্মসূচি। আর সে কর্মসূচির জন্য তার বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবায়ন কৌশল। সে জন্য একদল যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী গড়ার কাজটি তিনি কুরআনের নির্দেশনা পাওয়ার সাথে সাথেই শুরু করেছিলেন। এটি জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান। তাঁর গড়া মানুষগুলোই পর্যায়ক্রমে পৃথিবীকে আলোর সন্ধান দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আজও তাঁর নীতির আলোকে গড়ে ওঠো মানুষ দ্বারাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তাই একটি আদর্শ জাতি গঠনের জন্য এই বিষয়গুলো মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত। মানবেতিহাসের বর্তমান সময়েও একই উপাদান পূরণ করে আমাদেরকে একটি আদর্শিক জাতি গঠেনর চিন্তা করতে হবে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানবতার জন্য পথিকৃৎ।

আদর্শ জাতি গঠনে মুহাম্মাদ [সা]-এর অবদান

এ কথা অপেক্ষা রাখে না যে, আদর্শ জাতি গঠনে মানবেতিহাস সবচেয়ে বড় এবং অনতিক্রম্য অবদান যিনি রেখেছেন, তিনি হলেন নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পৃথিবীর মানুষ যখন তার নিজ পরিচয় হারিয়ে ফেলেছিল, নিকষ কালো অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে হয়রান, তখনই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির করুণার আধার হিসেবে তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি সর্বকালের মানবতার সার্থক পরিচায়ক। সে জন্য কুরআন তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে এভাবে- 'বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন [সত্য] ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" [সূরা আল আ'রাফ, ৭:১৫৮]

তিনি কুরআনে বর্ণিত বিশ্বজনীন আদর্শ ভিত্তিক জাতি বা উম্মাহ গঠন করেন। কুরআন ও তার নির্দেশনাই ছিল তাঁর সকল কাজের ভিত্তি। মদীনায় হিরাতের পর থেকেই তিনি কুরআনের আলোকে একটি সমাজ এবং সে সমাজের মানুষগুলোকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদায় উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নবুওয়াত লাভের পর মাক্কী জীবনের ১৩ বছরে নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং অপরিসীম ত্যাগ ও কুরবাণীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে যে মানুষগুলো তৈরি করেছিলেন, তাদেরই হাতে হিজরাত পরবর্তী ১০ বছর সময়কাল একাধারে একটি কুরআনী

www.pathagar.com

সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এবং বিশ্বজনীন মানবতা ও মূল্যবোধ নির্ভর সংস্কৃতি-সভ্যতা বিনির্মাণ করেছিলেস, এই কর্মপ্রচেষ্টার সমগ্রই হলো তাঁর একটি আদর্শ জাতি গঠনের নিমিত্তে পালিত কর্মসূচি বা অবদান হিসেবে স্বীকৃতি। তাঁর সমগ্র জীবন কর্ম পৃথিবীর মানুষের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আলোচ্য প্রবেন্ধ তাঁর নব্যুয়াতী জীবনের ২৩ বছরের মধ্যেই একটি আদর্শ জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে আমরা অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব।

♦ আদর্শ ব্যক্তি গঠন

মুসলিম উম্মাহর গোড়াপত্তনকালে এ কাজকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন। নবুওয়াত লাভের পর মাক্কী জীবনে অহরনিশি এ কাজটিই তিনি করেছেন। হিজরাতের পর মক্কায় গঠিত মানুষগুলোর সাথে একাত্মতা প্রকাশকারী মদীনার আনসারগণের সমন্বয়ে তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু হয় মুসলিম উম্মাহর। আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি; তাকানোর সময়ই বা কোথায়? জন্মভূমিত্যাগী মানুষগুলোও অতীতের নিদারুণ উপেক্ষা, বঞ্চনা, অবর্ণনীয় নির্যাতন-নিপীড়নের দগদগে ক্ষত আর ব্যথার কথাকে মনে করার কোন অবকাশ পায়নি। আর পাবেই বা কেমন করে! নবী সর্দারের পরম পবিত্র সান্নিধ্য তাদের জীবনের সর্বস্বকে বিলিয়ে দেয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত রেখেছে নিশিদিন; প্রতিযোগিতা করেছেন চর্তুশীর চাঁদের চেয়ে কত সুন্দর তাঁদের প্রিয় নবীজীর মুখখানি। জান্নাত প্রত্যাশী মানুষগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সারাক্ষণ নবী [সা]-এর পানে চেয়ে থাকতো, যেমনিভাবে সৃষ্টি নিশ্চয় প্রহর গুণেছে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত করুণার আঁধার নবীকে পেতে। অপরদিকে আনসার ভাইদের আতিথেয়তা আর চিরসাথী হবা অভয়দান মুহাজিরদের সকল ব্যথা বেদনাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। নবীজীর পবিত্র সংস্পর্শ তাদেরকে দিক-দিগন্তে বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়তে প্রেরণা যোগায়। তারা প্রভাত রবির আলোক বিকিরণের মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীবাসীকে জাগিয়ে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের দুর্নিবার মিছিলে শরীক হলো অনেকেই। কাফেলায় শামিল এক আফ্রিকী কালো মায়ের কৃতদাস সন্তান বেলাল সম্বোধিত হলেন বেলাল [রা] হিসেবে, আর পারস্যপুত্র সালমান হয়ে গেলেন ইসলামপুত্র সালমান আল-ফারেসী [রা], এমনই আরো কত! এভাবেই বিশ্বমানবতা দীর্ঘকালের ঘুম ভেঙ্গে দেখলো কুরআন বিচ্ছুরিত ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত কোন এক নতুন পৃথিবীকে। স্থান-কাল-পাত্রের সীমানা পেরিয়ে প্রতিষ্ঠা পেল বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণকামী এক মধ্যমপন্থী জাতি-গোষ্ঠ; যার নাম মুসলিম উম্মাহ এবং প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রটি ছিল মদীনাতুন্নাবী। এটি সম্ভব হয়েছিল কুরআনের পাঠ্যক্রমে গড়া মানুষদের দ্বারা। যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নবীকে এভাবে দিয়েছিলেন, "তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তেলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।" [সূরা জুম'আ, ৬২:২] এ প্রক্রিয়ায় তিনি এক এক করে সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে কুরআনের আদর্শের বাস্তব অনুসারীতে পরিণত করেন। আর এটি স্বার্থক হয়েছিল এ জন্যই যে, তিনি নিজে ছিলেন এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আদর্শ স্থানীয়। আল্লাহ বলেন, "আর নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" [সূরা আল কালাম, ৬৮:৪]

www.pathagar.com

♦ সমাজে ঐক্যমত ও সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠা

মহানবী [সা] সর্বত্র প্রথম মদীনার সমাজে বসবাসরত মানুষগুলোকে তাঁর ওপরে অবতীর্ণ কুরআনের আলোকে একত্রি হওয়ার ব্যাপারে একমতে পৌঁছান। সেখানে বসবাসরত মানুষদের চিন্তাবিশ্বাসের স্বাধীনতা রেখেই এক জাতি গঠনের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; নেতৃত্বে ছিলেন নবী [সা] নিজে। তিনি বলেছেন, মুমিন মুমিনের জন্য ইমারতস্বরূপ। যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তি যোগায়। [বুখারী ও মুসলিম] আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩]

♦ জনগণকে একটি নেতৃত্বের অধীনে আনয়ন

যে কোন গঠন কার্যক্রমের জন্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নবী [সা] প্রথমেই এই কাজটির সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করেছিলেন। একটি লিখিত চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি মদীনার সমাজের বহুধাবিভক্ত মানুষগুলোকে একটি নেতৃত্বের অধীনে আনয়ন করেন। অতঃপর তাদের মাঝে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা; নিরাপত্তা বিধান করা এবং সামষ্টিক জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চেতনা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। আল্লাহ তা'আলা মদীনাবাসী ও চুক্তিবদ্ধ অন্যদেরকে রাসূল [সা] এর নেতৃত্বকে নিরঙ্কুশভাবে অনুসরণের প্রেরণা যুগিয়েছেন এভাবে- 'মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে, রাসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রাসূলের জীবন অপেক্ষা নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে। এটা এ কারণে যে, তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতি সাধন করে, তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" [সূরা আত-তাওবা, ৯:১২০] তাঁর সফল নেতৃত্বে অল্পসময়ের ব্যবধানে মদীনার সমাজে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফিরে আসার সাথে সাথে সমৃদ্ধির পথেও যাত্রা শুরু করে।

♦ আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন

আরবের গোত্রভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল উপদলে বিভক্ত জাতি গোষ্ঠীর মাঝে তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য আদর্শনির্ভর জীবন যাপনের উপযুক্ত একটি সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনকে অপরিহার্য বিবেচনায় এনে সর্বপ্রথম তা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। সে সমাজ ও রাষ্ট্রে অন্যান্য বিশ্বাস ও মতের লোকও ছিল সাধারণ নাগরিক হিসেবে সসম্মানে ও স্বাধীনভাবে; তবে চালকের ভূমিকায় এ উম্মাহর নিবেদিত প্রাণ অনুসারীগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সেখানের প্রত্যেক দায়িত্বশীলের পরিচয় ছিল, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের শাসক নয়; কেবলই সেবক। গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদনে নবী [সা]-এর অহী অনসৃত নির্দেশনাই ছিল মূল নিয়ামক। কুরআন সেখানে এমন এক রূপ লাভ করেছিল যে, আগন্তুকরা দেখতো কুরআন সেখানে কথা বলছে,

www.pathagar.com

বাঙ্ময় হয়ে হেঁটে চলছে; আর রাসূল [সা] তা সতত পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহর বিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশের মতই মানুষও আপনা থেকেই যেন তা মেনে চলতো, কখনও সে ক্ষেত্রে চলতো প্রতিযোগিতা। একটি আদর্শিক জাতি গঠনের ইতিহাসে এমন দৃশ্যের অবতারণা আর হয়নি– যা অনাগতকালের মানুষের জন্য চিরভাস্মর হয়ে আছে।

♦ স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতার গোড়াপত্তন

রাসূলুল্লাহ [সা] মুসলিম উম্মাহ গঠনের শুরুতেই একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিনির্মাণের বিষয়টিতে নজর দেন। কারণ একটি জাতির গঠন ও তার বেঁচে থাকার জন্য জরুরী। এ বিষয়টি তাদের আত্মপরিধির মাপকাঠি। সে জন্য আজও দুনিয়ার কোন জাতিকে ধ্বংস করতে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সর্বপ্রথম বিনষ্ট করতে হয়। যেমন, মদীনার সমাজে প্রচলিত কেবলই আনন্দ উৎসবের জন্য নির্ধারিত দিনকে পরিবর্তন করে এই উম্মাহর জন্য বছরে দু'টি বৈশিষ্ট্যময় ঈদের দিন প্রবর্তন করেন। আশুরার একদিনের সাওম পালনের পরিবর্তে দুই দিনের সাওম পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এমনই উদাহরণ রয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, নিজ আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেনি এমন কিছু বিষয়কে অনুমোদন দিয়ে তা উম্মাহর সদস্যদের জন্য বৈধ করেছে। বাস্তবিকপক্ষে, নবী [সা]-এর সুমহান সংস্পর্শ এ উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের শারীরিক অবয়বকে ঠিক রেখে জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। তার দৃষ্টান্তটা হলো এমন যে, তিনি কোন এক ভাষার অক্ষর সদৃশ বিচ্ছিন্ন মানুষগুলোকে কুরআনের পবিত্র সংস্পর্শে এনে প্রথমে অর্থপূর্ণ শব্দমালায় রূপান্তর করেন এবং অতঃপর তাদেরকে স্বার্থক বাক্যে বিন্যাস্ত করে গোড়াপত্তন করেন মধ্যমপন্থী এমন এক জাতির; যারা সাক্ষ্যে পরিণত হয় বর্তমান ও অনাগতকালের বিশ্বমানবতার জন্য।

♦ বিশ্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বজাহানের মালিক হিসেবে নিজেই কুরআনের আহ্বানকে কালোত্তীর্ণ করেছেন, আর পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় করেছেন মুসলিম উম্মাকে তার একমাত্র অভিভাবক হিসেবে। নবী [সা] তা উত্তমরূপে বিশ্বমানবতার কাছে উপস্থাপন করেছেন ২৩ বছরের নবুয়তের সময়কালে। আল্লাহ তাঁর পরিচয়কে এভাবে প্রদানের জন্য বলেছেন– "বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল...।" [সূরা আল আরাফ, ৭:১৫৮] সে হিসেবে তিনি অত্যন্ত স্বার্থকভাবেই তা সম্পন্ন করেছেন। তিনি বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে এ বিষয়টি উপস্থিত লক্ষ জনতাকে সম্বোধন করে জানতেও চেয়েছিলেন।

♦ পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি

কোন জাতি গঠনের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মুসলিম উম্মাহর এই বৈশিষ্ট্য মানবেতিহাসে বিরল। এই উম্মাহর প্রত্যেক সদস্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাই-ভাই। তাই নবী [সা] এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সদস্যগণের ভ্রাতৃত্ব ভালবাসা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ইতিহাসে বিরল। এ বিষয়ে সর্বস্বত্যাগী মুহাজির ভাইদের প্রতি সদ্য ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী আনসারগণের কৃত আচরণের নজির পৃথিবী একটিও দেখাতে পারেনি। এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্তও নয়। আল্লামা ইবন কাইয়ুম লিখেছেন, অতঃপর নবী [সা] হযরত আনাস ইবন মালিকের গৃহে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। সে

www.pathagar.com

সময় মোট নব্বই জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাদের অর্ধেক মুহাজির এবং অর্ধেক আনসার। তার মূল কথা ছিল, তারা একে অন্যের দুঃখে দুখী হবে এবং সুখে সুখী হবেন...। [মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ২-২০৯] কুরআনুল কারীম কত অনুপম ভঙ্গিতেই না সে বিষয়টিকে তুলে ধরেছে– "নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।" [সূরা হুজরাত, ৪৯:১৩]

♦ ইনসাফ ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা

রাসূল [সা] তাঁর গঠিত জাতির প্রতিটি সদস্যদের চিন্তা-বিশ্বাসের রাজ্যে ইনসাফ বা ন্যায়-নীতিবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ উম্মাহর প্রতিটি সদস্য জীবনের বিনিময়ে হলেও ব্যক্তি ও সামষ্টিক তার বাস্তবরুপায়নে ছিল সদ্য প্রস্তুত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাকে ইনসাফের অনন্য দৃষ্টান্ত কেবল ইসলামের অনুসারীরাই দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তারা সর্বদা অন্যায়-অবিচারকে পরিহার করেছে। তিনি বলেছেন, মুমিনরা সম্মিলিতভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে থাকবে। অন্যায়কারী তাদের যে কারো সন্তান হোক এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না। [মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ২১১] এ প্রসঙ্গে বিশ্বনবী [সা]-এর অনুরক্ত কবির অভিব্যক্তি, "খোদার হাবীব বলিয়া গিয়াছেন আসিবেন ঈসা [আ] ফের, চাইনা মেহেদী তুমি এসো বীর হাতে নিয়ে শমশের...।"

♦ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি

ইসলামের আগমন ছিল মানবতাকে সকল গোলামীর জিঞ্জিরমুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামে পরিণত করা। রাসূলুল্লাহ [সা] তার অনুসারীদেরকে মাক্কী জীবনে কুরাইশ ও তাদের সমমনাদের গোমরাহীর শৃঙ্খলমুক্ত করতে নেক প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। [হায়কল, মহানবীর (সা) জীবন চরিত, ২৪২] মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এটি মুহাম্মদ [সা] এর গঠিত উম্মাহর অন্যতম পরিচয়। এই উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য তার জীবনের প্রতি পল-অনুপলে দুনিয়ার জীবনকে শান্তিময় করা, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা, ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এক জাতি হওয়ার গৌরবের অধিকারী। এই এই বোধ কেবল নিজের বা নিজেদের জন্যই নয়; মুসলিম সমাজে বসবাসকারী সকলের জন্যই তা সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর এই নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে সমাজের অসহায় নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধ, শিশু, প্রতিবন্ধী, অমুসলিম সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে জন্যই আমরা দেখতে পাই, এই উম্মাহর অন্যতম এক সিপাহসালার অর্ধপৃথিবীর কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে ফোরাতের তীরে দাঁড়িয়ে মাতৃহারা শিশুর মতই বিচলিত কণ্ঠে, ঘোষণা করেছিলেন, "আমার দায়িত্বের অংশে কোথাও একটি কুকুরও যদি অভুক্ত থাকে তার জন্য আমাকে মহান রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে... ! রাসূল [সা] বলেছেন, মুসলমানকে গালাগাল দেয়া ফাসিকের কাজ। মুসলমানের সাথে মারামারি কাটামাটি করা কুফরী। [বুখারী]

♦ পরমত সহিষ্ণুতার প্রশিক্ষণ

ধৈর্য পরমত সহিষ্ণুতার প্রধান শর্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এর প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য এমন উন্নত স্তরে ছিল যে, তাঁকে কষ্ট দেয়া, তাঁকে দুর্বৃত্তদের

www.pathagar.com

উত্যক্ত ও বাড়াবাড়ি যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তাঁর ধৈর্যও ততো বৃদ্ধি পেয়েছে। [মোবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতুম, পৃ. ৫২৬] রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় উম্মাহর সদস্যগণের মৌলিক অর্জনীয় গুণাবলীর মধ্যে এটি ছিল অন্যতম প্রধান। কারণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা বিশ্বাস করে যে, সমাজে বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের মানুষ থাকবে। তাদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও ধর্মানুশীলনের সুযোগ রাখা বা থাকা আবশ্যক। তাই এই উম্মাহর সদস্যগণকে পরমত সহিষ্ণু করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ শুরু থেকেই দেয়া হয়েছিল। বর্তমান সময়েও আবশ্যক। বিষয়টি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের এই গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আল বাকারা, ২:১৫৩]

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সীরাত পাঠের গুরুত্ব

মুসলিম জীবনে রাসূল [সা]-এর সীরাত পাঠের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মহাগ্রন্থ আল কুরআনই তাঁর জীবনালেখ্য ছিল। তারপরও আমরা কেন সীরাতগ্রন্থ পাঠ করবো। সীরাত লেখকগণ যা লিপিবদ্ধ করেন, তা তারা তারিখ ও সময়ের ক্রমধারা রক্ষা করে সুবিন্যাস্ত করেন। বিশুদ্ধ হাদীসের ঘটনাপঞ্জী ও সীরাতের উক্ত বিশদ বর্ণনার কারণে স্ব-স্ব স্থানে তা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয়। উচ্চমানের সনদ থাকা সত্ত্বেও ঘটনাপঞ্জী অবগত হওয়ার জন্য মুহাদ্দিসগণ সীরাত লেখকগণের মুখাপেক্ষী হন। এমনকি স্থানবিশেষে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথাও বাধ্য হয়ে স্বীকার করেন। [দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ১৬]

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক দেশ। অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশের ইতিহাস সুপ্রাচীন। শান্তিপ্রিয় এই জনপদের প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী। দেশের সকল মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে, জাতীয় জীবনে আমাদের ঐক্য ও সংহতিকে আরো সুদৃঢ় করতে প্রয়োজন দুর্নীতিমুক্ত ও নৈতিকমূলবোধ সম্পন্ন একটি জাতি গঠন করা। আর সে জন্য দরকার ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী প্রত্যেককে নবী [সা]-এর জীবনাদর্শ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা এবং তাঁর অনুসৃত নীতির আলোকেই নিজ ও জাতিকে গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এটি একজন মুসলিমের ঈমানের প্রধানতম দাবী। সে জন্য প্রয়োজন কুরআন সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞানার্জন করা। এ পর্যায়ে একটি প্রস্তাবনা পেশ করছি–

১. মুসলমানদেরকে সরাসরি আল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং সে কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।
২. রাসূলুল্লাহ [সা]-এর বিশুদ্ধ সীরাত গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাঁকে জানতে চেষ্টা করা।
৩. রাসূলুল্লাহ [সা]-এর সঠিক জীবন চরিত্র দেশের সকল শ্রেণির মানুষর কাছে তুলে ধরার সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৪. মুসলমানদের ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সর্বত্র রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনের প্রকৃত শিক্ষা ও নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

www.pathagar.com

৫. সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতের ব্যাপারে মুসলমানদের সচেতন করা এবং সংশ্লিষ্টদের তা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা।

৬. ইসলামী আলোচনা ও মাহফিলগুলোকে সময়োচিত ও জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়কেন্দ্রিক করা।

৭. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন সম্পর্কে জ্ঞানচর্চার পথকে সহজ করা।

৮. নবী জীবনের চর্চাকে বছরের বিশেষ কিছু দিন-ক্ষণের গণ্ডিতে আবদ্ধ না করে প্রতিনিয়তই তা অব্যাহত রাখা।

৯. আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ একমাত্র মাধ্যম হিসেবে নবীজীবনের জ্ঞান লাভ এবং বাস্তব অনুসরণের বিষয়টিকে বিবেচনা করতে শেখা। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ..। [সূরা আল আহযাব, ৩৩:২১]

১০. নবী [সা]-এর প্রতি কেবল মৌখিক ভালাবাসা প্রদর্শন নয়; বরং বাস্তবজীবনে তাঁকে যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে ভালবাসতে শেখা।

১১. বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে আমাদের ইবাদত-বন্দেীকে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

১২. সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১৩. আধুনিকতার নামে অপসংস্কৃতির রাহুমুক্ত হতে নবী [সা]-এর আদর্শকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মেনে চলার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

১৪. সর্বোপরি মুসলামনদের মধ্যে ইসলামী উম্মাহর প্রকৃত চেতনা জাগ্রত করার প্রয়োস চালানো। মুসলিম হিসেবে আমরা দৃঢ়ভাবে বলবো, বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর বিত্র জীবনাদর্শের মধ্যেই মানবতার বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত আছে। তাই আমাদের প্রিয় জন্মভূমির সার্বিক কল্যাণ সাধন ও সুষম সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য একমাত্র রাসূলুল্লাহ [সা] পরিচালিত পদ্ধতির আলোকেই তা গড়ে তোলা সম্ভব। তাঁর অনুসৃত জাতিগঠন নীতিমালা আজও আমাদের একমাত্র পাথেয়; অনাগতকালে বিশ্বমানবতার জন্য তা একইভাবে প্রযোজ্য। আর এটা এ জন্যই যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ জগৎসমূহের প্রতিপালক।

আর রাসূলুল্লাহ [সা] হলেন রহমাতুল্লিল আলামীন বা জগৎসমূহের করুণার প্রতীক। এখানে জগত বলতে জীব ও জড় উভয় জগতকেই বুঝানো হয়েছে। নবী [সা]-এর এই পরিচয় কেবল প্রতীকী অর্থে নয়, বাস্তবসম্মতভাবেই; তবে তা শর্তসাপেক্ষে। তিনি আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনাপ্রসূত এবং বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রেরিত রাসূল। কুরআনুল কারীম নবী [সা]-এর সে পরিচয়কেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছে– "আর আমি তো তোমাকে সৃষ্টিকূলের জন্য রহমত হিসেবেই প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল আম্বিয়া, ২১:১০৭] কবির ভাষায় : "বিশ্বজোড়া খ্যাতিভরা অতীত আমার সামনে রাখি, গতকালের আর্শিতে মোর নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।"

www.pathagar.com

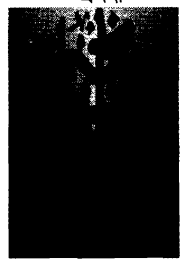

বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক স্মারক

নাসির হেলাল

পৃথিবীর নানা ভাষায় সীরাত বিষয়ক নানা রকম গবেষণার তথ্য পাওয়া যায়। ঐ সকল ভাষায় রচিত সীরাত সাহিত্য সমৃদ্ধ সাহিত্যে গবেষণার মর্যাদাও পেয়েছে। আরবী, উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত সীরাত সাহিত্য উঁচু পর্যায়ের গবেষণা কর্ম রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় রচিত সীরাত সাহিত্যও পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ওপর বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত মৌলিক ও অনুবাদ মিলিয়ে হাজারের বেশি জীবন ও কর্ম বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জন্মমাস রবিউল আউয়াল উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্মরণিকা প্রকাশ করে থাকে। এ সব স্মরণিকা ও স্মারকে রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবনের নানা দিক ও বিভাগ নিয়ে রচিত নিবন্ধ, প্রবন্ধ, কবিতা এমনকি গল্পও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এসব স্মারকে প্রকাশিত লেখাগুলো যে সব সময় মানসম্পন্ন হয়ে থাকে তা বলবো না। কিন্তু এর মধ্যে নিঃসন্দেহে অনেক লেখায় রয়েছে, যা মানসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংগৃহিত তথ্য মতে সীরাত স্মরণিকা বা স্মারক প্রকাশের এ সমৃদ্ধ সংস্কৃতি শুরু হয় সত্তরের দশক থেকে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৭৪ খৃ./১৩৯৪ হি. তে 'ঢাকা শহর সীরাতুন্নবী কমিটি' কর্তৃক আখতার ফারুক-সম্পাদিত 'সীরাত স্মরণিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর আগে ১৯৬১ খৃস্টাব্দে মুহিউদ্দিন খান-সম্পাদিত মাসিক মদীনার রবিউল আউয়াল সংখ্যাটি সীরাত সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং সেই থেকে আজ অবধি প্রতি বছর মাসিক মদীনা সীরাত সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। তবে আলাদাভাবে আশির দশক থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির উদ্যোগে সীরাত স্মারক প্রকাশের একটি রেওয়াজ চোখে পড়ে।

এক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের দ্বীনি দাওয়া ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে অধ্যাপক আবদুল গফুরের সম্পাদনায় ১৯৮২-৮৩ মোতাবেক ১৪০৩ হিজরীতে 'সীরাত স্মরণিকা' প্রকাশিত হয় এবং সেই থেকে প্রতি বছর কখনো সীরাত স্মরণিকা, কখনো সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা আবার কখনোবা ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা নামে বিশেষ স্মারক প্রকাশ করে আসছে। সাথে সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত মাসিক অগ্রপথিক ও সবুজপাতা রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। এক্ষেত্রে অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা.] বা ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] সংখ্যা অবশ্যই উল্লেখ্যের দাবি রাখে।

অন্যদিকে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে ১৯৯৬ খৃস্টাব্দে আসাদ বিন হাফিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাহিত্য সংস্কৃতি বিশ্বনবী [সা] সংখ্যা। এরপর আজতক প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানটি

www.pathagar.com

'সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা' প্রকাশ করে আসছে। যে সংকলনগুলো সুসম্পাদিত, সাহিত্য মানসম্পন্ন, গবেষণাধর্মী হওয়ার সাথে সাথে কলেবরের দিক দিয়েও বিশালাকার। এর প্রতিটি সংখ্যায় সীরাত সাহিত্যের অনন্য উপাদানে ভরপুর যা সত্যিই প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ নামের প্রতিষ্ঠানটিও প্রতিবছর না হলেও উন্নত মানের 'সীরাত স্মারক' প্রকাশ করে আসছে। এছাড়া এক্ষেত্রে কাজ করেছে ঢাকা ট্রাস্ট, বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, তমদ্দুন মজলিসসহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশেষ সীরাত স্মারক

সীরাত স্মরণিকা : ১৪০৩ হিজরী	অধ্যাপক আবদুল গফুর-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮২-১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯০
সীরাত স্মরণিকা : ১৪০৪ হিজরী	অধ্যাপক আবদুল গফুর-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫০
সীরাত স্মরণিকা : ১৪০৫ হিজরী	শাহাবুদ্দিন আহমদ-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৭৮
সীরাত স্মরণিকা : ১৪০৬ হিজরী	শেখ ফজলুর রহমান-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ডিসেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯৬
সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪০৭ হিজরী	শেখ ফজলুর রহমান-সম্পাদিত প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯৬
সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪১৪ হিজরী	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম-সম্পাদিত প্রকাশকাল: আগস্ট ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৯৬
সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪১৫ হিজরী	দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী-সম্পাদিত প্রকাশকাল: আগস্ট ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৪৮
সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪১৭ হিজরী	সৈয়দ আশরাফ আলী-সম্পাদিত প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫৬
সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪১৮ হিজরী	মোঃ মোরশেদ হোসেন-সম্পাদিত প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৪
সীরাতুন্নবী [সা] স্মরণিকা ১৪১৯ হিজরী	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ-সম্পাদিত প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬০
ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা : ১৪২০ হিজরী	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ-সম্পাদিত প্রকাশকাল: জুন ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬০
ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা : ১৪২১ হিজরী	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ-সম্পাদিত প্রকাশকাল: জুন ২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬০
ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] স্মরণিকা : ১৪২২ হিজরী	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ-সম্পাদিত প্রকাশকাল: জুন ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬০

www.pathagar.com

ঈদে মিলাদুন্নবী [সা]	সৈয়দ আশরাফ আলী-সম্পাদিত
স্মরণিকা : ১৪২৩ হিজরী	প্রকাশকাল: মে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬৮
ঈদে মিলাদুন্নবী [সা]	সৈয়দ আশরাফ আলী-সম্পাদিত
স্মরণিকা : ১৪২৪ হিজরী	প্রকাশকাল: মে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭৬
ঈদে মিলাদুন্নবী [সা]	মোঃ আবদুর রব-সম্পাদিত
স্মরণিকা : ১৪২৫ হিজরী	প্রকাশকাল: মে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮০
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	মোহাম্মদ আবদুর রব-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪২৬ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৪২
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	মোহাম্মদ আবদুর রব-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪২৭ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০৬ খ্রি: পৃ.
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	মোহাম্মদ আবদুর রব-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪২৮ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮০
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	মোহাম্মদ আবদুর রব-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪২৯ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৮৪
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	ডা. শাহাদাত হোসেন-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪৩০ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫১
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	আবু হেনা মোস্তফা কামাল-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪৩১ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০১০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৫০
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	আবু হেনা মোস্তফা কামাল-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪৩২ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০১১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭২
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	আবু হেনা মোস্তফা কামাল-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪৩৩ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৭২
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	নুরুল ইসলাম মানিক-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪৩৪ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৪৮
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা.] স্মরণিকা	নুরুল ইসলাম মানিক-সম্পাদিত
সংখ্যা : ১৪৩৫ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল: ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ১৬২
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা]	হাসান আবদুল কাইয়ূম-সম্পাদিত
সংখ্যা ১৪১১ হিজরী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

www.pathagar.com

অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১২ হিজরী	মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৩ হিজরী	মুহাম্মদ মনসুরুল হক খান-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৪ হিজরী	মোহাম্মদ শফিউদ্দীন-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৫ হিজরী	হাসনাইন ইমতিয়াজ-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৬ হিজরী	দাউদ-উজ-জামান চৌধুরী-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২২০, মূল্য : ৩০.০০
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৭ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২৭৮, মূল্য : ৪০.০০
অগ্রপথিক সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৮ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪১৯ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩৫২, মূল্য : ৪০.০০
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪২০ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯২, মূল্য : ২৪.০০
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪২১ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯২, মূল্য : ২০.০০
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪২২ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৮৪, মূল্য : ১৬.০০
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪২৩ হিজরী	মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ পৃ. মূল্য :
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪২৪ হিজরী	শেখ তোফাজ্জল হোসেন-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯২, মূল্য : ১৬.০০
অগ্রপথিক পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] সংখ্যা ১৪২৫ হিজরী	শেখ তোফাজ্জল হোসেন-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯২, মূল্য : ১৬.০০

www.pathagar.com

♦ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ঈদে মিলাদুন্নবী [সা], সংখ্যা ১৪২৪ হিজরী বিশেষ সংখ্যা	এ. জেড. এম. শামসুল আলম-সম্পাদিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৯২, মূল্য : ১৬.০০

জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ

♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪১৯ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩২০, মূল্য : ৩০.০০
♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪২০ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩২০, মূল্য : ৪০.০০
♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪২১ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩১২। মূল্য : ৪০.০০
♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪২২ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ৩২২, মূল্য : ৪০.০০
♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪২৩ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০২ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৬০, মূল্য : ২৫.০০
♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪২৪ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২২৮, মূল্য : ২০.০০
♦ সীরাতুন্নবী [সা] স্মারক ১৪২৫ হিজরী	জাতীয় সীরাত কমিটি বাংলাদেশ ২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২০৮, মূল্য : ২০.০০

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

♦ সাহিত্য সংস্কৃতি বিশ্বনবী [সা] সংখ্যা	আসাদ বিন হাফিজ-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০৪, মূল্যঃ ৫০.০০
স্মারক সীরাতুন্নবী ১৯৯৮ [সা] সংখ্যা	গোলাম মোহাম্মদ-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬৪, মূল্যঃ ৮.০০
সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০০	আসাদ বিন হাফিজ-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড,

www.pathagar.com

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
২০০০ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২০০, মূল্য: ৫০.০০

- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০১
  আসাদ বিন হাফিজ-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২২, মূল্য: ৪০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০২
  আসাদ বিন হাফিজ-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ..., মূল্য: ...
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৩
  মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২৪, মূল্য: ৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৪
  মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ৪৪৭ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ..., মূল্য: ৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৫
  মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২৪, মূল্য: ৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৬
  মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৪৬, মূল্য: ৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৭
  মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
  সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
  ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৩৬, মূল্য: ১৫০.০০

সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৮
মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪০০, মূল্য: ১৫০.০০

সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০০৯
মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড,

www.pathagar.com

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৩৬, মূল্য: ১৫০.০০

- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১০ — মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩৩৪, মূল্য: ১৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১১ — মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪০৮, মূল্য: ১৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১২ — মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৮০, মূল্য: ১৫০.০০
- সাহিত্য সংস্কৃতি সীরাতুন্নবী [সা] সংখ্যা ২০১৩ — মোশাররফ হোসেন খান-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৭১ গ্রীণ রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৩২, মূল্য: ১৫০.০০

ঢাকা ট্রাস্ট

- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মারক — মাওলানা মুজিবুর রহমান-সম্পাদিত ঢাকা ট্রাস্ট, কম্পিউটার মার্কেট ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা ২০০১ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৩২৬, মূল্য: ৭৫.০০
- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মারক — মাওলানা মুজিবুর রহমান-সম্পাদিত ঢাকা ট্রাস্ট, কম্পিউটার মার্কেট ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ২৫৬, মূল্য: ৩০.০০
- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্মারক — মাওলানা মুজিবুর রহমান-সম্পাদিত ঢাকা ট্রাস্ট, কম্পিউটার মার্কেট ৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬৮৮, মূল্য: ১০০.০০

বায়তুশ শরফ আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ

- আল ইহসান ঈদে মিল্লাদুন্নবী [সা] সাহিত্য সংকলন ১৯৯৯ — অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আলীম-সম্পাদিত [সা] বায়তুশ শরফ, আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ঢাকা শাখা, ১৪৯/এ এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১০৪, মূল্য: ৩০.০০

www.pathagar.com

আল ইহসান ঈদে মিল্লাদুন্নবী [সা] সাহিত্য সংকলন ২০০০	অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আলীম-সম্পাদিত [সা] বায়তুশ শরফ, আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ঢাকা শাখা, ১৪৯/এ এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা। ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১৫২, মূল্য: ২৫.০০
আল ইহসান ঈদে মিল্লাদুন্নবী [সা] সাহিত্য সংকলন ২০০১	অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল আলীম-সম্পাদিত [সা] বায়তুশ শরফ, আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ঢাকা শাখা, ১৪৯/এ এয়ারপোর্ট রোড, ফার্মগেট, ঢাকা। ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ২০০, মূল্য: ৪০.০০
তরজুমান ঈদে মিল্লাদুন্নবী [সা] সংখ্যা	অধ্যাপক আলহাজ মাওলানা মোহাম্মদ জালাউদ্দীন-সম্পাদিত, আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুনিয়া, চট্টগ্রাম ১৪১১ হিজরী, পৃ. ১৫০, মূল্য: ১০.০০
চির সুন্দর ঈদে মিলাদুন্নবী [সা] ১৪০৮ হিজরী	অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম-সম্পাদিত লেখক সমাজ বাংলাদেশ, ১৪৯, নর্থ সাউথ রোড, লুৎফুর রহমান লেন, ঢাকা-১২ পৃ. ১০৪, দাম: বিশ টাকা
ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বনবী সংখ্যা ১৪১৯ হিজরী	আবু রিদা-সম্পাদিত, ইসলামী সংস্কৃতি জাহান খান মসজিদ, ৬/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পৃ. ১১২, মূল্য: ১৫.০০
সীরাত স্মরণিকা, ১৩৯৪ হিজরী	আখতার ফারুক-সম্পাদিত, ঢাকা শহর সিরাতুন্নবী কমিটি, ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ
সীরাত স্মরণিকা, ১৩৯৬ হিজরী	আখতার ফারুক-সম্পাদিত, ঢাকা শহর সিরাতুন্নবী কমিটি, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ
সীরাত স্মরণিকা, ১৪০৩ হিজরী	খন্দকার আবদুল মোমেন-সম্পাদিত ইসলামিক সোসাইটি অব নারায়ণগঞ্জ,১৯৮২ খ্রি:
প্রেক্ষণ, মহানবী [সা] সংখ্যা ১৪২১ হিজরী	খন্দকার আবদুল মোমেন-সম্পাদিত ইসলামিক সোসাইটি অব নারায়ণগঞ্জ,২০০০ খ্রি:

উপরে যেসব স্মারক, স্মরণিকার উল্লেখ করা হলো নিঃসন্দেহে সেগুলো সীরাত বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে মাইল স্টোনের ভূমিকা পালন করবে। আমরা মনে করি রাসূলুল্লাহ [সা]-এর জীবন ও কর্মের বর্ণনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত কাজ মোটেই যথেষ্ট নয়। সে জন্য আমাদের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে এক্ষেত্রে অনেক বেশি। তাই আশা করবো ভবিষ্যতে সীরাত বিষয়ক লেখা-লেখি, গবেষণাকর্ম ও প্রকাশনা আরও অনেক অনেক বেশি হবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

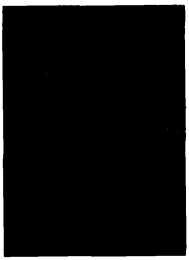

রাসূল মুহাম্মাদ [সা]

কাফি খুররাম

"হে মুহাম্মদ! বলে দাও– হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধ্বংসের কারণ হবে।" [সূরা ইউনুছ : আয়াত ১০৮]

আল্লাহর বান্দাহ তথা খলিফা হিসেবে, মুমিন হিসেবে আমাদের কখনো 'ভুল পথ' গ্রহণ করা সমীচীন নয়। আর যদি সেটা পরিহার করে 'সোজা পথ' অবলম্বন করি তাহলে আল্লাহপাকের তরফ থেকে আমাদের জন্য রয়েছে সফলতাসহ সম্মানজনক পুরস্কার। যেমন তিনি বলছেন– 'যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে এবং নিজের রবের একনিষ্ঠ অনুগত বান্দা হয়ে থাকে, তারা নিশ্চিত জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতে তারা চিরকাল থাকবে।" [সূরা হুদ:আয়াত ২৩]

আল্লাহপাকের ওয়াদা হচ্ছে : 'যে ব্যক্তিই ঈমানসহকারে সৎ কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী– আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো।' [সূরা নহল : আয়াত ৯৭]

আল্লাহর এই সকল ঘোষণা থেকে পরিষ্কার বোঝাই যায়, রাব্বুল আলামিন ঘোষিত এই পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী একমাত্র মুমিনরাই। তাদের জন্য আল্লাহপাকের সকল ইতিবাচক ও সম্মানজনক আয়োজন। আর এ জন্যই তিনি রাসূলকে [সা] 'সতর্ককারী', 'রহমতস্বরূপ' ও 'পথপ্রদর্শক' হিসেবে মনোনীত করেছেন। রাসূলকে [সা] সম্বোধন করে আল্লাহপাক বলছেন– ''যারা তোমার বায়াত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহর বায়াত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর। সুতরাং যে তা ভঙ্গ করে, তা ভঙ্গ করার পরিণাম তারই এবং যে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দেন।" [সূরা আল ফাতহ : আয়াত ৮-১০]

প্রকৃত অর্থে কোনো মুমিনই 'বায়াত' বা শপথ ভঙ্গ করতে পারে না। সেটা তার জন্য বাঞ্ছনীয় তো নয়ই, বরং চরম লাঞ্ছনার বিষয়। অতএব, আল্লাহ এবং তাঁর মনোনীত দ্বীন ও রাসূলের [সা] সর্বান্তকরণে আনুগত্য, অনুসরণ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দিকনির্দেশনা সঠিক ও সার্বিক বাস্তবায়নের ওপরই কেবল আমাদের সফলতার সীমা কিংবা বিষয়-আশয় নির্ভর করে। পার্থিব কিংবা জাগতিক লাভ-ক্ষতি কোনো মুমিনের জন্যই বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হতে পারে

www.pathagar.com

না। বরং মুমিনের জন্য ইসলাম পরিপূর্ণ আনুগত্যের দাবি করে। বিভ্রান্তি ও কুহকের সকল জাল ও মোহ ছিন্ন করে, সকল চিন্তাপ্রবাহকে একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের দিকে স্থির ও অবিচল রাখাই একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ। বস্তুত রাসূলের [সা] জীবনই আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয়। তাঁর কর্মপ্রবাহ ও জীবনধারায় শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতিসহ এমন কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও নেই যার আদর্শ রাসূল [সা] বাস্তবে উপস্থাপন করেননি। জীবন ও জগতের সকল বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূলের [সা] দৃপ্ত, সফল পথনির্দেশনা ও দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে অমলিন।

একজন মুমিনের জন্য ইসলাম যে আদর্শ, সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিকনির্দেশনা পেশ করেছে, এর বাইরে আমাদের জন্য আর কোনো কল্যাণকর আদর্শ, সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা থাকতে পারে না। তেমনটি ভাবাও ঈমান আকিদার পরিপন্থী কাজ হিসেবে গর্হিত অপরাধ বলে বিবেচিত। সুতরাং একমাত্র দ্বীনের মধ্যেই খুঁজতে হবে আমাদের জীবনের সামগ্রিক কল্যাণকর মুক্তির পথ। চলমান স্রোতের সাথে মিশে যাওয়া কোনো মুমিনের চরিত্র হতে পারে না, বরং সকল অবাঞ্ছিত স্রোতধারা থেকে সকল কুহকের মরীচিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র দ্বীনের ওপরই আমাদের চিন্তা ও কর্মপ্রবাহকে স্থির ও সুদৃঢ় রাখতে হবে। যারা হতভাগা, তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু যারা মুমিন– তাদেরকে অবশ্যই রাসূলের [সা] জীবনকেই অনুসরণ করতে হবে সকল ক্ষেত্রে। এর মধ্যেই নিহত রয়েছে আমাদের জন্য সকল প্রকার কল্যাণ ও একমাত্র মুক্তি।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসূলই [সা] আমাদের জন্য একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ মহামানব। সুতরাং আমাদের জীবনের সকল দিক হোক সে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি– সকল ক্ষেত্রেই রাসূলের [সা] নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প আর কোনো পথ নেই, দরোজাও খোলা নেই আমাদের জন্য।

বস্তুত রাসূল মুহাম্মাদ [সা] এমন এক মহামানব, যার তুলনা চলে না কোনো কিছুর সাথেই। তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী। স্বয়ং আল্লাহই ছিলেন তাঁর মহান শিক্ষক। এজন্যই তিনি ব্যতিক্রমী, এজন্যই তিনি মানব হয়েও মহামানব। তাঁর আগমনের পূর্বে বা পরে রাসূলের [সা] মতো এমন মহামানব আর কখনও আসেননি, কখনও আসবেনও না। এটাই মহান রাব্বুল আলামিনের একান্ত মঞ্জুর, চূড়ান্ত ফায়সালা।

সুতরাং এই মহামানব রাসূলের [সা] আদর্শ আমাদের গোটা জীবনই পরিচালিত করতে হবে– এর কোনো বিকল্প নেই।

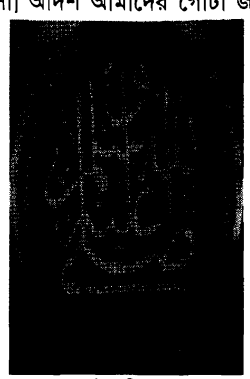

www.pathagar.com

মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ

অধ্যাপক আ ত ম মুছলেহ উদ্দীন

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম [আ]-কে সৃষ্টি করেন এবং তাঁর বিবি হাওয়াসহ উভয়কে বেহেশতে বসবাস করতে দেন। আল কুরআনুল কারিমে উল্লিখিত হয়েছে : 'হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি জান্নাতে বসবাস করো এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ আহার করো, কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না।' [সূরা বাকারা : ৩৫]

কিন্তু তাঁরা মানুষের চরম দুশমন শয়তানের প্ররোচনায় ওই নির্দেশ পালনে ভুল করে ফেললেন। তখন আল্লাহ তায়ালা পুনর্নির্দেশ দিলেন : 'তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও [পৃথিবীতে]। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমার [অর্থাৎ মানুষের] নিকট সৎপথের নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার নির্দেশের অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা [জান্নাত পরিত্যাগে] দুঃখিতও হবে না।' [সূরা বাকারা : ৩৮]

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম [আ]-কে সৃষ্টি করার আগে বলেছিলেন : 'আমি পৃথিবীতে [আমার] খলিফা সৃষ্টি করতেছি।' [সূরা বাকারা : ৩০] হযরত আদম [আ]-এর পৃথিবীতে অবতরণে আল্লাহ তায়ালার সে বিধান বাস্তবে পরিণত হলো। একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো; ইবনে আব্বাস [রা]-এর বর্ণনায় হযরত আদম [আ]-কে মক্কা মুয়াজ্জমায় ও তাইফের মধ্যবর্তী 'দাহনা' নামক স্থানে এবং অন্য মতে ভারতবর্ষে [লঙ্কায়] নামিয়ে দেয়া হয়। বিবি হাওয়া [আ]-কে জিদ্দায় [উচ্চারণে জুদ্দা ও জাদ্দাও পাওয়া যায়] অবতরণ করানো হয়। উভয়েই 'আরাফাতে' একত্র হন। তাঁরা আরব দেশ তথা মক্কা মুয়াজ্জমায় বসবাস করেছেন, তাঁদের ইন্তেকালও তথায় ঘটেছে বলে বিবরণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তায়ালার প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম [আ] এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁদের প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন: 'ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।' [সূরা আলে-ইমরান : ১৯]। এ দ্বীন মানুষের কাছে প্রচারের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যার ঘোষণা তিনি আগেই দিয়েছিলেন। একটি হাদিসের বর্ণনা মতে তাদের সংখ্যা এক লাখ [এক বর্ণনায় দুই লাখ] ২৪ হাজার [মিশকাত, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬]। নবী-

www.pathagar.com

রাসূলদের মধ্যে মাত্র ২৬ জনের নাম আল কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে হযরত নূহ [আ], হযরত ইবরাহিম [আ], হযরত মূসা [আ], হযরত ঈসা [আ] ও হযরত মুহাম্মদ [সা] প্রধান। হযরত নূহ [আ] দীর্ঘজীবী, তিনি দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁর কওমের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন ৯৫০ বছর [সূরা আনকাবুত, ১৪]। কিন্তু তাঁর কাওম ঈমান আনেনি। হযরত নূহ [আ] তাঁর কওমের হিদায়াতপ্রাপ্তি সম্পর্কে নিরাশ হলেন এবং বদদোয়া করলেন : 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিবেন না।' [সূরা নূহ : ২৬]। তাঁর দোয়া কবুল হলো : মহাপ্লাবনে তাঁর কওম ধ্বংস হয়ে গেল। হযরত মূসা [আ]-এর উপস্থাপিত হিদায়াত গ্রহণ না করায় ফিরাউন তার দলবলসহ পানিতে নিমজ্জিত হলো। অবশ্য সে চেয়েছিল হযরত মূসা [আ] ও তাঁর সঙ্গী বনি ইসরাইলকে হত্যা করতে। হিদায়াত গ্রহণ না করে নবীদের অবাধ্যতার কারণে 'আদ ও ছামুদ জাতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হযরত হুদ [আ] ছিলেন 'আদের নিকট প্রেরিত নবী এবং হযরত সালিহ [আ] ছিলেন ছামুদের নবী। [সূরা আ'রাফ : ৬৫ ও ৭৩]

নবী-রাসূলগণ তাঁদের দায়িত্ব পালনে সামান্যতম কসুর করেননি। তা সত্ত্বেও ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত মুহাম্মদ [সা]-এর আবির্ভাবের আগে অগ্রগতি ছিল অতি মন্থর। তাওহিদ তথা আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষ ছিল খুবই অল্প। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নয়নে মানুষ যখন বেশ অগ্রসর, তখনই হযরত মুহাম্মাদ [সা] প্রেরিত হন। তাঁর প্রথম চল্লিশ বছর মক্কায় অতিবাহিত হয় কিছুটা উদ্বিগ্ন অবস্থায়। তিনি এ সময়ে শান্তশিষ্ট জীবনযাপন করেন। চরম ভদ্রতা ও নম্রতা তাঁর আচার-আচরণে প্রকাশিত হয়। পরোপকার তাঁর জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বজাতির অনেক বিশ্বাস ও কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকেন। চল্লিশ বছর বয়সে রমজান মাসে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালে তাঁর প্রতি অহী [আল্লাহর কালাম] নাজিল হয়। ধীরে ধীরে তিনি আল্লাহর একত্ববাদের কালিমা : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক অদ্বিতীয় প্রচার করতে থাকেন। বেশিরভাগ লোক এ সত্যবাণী গ্রহণ করেনি। উপরন্তু তাঁর প্রতি নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। তিনি অসীম ধৈর্য অবলম্বন করেন। তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে থাকেন। মুশরিকদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর পক্ষে মক্কায় অবস্থান দুরূহ হয়ে পড়ে। তিনি তাঁর পালকপুত্র জায়দকে সাথে নিয়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাইফ গমন করেন। কিন্তু তায়েফবাসী হিদায়াত গ্রহণ করেনি। তার বিপরীতে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে। তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে ঢলে পড়লেন। জায়েদ অতিকষ্টে তাঁকে একটি উদ্যানে নিয়ে যান। তিনি একটু সুস্থ হলে অযু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন। অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে তিনি তাঁর অক্ষমতার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। তাঁর আবেগভরা আত্মনিবেদন তুলনাহীন। অভিসম্পাতের পরিবর্তে হযরত [সা] বললেন, 'এরা হয়তো ঈমান আনেনি। এদের সন্তানেরা তো ঈমান আনতে পারে।'

মুসলমানদের পক্ষে মক্কায় অবস্থান করা আর সম্ভব ছিল না, তাঁরা ধীরে ধীরে মদীনায় হিজরত করলেন। হযরত মুহাম্মদ [সা]-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো। ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করার পর তিনিও জন্মভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনাবাসী তাঁকে সাদরে ও সম্মানে

www.pathagar.com

গ্রহণ করে। কিন্তু মক্কার কুরাইশ বংশের ইহুদিদের উসকানিতে মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মদীনা বারবার আক্রমণ করে। বদর, উহুদ, খন্দক ও আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধে ১৪ জন সাহাবি [রা] শহীদ হন। কুরাইশদের ৭০ জন নিহত হয় ও ৭০ জন বন্দি হয়। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি [রা] শহীদ হন ও ২৩ জন কুরাইশ নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ [সা] গুরুতর আহত হন, তাঁর সম্মুখের চারটি দন্ত মোবারক ভেঙে পড়ে এবং তাঁর কপালে ভীষণ আঘাত লাগে। কিছুটা সুস্থবোধ করার পর তিনি দোয়া করেন। 'হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা করো, তারা অজ্ঞ, তারা ভ্রান্ত।'

পরবর্তীকালে [৬২৭ খ্রি:] আবু সুফিয়ান ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে। এক মাস অবরোধ করেও বিশেষ ফায়দা হয় না। তারা পশ্চাৎপসারণ করে। মাত্র ২০ জন দুই পক্ষে প্রাণ হারায়।

অষ্টম হিজরির রজমান মাসে হযরত মুহাম্মদ [সা] ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কার প্রান্তে পৌঁছেন। আবু সুফিয়ান [রা] ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেন। এর পরদিন হযরত মুহাম্মাদ [সা] ও সব মুসলিম বায়তুল্লাহ শরিফে নামাজ আদায় করেন। কুরাইশরাও ইতঃপূর্বে সেখানে হাজির হয়।

রাসূলুল্লাহ [সা] তাদেরকে লক্ষ্য করে কিছু বলার পর ঘোষণা করেন :

'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, যাও তোমরা সবাই আজাদ।'

বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজিত হয়। অতি অল্প সময়ে পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মুহাম্মাদ [সা] সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, নবী এবং সর্বশেষ নবীও। নবী-রাসূল [আ]-এর কিছু বর্ণনা শুরুতে করা হয়েছে, যাতে হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহভাজন ওই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে মানুষ সবচেয়ে বেশি মঙ্গল লাভে সমর্থ হয়। আজ বিশ্বের মানবজাতি দুর্দশা ও দুর্যোগের সাগরে নিপতিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রধান উপায় বিশ্বনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]-এর পুরোপুরি অনুসরণ ও জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষার প্রচলন ও অনুশীলন। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন :

'তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ [সূরা আহযাব : ২১]।' এ আদর্শই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

www.pathagar.com

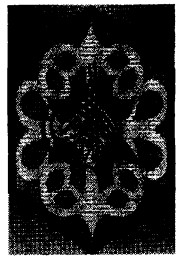

মাজলুমের নবী মুহাম্মাদ [সা]

এইচ. এম. মুশফিকুর রহমান

মহানবী [সা] সুবিস্তৃত, মহিমাময় ও সুদূরপ্রসারী জীবনীর বর্ণনা-বিশ্লেষণ মহাসাগর মন্থনের ন্যায়ই কষ্টসাধ্য ও দুরূহ। অতলান্ত মহাসাগরের মতো বিশাল, রত্নগর্ভ ও জ্ঞান- উদ্বেল ছিল তাঁর প্রতিভাদীপ্ত স্বর্ণোজ্জ্বল জীবন। মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ছিল তাঁর বলিষ্ঠ পদচারণা। চিন্তা-চেতনার প্রতিটি শাখা-পল্লবে ছিল তাঁর সুমহান, শুভ্র-সমুজ্জ্বলতার প্রকাশ। এ কথা বলা আদৌ অতিরঞ্জিত বা অত্যুক্তি হবে না যে, মানব-জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে এমন কোনো বিভাগ বা শাখা নেই যেখানে খাইরুল খালায়িকি আফজালুল বাশারের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আজীবন জালেমের জুলুমের শিকার হয়েছেন। আর লড়ে গেছেন মাজলুমের পক্ষ হয়ে জালিমের বিপক্ষে। তিনি জীবনের শুরুতেই নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করেন কুরাইশদের নির্যাতন নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে। গমন করেন তায়েফে। তায়েফবাসীও তাঁর সাথে সদাচরণ করেনি। তারাও তাদের ভবঘুরে যুবকদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিলো মুহাম্মাদ [সা]-এর ওপরে। তারা চিৎকার করে এবং গালাগালি করে লোক জড়ো করে মুহাম্মাদ [সা]-এর ওপরে ঢিল-পাথর নিক্ষেপ শুরু করেছিল। পাষণ্ড ঐ গুণ্ডা প্রকৃতির গোলাম যুবকরা তাক করে মুহাম্মাদ [সা]-এর পায়ের গোড়ালি এবং টাকনুতে পাথর মেরে মেরে আল্লাহর রাসূল [সা] শরীরকে অসাড় করে তুলেছিল। রক্ত ক্ষরণের ফলে রাসূল [সা] ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লে তাঁরা ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আবার পাথর ছুড়তে শুরু করতেন। রক্ত ঝরতে ঝরতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, জমাট রক্তে রাসূলের [সা] পায়ের জুতা আটকে যায় এবং খুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। একপর্যায়ে রাসূল [সা] কিছু সময়ের জন্যে বেহুশ হয়ে যান। তায়েফের এ জুলুমই তার জীবনের শেষ নির্যাতন নয় বরং উহুদের ময়দানে তাকে দান্দান মোবারক শহীদ করতে হয়। এতো কিছুর পরও মুহাম্মাদ [সা] মাজলুম নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার কল্যাণে এবং তাদের মুক্তির সংগ্রামে আজীবন লড়ে গেছেন জালিমের বিরুদ্ধে।

প্রাচীনকালে বাজারের পণ্যের মতো মানুষ বিক্রয় করতো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষকে হাটে-বাজারে উঠানো হতো এবং পশুর মতো বেচাকেনা করা হতো। আর যাদের বেচাকেনা করা হতো তাদেরকে দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর

www.pathagar.com

আগমনের সময়ও এই দাসপ্রথার ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। যেমন উমাইয়া বিন খালাফর দাস ছিলো ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন বেলাল রাদিআল্লাহু আনহু। দাস তার মনিবের মর্জি মোতাবেক চলতে বাধ্য। যদি কখনো এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে মনিবের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর চলতো অমানুষিক নির্যাতন। বেলাল যখন তার মনিবকে অমান্য করে ইসলামের সুমহান দাওয়াত কবুল করেছিলেন তখনই তাঁর ওপর নিষ্ঠুর নির্দয় আচরণ করা হয়েছিল। তখন মনে করা হতো যে, দাস-দাসীদেরকে মনিবের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরাও যে মানুষ এ ধারণাই করা হতো না। মহানবী [সা] সর্বপ্রথম এ শ্রেণি বিভেদ দূর করলেন এবং দাস-দাসীগণকে মানব সমাজের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দাসদেরকে আযাদ করে তার পরিবারের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "দাস-দাসীগণও তোমাদের মতোই মানুষ এবং তোমাদেরই ভ্রাতা, ভগ্নি বা তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তোমরা নিজেরা যা খাও তাদেরও তাই খাওয়াও, নিজেরা যা পরিধান কর তাদেরও তাই পরিধান করাও এবং তাদেরকে সাধ্যের অধিক কাজ দেবে না, যদি দিতেই হয় তবে নিজেরাও সহায়তা করবে।"

নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসেবে আমরা কেট মিলে, জার্মেন গ্রীয়ার বা অ্যানী নুরাকীন এর নাম উচ্চারণ করি, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি মেরী উলষ্টন, অ্যানী বেসান্ত, মেরী প্যাঙ্কহার্ষ্ট, মারগারেট স্যাঙ্গার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের বিরামহীন সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দান করেন, মানবজীবনে নারীর অধিকার পূর্ণভাবে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির যিনি প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন একজন পুরুষ-মুহাম্মাদ [সা]। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহাপুরুষ, যিনি স্ত্রী জাতিকে বস্তুতপক্ষে প্রকৃত মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছেন। মনীষী পিয়েরে ক্রাবাইট-এর ভাষায় : He [Muhammad] was probably the greatest champion of women's rights the world has ever seen.

আইয়্যামে জাহিলিয়াতের যুগে নারীরা যেখানে ভোগের পাত্র ছিলো। সেখানে নবী মুহাম্মাদ [সা] নারীদের সম্মান প্রদান করে বলেন, "নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমাদের যেমন নারীদের ওপর অধিকার রয়েছে। সুতরাং নারীদেরও অধিকার রয়েছে তোমাদের ওপর। নারীদের অধিকার যথাযথ পালন করো, কেননা তাদেরকে তোমরা আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ।" [সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪]

এ কথা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনে অন্য কিছু না করলেও, শুধুমাত্র নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বিশ্ব-মনীষায় প্রিয় নবী [সা]-কে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করবে।

মহানবী [সা]-এর আগমনের পূর্বে সমাজের শিশুরাও অধিকার বঞ্চিত ছিলো। কন্যা সন্তান জন্মের কথা শুনলেই পিতার মুখে ক্ষোভে-দুঃখে বিবর্ণ হয়ে যেত। এমনকি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। অনেক পিতা-মাতা দরিদ্র্যতার ভয়ে তাদের সন্তানদের হত্যা করতো। রাসূল [সা] শিশু সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে বলেন, "যারা ছোটদের ভালোবাসে না এবং বড়দের সম্মান করে না, তারা আমাদের আদর্শের অনুসারী নয়।"

www.pathagar.com

কুরআনের বাণী, "তোমরা অভাবের আশঙ্কায় সন্তানকে হত্যা করো না। আমি তাদের এবং তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে থাকি।" [সূরা বনি ইসরাঈল : ৩১] মহানবী [সা] শিশুদের খুব আদর করতেন। খাবার তুলে দিতেন তাদের মুখে। মাথায় হাত বুলাতেন। কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতেন। একদিন মহানবী [সা] তাঁর নাতি হাসান রাদিআল্লাহু আনহুকে আদর করে চুমু খাচ্ছিলেন। তা দেখে হযরত আকরা ইবনে হারিস নবীজীকে বললেন, 'ওগো নবী [সা] আপনি কি এমনিভাবে শিশুদের আনন্দদান ও আনন্দ উপভোগ করেন? আমি তো আমার ছোট শিশু-সন্তানদের এতো আদর করি না। নবীজী তাঁর জবাবে বললেন, 'তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ যদি মমতা তুলে নিয়ে থাকেন, তাঁর জন্য তো আমি দায়ী নই।' নবীজী আরো বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শিশু-কিশোরদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে না, সে আমার উম্মত নয়।' রাসূল [সা] কখনো শিশুদের ওপর রাগ করতেন না। চোখ রাঙাতেন না। কর্কশ ভাষায় তাদের সাথে কথা বলতেন না। তিনি ছোটদের আদর করে কাছে বসাতেন। তাদের সাথে মজার মজার গল্প করতেন। শিশুদের দেখলে নবীজীর বুক আনন্দে ভরে যেত। প্রিয় নবী [সা] শিশুদের যেমন আদর করতেন, তেমনি আবার তাদের সাথে রসিকতাও করতেন। একবার হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহুর ছোট এক ভাইয়ের একটি পাখি মারা যায়। এতে তাঁর মন খারাপ হয়। নবীজী তখন তাকে আদর করে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, ইয়া আবা উমায়ের মাফা-আলান নুগায়র?

অর্থাৎ হে আবু উমায়ের, তোমার পাখির ছানাটির কী হলো? তখন নবীজীর মুখে ছন্দ ও সুর শুনে সে হেসে ফেললো। [বুখারী ও মুসলিম] নবীজী যখন কোথায়ও সফরে বের হতেন, রাস্তায় কোনো শিশুকে দেখলেই তাকে উটের পিঠে তুলে নিতেন এবং নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতেন। তিনি এতিম শিশুদের ভালোবাসতেন। তাদের মাথায় হাত বুলাতেন। নতুন জামাকাপড় কিনে দিতেন। আদর-যত্ন করতেন। ফলে শিশুরা তাদের বন্ধু নবীজীকে ভালোবাসতেন।

আজ 'পয়লা মে' তে "বিশ্ব শ্রম দিবস" পালন করা হয়। বিশ্বের শ্রমজীবীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশের শ্রমজীবীরাও এ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করে। তাবৎ বিশ্বের শ্রমজীবীরা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়। কিন্তু আজও কি তাদের ন্যায্য অধিকার তারা পেয়েছে? আমরা কি পেরেছি আমাদের শ্রমিক বৈষম্য দূর করতে? আমরা কি শ্রমিকের সাথে আচার-ব্যবহারকে মানবিক দণ্ডে রেখে বিচার করতে পারছি? নাকি আমরাও এই শ্রমিকের বৈষম্যে সিদ্ধ হস্ত? এসব বৈষম্য হোক না চাই বর্ণভেদে, ধর্মভেদে, জাতি বা গোষ্ঠী ভেদে, লিঙ্গ ভেদে, শিশু-কিশোর বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভেদ? বিষয়গুলো আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে। বর্তমান সময়ে এসে আরেকবার মুসলিম হিসেবে সেই চৌদ্দশত বছর আগের স্মৃতি রোমন্থন করলে প্রিয় নবী [সা]-এর আদর্শ থেকে আমরা অনেক শিক্ষাই নিতে পারি। ঘাম শুকাবার আগে শ্রমিকের প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন মহানবী [সা]। নিজের অর্জন থেকে ভক্ষণ করার তাকিদ দিয়েছেন মহানবী [সা]। হালাল উপায়ে আয়-রোজগার করে না খেলে সেই খাবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত শরীর জান্নাতে স্থান পাবে না বলে জানিয়েছেন মহানবী [সা]। মহানবী [সা] নির্দেশিত শিক্ষায় জাতি শিক্ষিত ও তা মেনে চললে আজকের পৃথিবীতে শ্রমিক নিগ্রহ থাকতো না।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর এ সংগ্রাম থেকে ইয়াতীমের অধিকার আদায়ের আন্দোলনও বাদ যায়নি। পিতা-মাতার অনুপস্থিতিতে ইয়াতীমের প্রতি অনেকেই জুলুম করে থাকেন। আর এ জুলুমের শিকার হয় নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকেই। রাসূল [সা] নিজে ইয়াতীম ছিলেন তাই স্বাভাবিকভাবেই ইয়াতীমের প্রতি তার দরদ একটু বেশিই ছিলো। হযরত জাবির রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রাসূল [সা]! আমার তত্ত্বাবধানে যে ইয়াতীম রয়েছে, আমি কোন কোন অবস্থায় তাকে মারতে পারি? তিনি বললেন, যে সব কারণে তোমার সন্তানকে মেরে থাকো, সেসব কারণে তাকেও মারতে পারো। সাবধান! তোমার সম্পদ বাঁচানোর জন্যে তার সম্পদ নষ্ট করো না এবং তার সম্পদ দিয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করো না।" [মুজামুস-সগীর] ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন করে যারা তাদের প্রতি জুলুম করে কুরআনেপাকে তাদের কঠিন পরিণতির কথা বলা হয়েছে, "যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" [সূরা নিসা : ১০]

মানব সন্তান পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম পিতা-মাতা। পিতা-মাতার ভালোবাসার রূপায়ণ তাদের সন্তান-সন্ততি। সন্তান ধারণে মাতা তার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে থাকেন। পিতা তার শরীরের ঘামে অর্জিত সম্পদ দিয়ে সন্তানকে বড় করে তোলেন। পিতা-মাতা তাদের সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখেন সন্তানের জন্যে। সন্তান কীভাবে সুখী হবে সে চিন্তায় তারা থাকেন সদা বিভোর। সৃষ্টি জগতে মানুষের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হচ্ছে পিতা-মাতা। পিতা-মাতার প্রতিই সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বাধিক। তারপরও অনেক সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার প্রতি অনেক জুলুম করে এ পৃথিবীতে। অনেক সন্তান বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ করেই তাদের দায়িত্বটুকু সেরে নেয়। যা কখনো উচিত নয়। কুরআনের বাণী, "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সঙ্গে কোনো বস্তুকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ কর।" [সূরা নিসা : ৩৬] পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা রাসূল [সা]-এর জবানীতে খুঁজে পাই। হয়রত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী কারীম [সা] বলেছেন, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? নবী [সা] বললেন, সে হলো সেই ব্যক্তি যে তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা কোনো একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে যেতে পারলো না। [মুসলিম] পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ববোধ অনেক। হযরত আবু উসাইদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা রাসূল [সা]-এর খিদমতে বসে ছিলাম। হঠাৎ বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে রাসূল [সা]-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নবী [সা]! পিতা-মাতার ইন্তিকালের পরও কি তাদের হক আমার ওপর আছে, যা পূরণ করতে হবে? রাসূল [সা] বললেন, হ্যাঁ তাদের জন্য দোয়া ইসতেগফার করবে, তাদের কোনো অসীয়ত থাকলে তা পূরণ করবে, পিতৃ ও মাতৃকুলের আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান করবে।" [আবু দাউদ]

www.pathagar.com

মানুষ স্বাভাবিকভাবে ও নিজেদের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়েই জীবন-যাপন করে। যেহেতু মানুষ পরস্পর নির্ভরশীল তাই তারা পাশাপাশি ঘর-বাড়ি তৈরি করে সুখে-দুঃখে, বিপদ-আপদে পরস্পরের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও এলাকা নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল [সা]। কারো প্রতি জুলুম করা মহা অন্যায় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তিনি। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা নবী কারীম [সা] [সাহাবাদের মজলিসে] বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, সে লোকটি কিছুতেই ঈমানদার নয়, সাহাবীদের মধ্য হতে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল [সা]! [এমন হতভাগ্য] লোকটি কে? রাসূল [সা] বললেন, যার অনিষ্ট হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না।" [বুখারী ও মুসলিম]

ইসলাম পরিবারের অন্তর্গত এবং বহির্ভূত নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী সকল শ্রেণির আত্মীয়ের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক রেখে সদ্ব্যবহার করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। হয়রত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল [সা]! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, যাদের সাথে আমি আত্মীয়তার বন্ধনের মিল রাখি। আর তাঁরা আমার সাথে সেই বন্ধন কেটে দেয়। আর আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি এবং তাঁরা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, আমি সহিষ্ণুতার সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেই, আর তারা আমার সাথে মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করে। রাসূল [সা] বললেন, যদি ঘটনা এমন হয়ে থাকে যা তুমি বলেছ, তাহলে তুমি যেন তাদের ওপর তপ্ত ছাই নিক্ষেপ করতেছ। অর্থাৎ তোমার ধৈর্যের আগুন তাদেরকে শেষ করে দিবে এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সর্বদা তোমার সাথে তাদের বিরুদ্ধে একজন সাহায্যকারী থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এই অবস্থার ওপর থাকবে।" [মুসলিম]

রাসূল [সা] কখনো কারো প্রতি জুলুম করা পছন্দ করতেন না। সে হোক না অমুসলিম। রাসূল [সা] বলেছেন মনে রেখো, "যদি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোনো বস্তু জোর-পূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে আমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো।" [আবু দাউদ]

রাসূল [সা] সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীলদেরকে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "সাবধান তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেরই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা-যিনি সকলের ওপর শাসক হন তিনিও দায়িত্বশীল। তাঁকেও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

বিচারের ক্ষেত্রে রাসূল [সা] আল্লাহর আইন কার্যকর করতে যেমন কোনোরূপ দুর্বলতা দেখাননি তেমনি সে ক্ষেত্রে তিনি কোনো সুপারিশও গ্রহণ করেননি। বিচারের কাঠগড়ায় মুসলিম-অমুসলিম, গরিব-ধনী সকলই ছিলো সমান। শরীয়তের দণ্ডাদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন কার্যকর করার ব্যাপারে সুপারিশের কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়েছেন এবং তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। বর্ণিত আছে, মাখযুমী বংশের একজন মহিলা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে সে মহিলা রাসূল [সা]-এর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি উসামা ইবন যায়েদের মাধ্যমে তার দণ্ডাদেশ মওকুফ করার ব্যাপারে রাসূল [সা]-এর নিকট সুপারিশের জন্য অনুরোধ করেন।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] তার এ সুপারিশের কথা শুনে উসামাকে ধমক দিয়ে বলেন, আল্লাহর ঘোষিত দণ্ডবিধি কার্যকরণের ক্ষেত্রে তুমি কি সুপারিশ করছ? জেনে রাখ! "আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত, অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম।"

রাসূল [সা] মাজলুমের পক্ষাবলম্বন, মাজলুমের অধিকার সংরক্ষণে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা মালুমের ফরিয়াদ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মাজলুম এবং আল্লাহর মাঝে কোনো দেয়াল নেই।" [বুখারী : ৩৫০৯] মাজলুমকে জুলুমের হাত থেকে রক্ষা করতে আল্লাহর নির্দেশনা হলো, "আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে' যার অধিবাসী জালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।" [সূরা নিসা : ৭৫] মাজলুমকে রক্ষা করতে হলে জালিমের পক্ষ ত্যাগ করা জরুরি। কেননা জালিমের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করলে জালিম জুলুম করতে উৎসাহবোধ করে। কুরআনের বাণী, "আর যারা জুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।" [সূরা হুদ : ১১৩]

বলতে গেলে আজকের বিশ্বে জাতিতে-জাতিতে কলহ-হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে রূপ নিয়েছে, নারীর মর্যাদা নিয়ে চলছে ছিনিমিনি, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ব্যবহৃত হচ্ছে সংকীর্ণ স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে। স্বৈরচারী শাসকের শোষণে মাজলুম মানবতা কাঁদে নীরবে নিভৃতে। এক কথায় মানবতা আজ চরমভাবে পর্যুদস্ত ও ভূ-লুণ্ঠিত। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের উপায় হলো বিশ্বনবী মুহাম্মাদ [সা]-এর আদর্শের অনুসরণ। তিনি যেসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, সেসব বিষয় পরিহার করে একমাত্র তাঁরই নির্দেশিত জীবন পথে অগ্রসর হলেই আমরা আজকের বিশ্ব সমাজ তাঁর সুসংবাদসমূহের ভাগী হতে পারব।

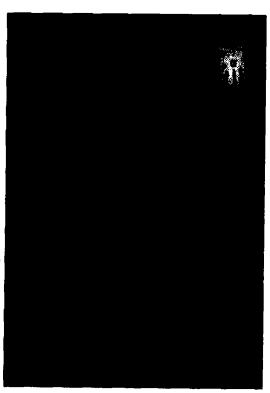

www.pathagar.com

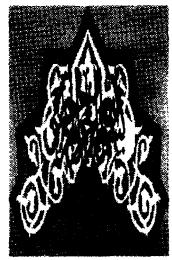

রাসূলুল্লাহ [সা]-এর ন্যায়বিচার

মুহাম্মাদ শোয়াইব

রাসূল [সা]-এর আগমনের আগে পৃথিবীটা অন্ধকারে ছিল। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল পৃথিবীর মানুষগুলো। অন্ধকারে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতো তারা। নৈতিকতার চরম অধঃপতন ও অবক্ষয় ঘটেছিল তখন। ঐতিহাসিকরা সে যুগটিকে আখ্যায়িত করেছেন আইয়ামে জাহিলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলে। ন্যায়নীতি বলতে কিছু ছিল না সে যুগে। চার দিকে অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার। ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য ছিল না। সমাজে আইনের শাসন ছিল না। ফলে সবলরা সব সময় জুলুম করত, দুর্বলরা সব সময় মজলুম হতো। কেউ বিচার প্রার্থনা করলে উল্টো বিচারক কর্তক নির্যাতিত হতো। বিশ্বমানবতার এমন চরম সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন রাসূল [সা]-কে। রাসূল [সা] সুদীর্ঘ নবুয়তী জীবনে যেসব বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম। সমাজে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার না থাকলে যে মানুষ উন্নত হতে পারে না, দুর্বলরা সবল কর্তৃক নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হতেই থাকে, এই সত্যটি রাসূল [সা] বারবার উচ্চারণ করেছেন।

শৈশব থেকেই রাসূল [সা]-এর আচার-আচরণে ন্যায় ইনসাফের স্পষ্ট ছাপ ছিল। রাসূল [সা] যখন মক্কার অদূরে মা হালিমার কোলে লালিত-পালিত হচ্ছিলেন সেই শৈশবের কথা। রাসূল [সা] মা হালিমার একটি দুধ পান করে ক্ষান্ত হতেন। অপরটির প্রতি তার লোভ ছিল না। তিনি সেটি তাঁর ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। কারণ সেটি তাঁর ভাইয়ের হক। এটি ছিল রাসূল [সা]-এর বিশেষ মুজিজা। শৈশব থেকেই তিনি কারো ওপর অবিচার করেননি। সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নিজের গোত্রের লোকেদের বিরুদ্ধে ফয়সালা দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার অবতারণা করছি। বিশর নামক এক ব্যক্তি এক লোকের ঘরে ঢুকে এক বস্তা আটা ও কিছু অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে। এগুলো সে আপন ঘরে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে এক ইহুদির বাড়িতে রেখে আসে। ঘটনাক্রমে আটার বস্তা ফুটো থাকায় পুরো রাস্তায় আটার চিহ্ন পড়েছিল। বাড়ির মালিক সেই চিহ্ন ধরে প্রথমে বিশরের

www.pathagar.com

বাড়িতে ওঠে। সেখানে কিছু না পেয়ে সে আরো খোঁজাখুঁজি করে। পরে দেখতে পায় রাস্তায় পড়ে থাকা আটার চিহ্ন তার বাড়ি থেকে এক ইহুদির বাড়ি পৌঁছেছে। সেখানে গিয়ে তার হারানো বস্তু সামগ্রী পেয়ে যায়। কিন্তু ইহুদি তাকে জানায় যে, বিশর নামক জনৈক মুসলমান এগুলো তার কাছে রেখে গেছে। এবার প্রকৃত চোর বের হয়ে যায়। বিশরই যে এই অপকর্ম করেছে সেটাও প্রমাণিত হয়। বিষয়টি নিয়ে বাড়ির মালিকের সাথে বিশরের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। অবশেষে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য ইহুদি সরদার কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে যাওয়ার প্রস্তাব করে। বিশর ছিল মুনাফিক। সে ভাবে যে, মুহাম্মদের কাছে গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন, এতে মামলার রায় নিশ্চিত ইহুদির বিপক্ষে চলে যাবে। কিন্তু ইহুদি মুহাম্মাদ [সা]-এর সততা ও ন্যায়বিচারে সুখ্যাতির কারণে তার কাছে বিচারপ্রার্থী হতে আগ্রহী ছিল। অনেক বাদানুবাদের পর তারা উভয়ে রাসূল [সা]-এর আদালতে বিচারপ্রর্থী হয়। রাসূল [সা] সব কিছু শুনে দেখেন, ন্যায়বিচার করলে রায় ইহুদির পক্ষে দেয়া উচিত। কালবিলম্ব না করে তিনি ইহুদির পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। বিষয়টি বিশর মেনে নিতে পারছিল না। সে পুনর্বিচারের জন্য হযরত উমর [রা]-এর দ্বারস্থ হন। হযরত উমর [রা] ইহুদির কাছে আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনে বিশরকে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। বিশর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলে উমর [রা] ভেতরে গিয়ে একটি তলোয়ার নিয়ে আসেন এবং মুনাফিকটাকে হত্যা করে ঘোষণা করেন, 'যে মুসলমান রাসূল [সা]-এর ফয়সালা অগ্রাহ্য করে তার পরিণতি এমনই হওয়া উচিত।' ঘটনাটি যখন রাসূল [সা] শুনতে পান তখন তিনি বলেন, উমর কোনো মুসলমানকে হত্যা করতে পারে তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু সূরা নিসায় হযরত উমর [রা]-এর কাজের সমর্থনে আয়াত নাজিল হয়। 'আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করো এবং বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে তর্ক করো না।' ন্যায়বিচারের প্রশ্নে রাসূল ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। চুরির অপরাধে এক মহিলা ধৃত হলে রাসূল [সা] তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। মহিলাটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ায় কিছু লোক রাসূল [সা]-এর কাছে সুপারিশ করে। এতে রাসূল [সা] ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, আল্লাহর কসম আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি এই অপরাধ করত তাকেও আমি এই শাস্তি দিতাম। রাসূল [সা]-এর এমন দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে সাহাবায়ে কেরামও ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। এমনকি ন্যায়বিচারের প্রশ্নে সাহাবায়ে কেরাম নিজ শাসনাধীন রাষ্ট্রের আদালতে বিচারপ্রার্থী হয়েছেন। ক্ষমতার দাপটে তারা বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেননি; বরং ন্যায়বিচারের স্বার্থে তারা বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা রেখেছেন।

যুগে যুগে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছে, এখনো করছে। কিন্তু সমাজে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমরাও ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায় গ্রাম্য সালিশ থেকে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত ছুটছি আর ন্যায়বিচার থেকে শুধু বঞ্চিতই হচ্ছি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বুকের এক সাগর তাজা রক্ত ঢেলে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি, স্বাধীনতার চার দশক অতিক্রান্ত হলেও আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারিনি। বিদেশি প্রভুদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হলেও দেশি প্রভুদের জুলুম-আত্যাচার থেকে

www.pathagar.com

আমরা কোনো সময়ই নিষ্কৃতি পাইনি। আমাদের মাতৃভূমি যেন শান্তির আবাসভূমি হয়, ন্যায়-ইনসাফের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়, মানুষ যেন স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি পায় সে জন্যই আমরা অতীতেও যুদ্ধ করেছি এখনো রীতিমতো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। কুরআন-সুন্নাহর কথা বলার কারণে আমরা নির্যাতিত হয়েছি, শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু দেখেছি। পদে পদে আমরা হোঁচট খেয়েছি, কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছি। কুরআনের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে আমরা গৃহবন্দি হয়েছি, জীবন দিয়েছি। শাসকের সামনে সত্য উচ্চারণের কারণে আমরা শাসক কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার খড়্গ বহন করে বেড়াচ্ছি। গ্রেফতারের আশঙ্কায় অফিসবন্দি জীবন-যাপন করছি। সমাজ বারবার আমাদের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও আমাদের কণ্ঠ রোধ করতে বরাবরই ব্যর্থ হবে। কারণ আমাদের আন্দোলন ক্ষমতার জন্য নয়; বরং কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য। সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য। ইতিহাস বলছে, পৃথিবীটা যেন আলোকিত মানুষে ভরে যায়, অন্ধকার যেন দূরীভূত হয়ে যায়; এর জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আল কুরআন। যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আলো-আঁধার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই বাতলে দিয়েছেন কীভাবে পৃথিবীর মানুষ আলোকিত হবে? কীভাবে অন্ধকার দূরীভূত হবে? সুতরাং পৃথিবীকে অন্ধকারমুক্ত করে আলোকিত করতে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার প্রদর্শিত পথেই চলতে হবে, তার বাতলানো পদ্ধতির পেছনেই ছুটতে হবে। আল কুরআন বলছে, 'নিশ্চয় রাসূল [সা]-এর মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আর্দশ।' ﷺ

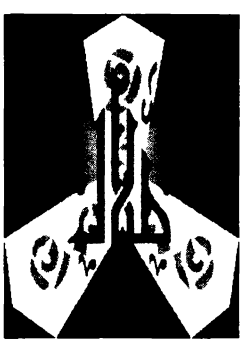

www.pathagar.com

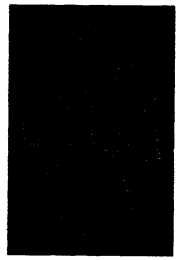

মহানবী [সা]-এর আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ

ড. এম এ সবুর

বিশ্ব ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মাদ [সা]। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ও আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তিনি আরবের জাহিলিয়া বা অন্ধকার যুগের অবসানকারী ও মানবতার মুক্তির প্রকৃত দিশারি। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদ, মহান আল্লাহর ভাষায় 'রাহ্মাতুল্লিল আলামিন'। তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ দুরূদ ও সালাম, [সা]।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখে আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ আর মাতার নাম আমিনা। জন্মকালে তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন না। আর মাত্র ৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন তার মা। তাই পিতা-মাতার অবর্তমানে শৈশবে তাঁকে লালন-পালন করেন তাঁর দাদা ও চাচা। দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন বিখ্যাত কুরাইশ বংশের নেতা। শৈশব থেকেই মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন শান্ত-শিষ্ট ও জাহিলিয়াতের কালিমা থেকে মুক্ত। কৈশরে পদার্পণ করেই তার হৃদয়ে ভাবাগের উদয় হলো। সমকালীন আরব সমাজের মারামারি-হানাহানি দেখে তাঁর কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়। তিনি চিন্তা করলেন কীভাবে আর্ত-পীড়িতদের সেবা করা যায়। এ জন্য সমবয়সী তরুণদের ঐক্যবদ্ধ করেন। আর গঠন করেন 'হিলফুল ফুজুল' নামের একটি শান্তিসংঘ। চলমান অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ করা তাদের লক্ষ্য। যা সব যুগের তরুণ-যুবকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাদের এ উদ্যোগে অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ হলেও সমাজের অন্ধকার-কুসংস্কার দূর হলো না। এতে মুহাম্মাদ [সা] এর কোমল হৃদয় আরও ব্যাকুল হয়। সারাক্ষণ চিন্তায় থাকেন মানবমুক্তির অন্বেষায়, চলে যান মক্কার অদূরে নির্জন হেরা গুহায়। সেখানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হন তিনি। খুঁজতে থাকেন মানবতার মুক্তি। এ অবস্থায় মুক্তির দিকনির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠান তাঁর কাছে। জিবরাইল এসে মহান আল্লাহর বাণী পড়তে বললেন তাঁকে।

কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় পড়তে অক্ষমতা জানান তিনি। পরে জিবরাইলের মাধ্যমে তিনি শিক্ষালাভ করেন। আর মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। অধিকন্তু মানবতার মুক্তির পথনির্দেশ দিয়ে তাঁর ওপর আল-কুরআন অবতীর্ণ করেন। এর পর তিনি মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তাওহিদের বাণী ও মুক্তির মশাল হাতে নিয়ে

www.pathagar.com

তিনি ছুটে চলেন দ্বারে দ্বারে। মুক্তিকামী মানুষরা তাঁকে সহজে গ্রহণ করলেও অন্ধকার-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিরা বাদ সাধে। তারা অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে, ষড়যন্ত্র করে, লোভ দেখিয়ে, যুদ্ধ-সংঘর্ষ বাধিয়ে মুহাম্মাদ [সা]-এর অগ্রযাত্রাকে রোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ-দৃঢ়প্রত্যয়ী মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর সাহায্যে সুন্দর-ন্যায়ের পথে অবিচল থাকেন। আর মহান আল্লাহর নির্দেশনা ও চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে তিনি মানুষের মন জয় করেন। ফলে জাহিলিয়ার তমসা দুরীভূত হয়ে সত্য-ন্যায়ের আলো উদ্ভাসিত হয় প্রায় সমগ্র আরব বিশ্বে। অবশেষে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ১২ রবিউল আওয়াল তারিখে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে মদীনা শরিফে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত মুহাম্মাদ [সা] ইন্তিকাল করলেও বিশ্ব ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর অনুসৃত নীতি-পদ্ধতি সারা বিশ্বের শতাধিক কোটি মানুষ পালন করেন। ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র অর্থসহ জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মহানবী [সা]-এর অনুপম আদর্শ অনুকরণীয়। মহান আল্লাহর বাণী 'আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [সা]-এর জীবনাদর্শে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ'। সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা ও ন্যায়পরতাসহ সব সদগুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল মহানবী [সা]-এর জীবনে। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষসহ মানবিক কোনো দুর্বলতা স্পর্শ করেনি তাঁকে। সারা জীবন কাটিয়েছেন সত্য ও ন্যায়ের পথে। অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে লড়েছেন তিনি কঠিন বিপদ আর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে।

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ অভিভাবক। শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও পরিবারের প্রতি ছিলেন যথাযথ দায়িত্বশীল। হযরত মুহাম্মাদ [সা] আদর্শ স্বামী ছিলেন। তিনি স্ত্রীদের অধিকার যথাযথভাবে পালন করেছেন। এ কারণে একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে স্ত্রীদের কোনো অভিযোগ ছিল না। স্ত্রীদের যথাযথ অধিকার আদায় ও তাদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা মহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমাদের স্ত্রীদের গ্রহণ করেছ; সুতরাং তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ করবে। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তা পরাবে'। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ করতে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম' [আবু দাউদ ও তিরমিযী]। মহানবী [সা] ছিলেন স্নেহপরায়ণ পিতা। তিনি সন্তানদের মধ্যে কোন বৈষম্য করেন নাই এবং অন্যরাও যেন তা না করেন সে জন্য তিনি ছেলেমেয়ে সন্তানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।

শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় মহানবী [সা]-এর ভূমিকা অনন্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত ছিল। শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে তাঁর আদর্শ অনুকরণীয়। আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি তিনি ছিলেন যথাযথ দায়িত্বশীল। তাদের অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন আন্তরিক ও যত্নশীল। তিনি নিজে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করেছেন এবং অন্যদেরকেও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন না করার কঠোর হুশিয়ারি দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না' [বুখারি ও মুসলিম]। এমনিভাবে প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচারণ ও সহানুভূতিতে তার তুলনা হয় না। প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন সদা জাগ্রত।

www.pathagar.com

কোনো প্রতিবেশী যেন কষ্ট না পায় সেজন্য তিনি ছিলেন সচেতন। প্রতিবেশীদের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছেন, 'সে ব্যক্তি মুমিন নয় যার প্রতিবেশী তাঁর নির্যাতন থেকে নিরাপদ নয়' [বুখারি ও মুসলিম]। অধিকন্তু গরিব-অসহায় প্রতিবেশীকে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'সে ব্যক্তি মুসলিম নয় যে নিজে পেট পুরে খায় অথচ তাঁর প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটায়' [বায়হাকি]। এ ছাড়া নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, দাস প্রথা উচ্ছেদ ও কৌলীন্য প্রথা বিলোপ করে সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ [সা] অনুকরণীয় আদর্শ স্থাপন করেছেন।

রাষ্ট্রব্যবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ [সা] ছিলেন উদারনৈতিক। রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান তাঁর নীতি। এ কারণে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থায় ইহুদি খ্রিস্টান পৌত্তলিকসহ সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন তিনি। ধর্ম-বর্ণের ভিত্তিতে নয় বরং আইনের ভিত্তিতে ন্যায়বিচার করাই ছিল তার বিচার পদ্ধতি। এজন্য সম্ভ্রান্ত কিংবা নিকৃষ্ট হিসেবে জাতিকে বিভাজিত করেননি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ন্যায়বিচারে অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন, 'ন্যায়বিচারে তোমরা সাবধান হবে! অতীতে অনেক জাতি ন্যায়বিচার না করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আমার কন্যা ফাতিমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হলে তারও হাত কাটা হবে' [বুখারি ও মুসলিম]। মহানবী [সা]-এর এমন কঠোর ন্যায়বিচারে জাহিলিয়া আরব সমাজেও শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে।

মহানবী [সা] ভিন্ন ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতিশীল-সহমর্মী ছিলেন। এ জন্য যুদ্ধবন্দিদের সাথে তিনি সদাচরণ করেছেন। পৌত্তলিক তায়েফবাসী প্রতিনিধি দলকে তিনি মদীনার মসজিদে স্থান দিয়েছেন। একইভাবে নাজরানের খ্রিস্টানদের জন্য মসজিদে নববীতেই উপাসনার ব্যবস্থা করেছেন। ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে তিনি মদীনায় আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। এমনিভাবে ভিন্ন ধর্মের প্রতি তিনি উদারতা দেখিয়েছেন। তিনি ছিলেন দয়া ও ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। যাদের অত্যাচারে তিনি বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, যারা তাঁকে মাতৃভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছে তাদের জন্য বিজয়কালে তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। চরম শত্রুকেও পরম মমতায় তিনি কাছে টেনেছেন।

প্রকৃতপক্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা] অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। মহান আল্লাহর ভাষায়, 'নিশ্চয়ই আপনি মুহাম্মাদ [সা] উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন' [আল কালাম-৪]। আর সংঘাতপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মহানবী [সা]-এর আদর্শ অনুকরণীয় হতে পারে।

www.pathagar.com

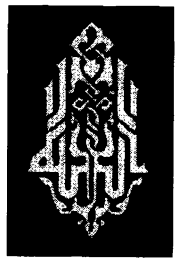

রাসূলের [সা] আগমন

অধ্যক্ষ মোঃ ইয়াছিন মজুমদার

মক্কাসহ সারা বিশ্ব যখন মানবতাহীন বর্বর সমাজ ব্যবস্থায় পৌছেছিল। দস্যুবৃত্তি, মদ জুয়ার প্রসার, মূর্তিপূজা, দাসদাসী প্রথা, অবহেলিত নারী সমাজ, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিতকরণ, খোদায়ী বিধান ত্যাগ করে গোত্রপতিদের নিজস্ব নিয়মে চলতো গোত্রের লোকজন। ইহুদি খ্রিস্টানগণ আল্লাহর কিতাব বাইবেল ও ইঞ্জিলে নিজের খুশি মতো পরিবর্তন করে নিজস্ব আইন-কানুন তাতে সন্নিবেশিত করে। শুধু হানিফ বলে খ্যাত মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এক আল্লাহতে বিশ্বাস করত। এমতাবস্থায় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন নবী মুহাম্মাদ [সা]। আল্লাহ পাক বলেন-নিশ্চয় আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। [সূরা-আম্বিয়া, আয়াত-১০৭]

বাল্যকাল থেকে নবী [সা] ছিলেন অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম। চারিত্রিক সৎগুণাবলী ও বিশ্বস্ততায় তিনি সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন আল আমিন অর্থাৎ বিশ্বাসী হিসেবে। তিনি চিন্তা করতেন কীভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত এ জাতিকে আলোর পথ দেখানো যায়। এমনিভাবে ৪০ বছর বয়সে হেরা গুহায় চিন্তামগ্ন অবস্থায় আল্লাহর বাণী নিয়ে আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাইল [আ] নবীজীর নিকট আগমন করেন। পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হতে থাকে সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রচার করতে থাকেন খোদায়ী বিধান আল কুরআন। তৎসময়ে স্বাভাবিক মানবিক গুণগুলো ধারণের জন্য উমাইয়া ইবনে আবু ছালত, কুস ইবনে সাদাহ, আমর ইবনে তোফায়েল প্রমুখরাও সংসার বিরাগী হয়ে ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার দাওয়াতী কাজ করতেন। কিন্তু তাদের দাওয়াত দেয়ায় কাফিরদের থেকে কোনো বাধা আসেনি। বরং নবী মুহাম্মাদ [সা]-এর দাওয়াতী কাজে প্রবল বাধা আসতে থাকে। নবী [সা] তখন ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির দাওয়াত দেননি। কেননা পাঁচওয়াক্ত নামাজ ফরয হয় হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মিরাজ রাতে। রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ফরয হয় মদীনায় হিজরত করে যাওয়ার পর। নবী [সা]-এর দাওয়াতী কাজে বাধা এলো কারণ-কুরআন নাযিলের কারণে কাফির সর্দারগণ বুঝতে পারে অন্য ধর্মগুরুদের মতো ইসলাম শুধু উপাসনালয়ে বসে বসে উপাসনা করার ধর্ম নয় বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। তারা বুঝতে পারে গোত্র শাসনের জন্য তাদের প্রণীত আইনের পরিবর্তে খোদায়ী আইন চালু হলে তাদের মনগড়া দেবদেবীর উপাসনা

www.pathagar.com

বন্ধ হবে, ধর্মের নামে নিপীড়ন ও ভোগের সুযোগ বন্ধ হবে, বিচারের নামে প্রহসন বন্ধ হবে। তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব থাকবে না, তাই তারা প্রথমে লোভ দেখিয়ে প্রচার বন্ধ করতে চেষ্টা করে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচার চালাতে থাকে। সে সাথে মুহাম্মাদ [সা]-এর ধর্মের কিছু নিয়ম-কানুন ও তাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুনে সম্মিলিতভাবে সমঝোতার মাধ্যমে ধর্ম পালনের প্রস্তাব দেয়। তা ব্যর্থ হলে নবী [সা] ও নব মুসলিমদের ওপর চরমভাবে অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করে। সে সাথে কারো কানে যেন কুরআনের বাণী পৌঁছতে না পারে, কেউ যেন কুরআন না শুনে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। আল্লাহ পাক বলেন– কাফিররা বলে তোমরা এ কুরআন শুনো না এবং কুরআনের বাণী প্রচার স্থলে গোলমাল সৃষ্টি কর, তবে তোমরা সফল হবে [সূরা-হামিম সিজদা, আয়াত-২৬] কাফিরদের নির্যাতন থেকে জীবন বাঁচাতে নবুয়তের ৪র্থ ও ৫ম বছরে বেশ কিছু মুসলমান নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। নির্যাতনে ও ইসলাম প্রচার বন্ধ করতে না পেরে আরবের সকল গোত্র মিলে মুহাম্মাদ [সা] ও তার বংশীয় লোকজন এবং মুসলমানদের শিয়াবে আবি তালিব নামক উপত্যকায় বন্দি করে রাখে। তাদের সাথে কথাবার্তা, যোগাযোগ, বেচাকেনা সব বন্ধ করে দেয়া হয়। খাদ্যাভাবে মুসলমানদের দুরবস্থা সৃষ্টি হলো। নারী ও শিশুদের কান্নায় সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে উঠলেও কাফিরদের হৃদয় গললো না। নির্যাতনে অতিষ্ঠ মুসলমানগণ ধীরে ধীরে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে থাকে। নবুওয়তের দ্বাদশ বর্ষে ২৭ রজব নবী [সা] মিরাজ গমন করেন। ইসলামের গতিরোধের প্রবল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে মক্কার কাফিরগণ দারুণ নাদওয়া অর্থাৎ পরামর্শ গৃহে একত্র হয়ে নবী [সা] কে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অহী মারফত আল্লাহ এ সংবাদ নবী [সা]-এর নিকট পৌঁছে দেন এবং মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে নবী [সা] আবু বকর [রা]-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে রওনা হন। মদীনায় প্রায় সকলে ছিল ইহুদি। তিনি মদীনায় পৌঁছে ইহুদিদের সাথে একটি ঐক্যচুক্তি করেন যা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে খ্যাত। এ চুক্তির অনেকগুলো ধারার মধ্যে একটি ধারা ছিল– যদি মক্কার কাফিররা মদীনায় হানা দেয় তবে মদীনার ইহুদিরা মুসলমানদের সাথে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মদীনায় ও বহিঃবিশ্বে ইসলামের প্রচার দেখে মক্কার কাফিররা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে অনেকগুলো যুদ্ধ বাধায়। বদর, উহুদ, খন্দক এর মধ্যে অন্যতম। ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে ওমরা করার জন্য নিকটবর্তী হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মক্কার কাফিরদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি হয়। রাসূল [সা] হুদাইবিয়ার সন্ধির পর এমন কথা বলেননি শুধু দাওয়াত দিয়ে মানুষকে দ্বীনের পথে আনলেই-সকলে মুসলমান হয়ে গেলেই মক্কাসহ সর্বত্র ধীরে ধীরে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। বরং মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলো জয় যেদিকে মানুষ সেদিকে বেশি ঝুঁকে যায় এবং বিজয়ী মতাদর্শের দল ভারী হয়। আল্লাহ তায়ালা সে দিকে লক্ষ্য করেই ঘোষণা করেছেন– যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং মক্কা বিজয় হবে আপনি দেখবেন দলে দলে লোক দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করবে [সূরা-নসর, আয়াত: ১-২] তাই যেখানে যুদ্ধের প্রয়োজন নবী [সা] যুদ্ধ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় ৮ম হিজরীতে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেন এবং ৮ম হিজরীর রমজান মাসে মক্কা মুসলমানদের অধীনে আসে।

www.pathagar.com

দশম হিজরীতে ঐতিহাসিক বিদায় হজ সম্পাদন ও আরাফাত ময়দানে নবী [সা]-এর ভাষণ সমগ্র মানবজাতির জন্য দিক নির্দেশনা হয়ে রয়েছে। আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত মদীনা কেন্দ্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবজাতিকে আলোর পথে ডেকে আনেন। একাদশ হিজরীর ১২ রবিউল আউয়াল নবী [সা]-এর ইন্তিকালের পর উক্ত কল্যাণ রাষ্ট্র পর্যায়ক্রমে আবু বকর [রা], উমর [রা], উসমান [রা], আলী [রা] পরিচালনা করেন। এ কল্যাণ রাষ্ট্র পৃথিবীর বেশি এলাকায় প্রসারিত হয়। কিন্তু কালক্রমে মুসলমানদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আদর্শ বিচ্যুতির কারণে ও বিজাতীয় চক্রান্তের আবর্তে মুসলমানগণ তাদের সে গৌরব হারিয়ে ফেলে। রবিউল আউয়াল মাস নবী [সা]-এর আগমনের মাস হবার কারণে আমাদের নিকট মর্যাদা ও গৌরবের। আমরা এ গৌরবের মাসে দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করি যেন নবী [সা]-এর পরিপূর্ণ আদর্শ গ্রহণ করে আল কুরআনকে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবনে প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সে গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারি। বর্বর জাহিলি যুগের লোককে কুরআনের শাসন ব্যবস্থা আদর্শ জাতিতে পরিণত করে। সে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে আজকের সমাজেও শান্তি ফিরে আসবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

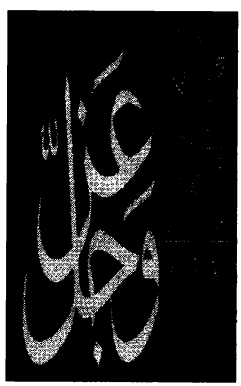

www.pathagar.com

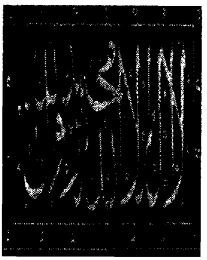

যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বনবী [সা]-এর শিক্ষা

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

বিশ্বনবী [সা]-এর জীবনকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬১০ পর্যন্ত। এ সময় তিনি একজন সাধারণ আরবের মতো জীবন অতিবাহিত করেছেন। দুই ৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ পর্যন্ত। এ সময় তিনি একজন মানুষ এবং নবী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। [প্রথম চল্লিশ বছর তার জীবনে কোনো বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়নি। সামান্য অভাব, নিরূপায় এবং একজন পিতৃ-মাতৃহীন শৈশবের দুঃখ-বেদনা ছাড়া]। কিন্তু পরের ২৩ বছর তার জীবন সঙ্কটের মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এ দু'টি পর্বকে সংস্কারের দিক দিয়ে মক্কী এবং মাদানী জীবন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরবের অবিশ্বাসীরা খুব নির্বোধের মতোই তার এ দু'টি জীবনকে জেনেশুনে বিকৃত করার অপচেষ্টা গ্রহণ করেছে। কুরআনে তাঁর উপযুক্ত জবাব প্রদান করে তাঁর উন্নত চরিত্রকে। সমগ্র বিশ্বাসীর সামনে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। এই অবিশ্বাসীরা এতই মিথ্যার পরিচয় দিয়েছিল যে, একই মুখে তারা রাসূল [সা]-কে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আলামিন, বিশ্বাসী, সত্যবাদী, আমানতদার ইত্যাদি বলে ঘোষণা করেছে, তারাই পরবর্তীতে তাঁকে আবার মিথ্যাবাদী, জাদুকর, কবি ও উম্মাদ ইত্যাদি বলে নিজেদের ভণ্ডামি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে– অথচ সমাজের চোখে তারা নিজেরা নিজেদরকে মহাজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের লোকজন বলে চিহ্নিত হওয়ার অপচেষ্টা করেছে। অথচ তা এক নিষ্ফল কামনা এবং চরম মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করে না। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের অবিশ্বাসী সুশীল বুদ্ধিজীবী সমাজের জন্য মহানবীর উন্নত চরিত্রের রাই-প্রকাশ কুরআনই তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারে। যদি তাদের ভাগ্যে ঈমান আনা নির্ধারিতহয়ে থাকে।

একজন নবী এবং রাসূল হিসেবে মক্কা এবং মদীনায় মুহাম্মাদ [সা]-এর গুরুত্বপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়। এই সময় তাঁর উপর মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরও তিনি নিজেকে একজন মানুষ হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন। এভাবে: বল! আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ

www.pathagar.com

একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম "যদি তাকে ফেরেশতা করতাম, তবে তাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম আর তাদেরকে সেরূপ বিভ্রমে ফেলতাম যেরূপ বিভ্রম তারা এখন করেছে [সূরা আনসাম : ০৯]। তোমার পূর্বে আমি ওহী সহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর এবং আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহার্য গ্রহণ করত না, তারা চিরস্থায়ীও ছিল না [সূরা আম্বিয়া : ৭-৮]। অন্যকে, আমি তোমার পূর্বে যতগুলো রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, সবাই তারা জনপদের অধিবাসী ... এই অহি নাযিলের পূর্বেও চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি একজন আল-আমীন খেতাবধারী, আমানতদার, সত্যবাদী, পরোপকারী, দয়ালু, চরিত্রবান মানুষ হিসেবে মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের কাছে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। কেউ-ই তার কর্মে চরিত্রে বিন্দু-বিসর্গ পর্যন্ত কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরতে পারেনি। শৈশব, কিশোর এবং যুবক জীবনেও তিনি সর্বদা অন্যের অধিকার সম্পর্কে ছিলেন পূর্ণ সচেতন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার ছিল এই যে, তিনি ছিলেন একজন সম্পূর্ণ অশিক্ষিত নিরক্ষর নবী। সে সময় সমগ্র আরবে মাত্র সতের জন শিক্ষিত লোক ছিল বলে জানা যায়। তিনি জীবনের একদিনও তাদের কাছে লেখাপড়া শিখেছেন বলে কোনো তথ্য মেলে না। সে সময় কোনো নামকরা বিদ্যালয় বা পাঠাগার ছিল বলে জান যায় না, যেখান থেকে তিনি মানুষের জন্মরহস্য, জোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। বার বৎসর বয়সে একবার মাত্র মক্কার বাইরে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকেও যে তিনি কিছু অর্জন করেছেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। তার চতুষ্পার্শ্বে যারা তার সাথে বেড়ে উঠেছিলেন তারাই এর নীরব সাক্ষী। আবার তারাই বলে, এ কেমন রাসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে। তার নিকট কোনো ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হলো না যে, তার সঙ্গে থাকত সর্ব সংরক্ষণকারীরূপে? অথবা তাকে ...দেওয়া হয় না কেন অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যা থেকে যে সে আহার্য সংগ্রহ করতে পারে। সীমা... যে মুহাম্মদ [সা] জীবনে কোনো দিন লেখাপড়া শেখেননি, কাউকে শিক্ষক মানেননি- একটি অশিক্ষিত নিরক্ষর পরিবেশে যার বেড়া ওঠা- চল্লিশ বৎসর পর তিনি কিতাব প্রাপ্ত হলেন তা-কি কোনো মানুষ মুহাম্মদ [সা] কর্তৃক সংকলিত বলে মনে হয়? না, তা হয় না। অনুরূপ কিতাব কি এর আগে কোনো বিখ্যাত লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ছিল? না, তা ছিল না। থাকলে ঐ কিতাবের অনুসন্ধান কি আজও পর্যন্ত থেমে থাকত? ৬১০ সালে মরুভূমির মতো এক জাজিরাতুন। আরবে অবতীর্ণ বিজ্ঞানময় কুরআনের কোনো বৈজ্ঞানিক ভুল তথ্যের অনুসন্ধান কি আজো পর্যন্ত থেমে আছে? নেই। শত চেষ্টা করেও বিরুদ্ধ বাদীরা তার ভুল ধরতে পারেননি। আল্লাহর দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। যেখানে বলা হয়েছে : এই কুরআন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার [রাসূলের] প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তবে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর [সূরা বাকারা-২০৩]। এরূপ চ্যালেঞ্জ কুরআনের কয়েক স্থানেই দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের সেরা বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক কেউ-ই তাঁর সমকক্ষ হতে পারেননি। তিনি নিরক্ষর লেখাপড়া না শিখে যে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, বিশ্ববাসীকে

www.pathagar.com

উপহার দিয়ে গেলে আজো পর্যন্ত তার সমকক্ষ কোন সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ মেলে না। অথচ এক সময় তাদের কাছেই গণ্য হলেন কবি উম্মান, গনক হিসেবে এখন বর্তমানে পৃথিবীতেও অবিশ্বাসীদের মিথ্যা দাপট থেমে নেই। যারা বিশ্বাসী তাদের উন্নত জীবনকেও এ ভাবেই প্রথম দিকে ভালো বললে, ইসলামিক যখন একটি বিজয়কবি হিসেবে দ্বারপ্রান্তে উপনীত করার চেষ্টা করা হয়েছে, তখনই তার নেতৃত্বকে জাতীয়বাদ, মৌলবাদ ও সম্প্রদায়িকত্ববাদ নামে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত করা হয়েছে। যুগে যুগে এর বহু প্রমাণ মিলেছে। এই সকল বিশ্বাসীদেরকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হবে এবং ... তাদের সকল কর্মকে নিরর্থক বলে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে [সূরা হুদ-১৬]। এখন দেখা যাক ১৪০০ বছর আগে একজন নিরক্ষর নবী যা [মহাগ্রন্থ কুরআন] বিশ্বাসীকে উপহার দিয়েছিলেন- আজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই চরম উৎষর্কতার যুগে বহুমাত্রিক জ্ঞান সম্বলিত তদ্রুপ একটি কুরআনের মতো গ্রন্থ রচনা কী কারো দ্বারা সম্ভব হয়েছে? না। তা কোনোদিনও সম্ভবও না। কুরআনের শুরুতেই তাই তো ঘোষিত হলো- এটা সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, বক্রতা নেই, ভুল নেই। অথচ দুনিয়ার সমস্ত কিতাবের শুরুতেই তার ভুল, সীমাবদ্ধতা স্বীকার করা হয় দক্ষতার সাথে, বিনয়ের সাথে, নিষ্ঠার সাথে, অথচ একজন নিরক্ষর মরুভূমির বুকে বেড়ে ওঠা মানুষ মুহাম্মদ [সা] যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব প্রাপ্ত হলেন তার শুরুতেই বলা হলো- "যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি"। কি চমৎকার চ্যালেঞ্জ! এর দ্বারা প্রমাণ হয়েই গেল যে এই কিতাব কোনো মানুষ কর্তৃক রচিত কিতাব নই, মহান রাল্লাহ রবক্ষুল আলামিন এই কিতাবের রচয়িতা। তিনিই মুহাম্মদ [সা] এর আসল শিক্ষক। জ্ঞানের ও সর্ব জীবের স্রষ্টা।

বিজ্ঞ ইহুদি আলেমরা জানতেন মুহাম্মদ [সা] ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। কোনো স্থান থেকে নিরক্ষর হিসেবে তার পক্ষে কোনো ইতিহাস জানা সম্ভবও না। কারণ তাদের মাঝেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। তারপরও তারা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন। জুলকারনাইনের বাদশা, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনা এবং আসহাবে কাহফদের কথা ইত্যাদি। অথচ এ ইতিহাস তাদের জানা ছিল। মুহাম্মদ [সা] সর্বস্তরে তা [ঐতিহাসিক ঘটনাবলি] বর্ণনা করলেন। তারা তা স্বীকারও করলেন। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল এ ইতিহাস মুহাম্মদ [সা] কোথা থেকে জানবেন? তিনি তো নিরক্ষর। আদ জাতির মধ্যকার এক ব্যক্তি আবু রিগাল। সোনার একটি ছড়িসহ গযবে পতিত হয়। স্থানটি তিনি সাহাবীদের দেখান। তৎক্ষণাৎ মাটি খনন করে উদ্ধার করা হলো সোনার ছড়িটি। একজন প্রত্মতত্ত্ববিদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করলেন মুহাম্মদ [সা] একজন নিরক্ষর মানুষ মুহাম্মদ [সা] শুধু সূরা কাওছার উপহার দিয়ে সমগ্র আরবের খ্যাতিমান কবিদের খ্যাতিকে ম্লান করে দিলেন। তারা হতবাক হয়ে গেল। তারা বলতে বাধ্য হলো– "লাইছাল কালামু হাযা মিনাল বাশার"। তারা পরাজিত হলো। তারা ভাবতেও পারেনি তাদের মধ্য থেকে বেড়া ওঠা মানুষ মুহাম্মদ [সা]-এর মুখ থেকে এমন উচ্চমান সাহিত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে।

"আপনার পালনকর্তা মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিলেন– পাহাড়ে, বৃক্ষে ও উঁচু চালে গৃহ নির্মাণ কর, এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ করো এবং আপনার পালনকর্তার

www.pathagar.com

উন্মুক্ত পথসমূহ অনুসরণ করো। ফলে তার পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় তাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে [সূরা নাহল-৬৮-৬৯]। মানুষ মুহাম্মদ [সা] কি ইতোপূর্বে মরুভূমির বুকে বিজ্ঞানী হিসেবে কোনো নিদর্শন আরবদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন? গবেষণারত অবস্থায় হেরাগুহায় তিনি মধু-মৌমাছির বিষয়ে অহি নাযিলের পূর্বেই এমন তো কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব মরুবাসী আরবদের জানিয়েছেন বলে কোনো প্রমাণ মেলে না। একজন লেখাপড়া না জানা মানুষ মুহাম্মদ [সা]-এভাবে প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট যে সব তত্ত্ব এবং তথ্য মরুবাসী আরবদের জানালে- তারা কি কখনো ভাবতেও পেরেছিল কি, এমন একজন মানুষ তাদের মাঝে আবির্ভূত হবেন। যিনি সর্ববিষয়ে তাদের সকল সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে যাবেন- এই অলৌকিক গ্রন্থ আল-কুরআনের মাধ্যমে। এমন এমন বিষয়ে তারা অবগত হলো এবং উপকৃত হলো যা ইতোপূর্বে তাদের সম্পূর্ণ অজানা ছিল। একদিন সমগ্র বিশ্বজুড়ে তাদের পরিচয় ছিল কঠর, অসভ্য জাতি হিসেবে। এক নিরক্ষর মানুষ মুহাম্মদ [সা] এর দ্বারা তারা সমগ্র বিশ্বকে জয় করে তাবৎ পৃথিবীর ইতিহাসে আবার সভ্য বলে খ্যাতি লাভ করল। তারা সমগ্র পৃথিবীকে সত্যের পথ দেখিয়ে আলোকিত করল। তিনি নিরক্ষর হতে পারেন। তবে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষক, সর্বোপরি মর্তে বেড়ে ওঠা একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ- মানুষের মাঝে উঠাবসা, চলাফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ, শান্তি, চুক্তি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের চরম শীর্ষে উপনীত একজন মানুষ মুহাম্মদ [সা]। আজকের বিশ্ব যে ক্ষেত্রেই সমস্যার সম্মুখীন হোক না কেন, তার উত্তম সমাধান বিশ্বনবী-এর জীবন থেকে নিতে পারে। এ জন্যেই কুরআনেও ঘোষণা হলো- তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ [আ.....-২১]। যে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অন্ধকার, বর্বর, জাহিলি সমাজে বেড়ে উঠলেন, জাতিকে পরিবর্তন করার মতো কোনো দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করতে পারলেন না, নিজস্ব চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগালেও সাফল্য লাভ করতে পারলেন না, এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে দুনিয়ার কোনো মানুষ রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সাহিত্যিক তার সকল শক্তিকে কর্মে নিয়োজিত করলেও সে ততক্ষণ পর্যন্ত বিজয় লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ হিসেবে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার সাথে অহির জ্ঞানের সমন্বয় না ঘটে। মানুষ মুহাম্মদ [সা] এর চল্লিশ আর তেইশ-এ দুটি পৃথক জীবন ধারার বিশ্লেষণই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনই হলো উত্তম আদর্শ। এ আয়াতের মধ্যে শুধু তেইশ বছরের জীবনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং চল্লিশসহ তেইশকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন মানুষ হিসেবেও তাঁর চরিত্র ছিল [নবুওয়তের পূর্বে] সকলের জন্য এক অনুকরণীয়-অনুসরণীয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৪৩৫ বছর আগে মরুপুত্র মরুভূমির একজন উষ্ট্রচালক ঘোষণা করেছিলেন: "এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবু কি তারা বিশ্বাস করবে না [সূরা আম্বিয়া-৩০]। এই তথ্যটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফল মিললো এই সেদিন। অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলল সহস্র কোটি বছর আগে মৌলিক জড়বস্তু সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজম বা প্রাণকোষের মূল উপাদানের উৎপাদন শুরু করে যার থেকে সৃষ্টি হয় এ্যামিবা [সর্বদা আকার পরিবর্তনশীল সূক্ষ্মত জীবাণু

www.pathagar.com

বিশেষ] এবং সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি সেই সারবস্তু থেকেই! এক কথায় প্রাণী জগতের উৎপত্তি ঐ পানি থেকেই। কোনো বিজ্ঞানী, কোনো দার্শনিক অথবা কোনো ঐতিহাসিক, কবি চতুর্দশ শতাব্দীর আগে এই আবিষ্কার কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন? উপরিউক্ত পঙক্তিমালা থেকে হয়তো অনুধাবন করা কঠিন হবে না যে, মহাপরাক্রমশালী বিশ্বস্রষ্টা বর্তমানের সংশয়বাদী জ্ঞানী পন্ডিত ব্যক্তির লক্ষ্য করেই এসব বাণী প্রেরণ করেছিলেন। আজ হতে ১৪০০ শত বছর পূর্বে কোনো মরুবাসীর পক্ষেই এসব কথার গ্রন্থের রচয়িতা, পণ্ডিত, জ্ঞানী বুদ্ধিজীবীদেরকেই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন– আপনারা কেন আল্লাহকে বিশ্বাস করেন না? আপনি কেন আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী হবেন। কিন্তু আপনি হয়েছেন প্রথম। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এসব তথ্য কথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিই প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন। বিপুল পরিমানে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান আহরণ করে তাদের গর্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের সঙ্গে যে বিশুদ্ধ বিনয় থাকার প্রয়োজন তা তাদের নেই। এ কারণেই তারা মানুষ মুহাম্মদ [সা]-কে চিনতে ভুল করেছে। কুরআন হলো সেই অলৌকিক গ্রন্থ যেখানে সৃষ্টি ও জ্ঞান তথা অধিবিদ্যাসংক্রান্ত যাবতীয় নিগুঢ় তত্ত্ব [Metaphysics] থেকে শুরু করে সামাজিক ও তামুদ্দুনিক বিষয়সহ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অকাট্য উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। সে সব কথায় কোথা বৈপরীত্য [Inconsistency] খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআনে তা চমৎকার ভাষায় উপস্থাপন করা হলো এভাবে: "এরা কি লক্ষ করে না পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বৈপরিত্য দেখতে পেত [সূরা নিসা : ৮২]। কুরআন দুনিয়ায় নাযিল হওয়ার পর ১৪০০ বছর গত হয়েছে। এ সময় মানুষ অনেক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছে, অনেক নতুন কথা জানতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু মানুষ মুহাম্মদ [সা] এর মুখঃনিসৃত উক্তির [কুরআন] মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো বৈপরীত্য বা অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায়নি। অথচ দুনিয়ায় এ পর্যন্ত এমন কোনো দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেনি, যার কথায় কোনোরূপ পারস্পরিক বৈপরীত্য পাওয়া যায় না এবং যা সর্ব প্রকার মতবৈষম্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এ সময়ের মধ্যে বহু দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বিবেক বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রতিভা বলে জীবন ও বিশ্বলোকের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু খুব বেশি সময় না যেতেই তাদের মতামতে বৈপরীত্য অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যহীনতা প্রকট হয়ে পড়েছে। কালস্রোত তাদের সে সব মতামত প্রত্যাখ্যান করে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়েছে। অথচ অলৌকিক গ্রন্থ আল-কুরআন- যা একজন নিরক্ষর মানুষ মুহাম্মদ [সা] তার মুখনিঃসৃত বাণী, দেড় হাজার বছরেও তার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য পাওয়া গেল না- একি কম বিস্ময়কর!

www.pathagar.com

মানবজাতির জন্য ভালোবাসার নিদর্শন : রাসূল [সা]

শেখ মোহাম্মদ শোয়েব নাজির

ভূমিকা

ইন্টারনেটবান্ধব এই যুগে বিশ্বকে যে গ্লোবাল ভিলেজ বলা হচ্ছে, তার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা এক ধরনের আহাম্মকী। যোগাযোগের দ্রুততা বিশ্বের প্রতিটি দেশকে এখন এক একটি গ্রামে পরিণত করেছে। ৬০/৭০ কিলোমিটার যানজটের কারণে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে যে সময় লাগে, সে সময়ের মধ্যে বিশ্বের আরেক প্রান্তে চলে যাওয়া যায় এবং বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের খবর যে কোনো মুহূর্তে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরাশক্তি, পাতিশক্তি সবারই এখন আন্তঃদেশীয় মিসাইল রয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের যে কোনো গ্রামে মিসাইল পৌঁছে যাবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। ফলে প্রতিটি দেশ এখন পরিণত হয়েছে এক একটি গ্রামে। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাতে দেখেছেন বিশ্বগ্রামের অতি ক্ষুদ্র গ্রাম বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সাইজের মোড়লরা কীভাবে মোড়লিপনা করেছেন। এতে বিবেকওয়ালাদের বুঝতে বাকি নেই যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের অবশ্যই বিশ্বগ্রামের মোড়লদের বিষয় মাথায় রেখেই বাংলাদেশ নামের এই গ্রামকে চালাতে হবে। যানবাহন চালাতে স্টিয়ারিং লাগে। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে কারিকুলাম লাগে। অফিস চালাতে বিধি লাগে। তেমনি মানুষ চালাতে আদর্শ লাগে। আদর্শের রঙে রঞ্জিত হয়ে মানুষ নিজেদের জীবন পরিচালিত করে। মানুষকে চালাতে গিয়ে আদর্শের দৈন্যতায় যারা দোদুল্যমান থাকেন তাদের অন্যের আদর্শ অনুকরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না এবং অন্যের আদর্শ অনুকরণে নানান মিথ্যা আর ছলের আশ্রয় তাদের নিতে হয়। একদিকে মাওবাদ, মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, ফ্যাসীবাদ, পুঁজিবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ, ইহুদিবাদ, বৌদ্ধবাদ ইত্যাদি নানান আদর্শে মানুষ সারা পৃথিবীতে পরিচালিত হচ্ছে। চীন, মাওবাদ এবং বৌদ্ধবাদ দিয়ে অনুপ্রাণিত হলেও হালে চীনও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে পরিচালিত একটি দেশ। মাওবাদ, ফ্যাসীবাদ, লেলিনবাদ এবং মার্কসবাদ কার্যত এখন বিশ্বের কোথাও আদর্শ হিসেবে আদৃত না হলেও ফ্যাসীবাদ ছিল হিটলারের আদর্শ। মাওবাদ এখনও চীনে কিছুটা নীতিগতভাবে আদৃত। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শ। বাংলাদেশ বাকশাল বলে একটি

www.pathagar.com

মতবাদ উচ্চারিত হলেও উক্ত মতবাদের অস্তিত্ব এবং এর কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোথাও নেই। বাংলাদেশে একসময়ের প্রতিষ্ঠিত বাকশাল এবং মুজিববাদ ছিল প্রকৃতিগতভাবে জার্মানির হিটলারের ফ্যাসীবাদের সাথে তুলনীয় এবং মার্কসবাদ-লেলিনবাদের চেতনা লালিত, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির আড়ালে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত। এছাড়া বিশ্বের আর কোথাও এই মতবাদের অনুসারী নেই এবং আদর্শ হিসেবেও তা বিশ্বের কোথাও স্বীকৃত নয়। বৌদ্ধবাদের আদর্শে পরিচালিত হয় এমন কিছু দেশ হলো জাপান, চীন, বার্মা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি। ইহুদিবাদের আদর্শে পরিচালিত দেশ হলো ইসরাইল। ব্রাহ্মণ্যবাদের আদর্শে পরিচালিত হয় এমন দেশ হলো ভারত। পুঁজিবাদের আদর্শে পরিচালিত দেশ হলো আমেরিকা, পশ্চিমা বিশ্ব এবং সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে পরিচালিত বিশ্বের অন্য সকল দেশ। এক্ষেত্রে জাপান, বার্মা, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশও বৌদ্ধবাদের আদর্শে পরিচালিত হলেও অর্থনৈতিকভাবে পুঁজিবাদ দিয়ে পরিচালিত। অন্যদিকে জীবনাদর্শ হিসেবে আরো একটি মতবাদ দ্বারা পৃথিবীর মানুষ পরিচালিত হয়। ইসলাম– সে জীবনাদর্শের নাম। যা গোটা বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রসংশিত এবং আদৃত। এই জীবনাদর্শের অনুসারী পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তা বেড়েই চলেছে। এই জীবনাদর্শের উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআন অবতীর্ণ একটি কিতাব। যার প্রতিটি ছত্র মানবজাতির জন্য গোটা মানবজাতির মালিক এবং প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার। আর সুন্নাহ হলো মানবজাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধি রাসূল [সা] কর্তৃক কুরআনের প্রায়োগিক দৃষ্টান্তের সংকলন। মানবজাতির মালিক আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের ওপর যে কিতাব, আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তার ভিত্তি গোটা বিশ্বকেন্দ্রিক, স্থানিক বা আরবকেন্দ্রিক নয় এবং তাঁর মনোনীত রাসূলও গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ রাসূল অর্থাৎ তিনি শুধু আরবের নন, গোটা মানবজাতির জন্যই রাসূল। তাই ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ গোটা মানবজাতির জন্য একমাত্র মনোনীত মতবাদ বা জীবনাদর্শ হচ্ছে ইসলাম। এই জীবনাদর্শের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর নিজস্ব অর্থনৈতিক মতবাদ। তাই ইসলামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে অর্থনৈতিক আদর্শের জন্য অন্য কোনো আদর্শ ধার করার প্রয়োজন নেই, যেমন অন্যান্য জীবনাদর্শ বা মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ফ্যাসীবাদী হিটলারের অর্থনৈতিক মতবাদ ছিল পুঁজিবাদ। বৌদ্ধবাদের আদর্শে পরিচালিত দেশের অর্থনৈতিক মতবাদ হলো পুঁজিবাদ। ব্রাহ্মণ্যবাদের আদর্শে পরিচালিত ভারতের অর্থনৈতিক মতবাদ হলো পুঁজিবাদ। আর এজন্যই ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ বলা হয় অর্থাৎ ইসলামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করলে তার আর অন্য কোনো আদর্শ ধার নেয়ার প্রয়োজন নেই। বলছিলাম, ইসলামের রয়েছে নিজস্ব অর্থনৈতিক মতবাদ। যে মতবাদের মূল চেতনা হলো "ব্যবসা বৈধ এবং সুদ অবৈধ" [সূরা বাকারা : ২৭৫]। এভাবে অর্থনীতিকে বায়বীয় সম্পদ বা ভার্চুয়্যাল সম্পদের মরীচিকা মুক্ত করে বাস্তব সম্পদের ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে ইসলাম এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে আকাশ থেকে নামিয়ে ভূমির সমান্তরাল করেছে। সুদের হিসাবের মারপ্যাচে অপরের সম্পদকে নিজের সম্পদে পরিণত করার ধূর্তামীকে নিষিদ্ধ করে বিশ্বের সাধারণ মানুষকে ধনীদের লালসার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। আর এজন্যই বিশ্বের ধনীদের এক বিশাল অংশ ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষক না হয়ে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদের নিবিড় পৃষ্ঠপোষক।

www.pathagar.com

কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবীটা বিশ্বাস ও মতবাদ নির্বিশেষে গোটা মানবজাতির বসবাসের জন্যই নির্ধারিত। অর্থাৎ কাফের, মুশরিক, মুমিন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুনাফিক সকলেরই আবাস হলো পৃথিবী। বিষয়টি আল্লাহ কুরআনে এভাবে সুস্পষ্ট করলেন– আল্লাহ বলেন, 'স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে নিরাপদ শহর করুন, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান করুন।' তিনি বললেন, যে কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবন উপভোগ করতে দিব, অতঃপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। সূরা বাকারা : ১২৬]

আল্লাহ আরো বলেন, "কিন্তু শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করলো। আমি বললাম, 'তোমরা একে অপরের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।' যারা ঈমান প্রত্যাখ্যান করবে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। " [সূরা বাকারা : ৩৬ ও ৩৯]

আদর্শ ও বিশ্বাস পছন্দ করার অধিকারে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে ইসলাম। ["দ্বীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। সূরা বাকারা : ২৫৬"]। কিন্তু কোন্‌টি জীবনের প্রকৃত সত্য? কোন্‌টি মরীচিকা নয়, প্রকৃত কল্যাণময়; এসব বিষয় সুস্পষ্ট করেছে কুরআন। যাতে সত্যান্বেষী মানুষ সত্যকে খুঁজে পেতে পারে সহজেই। [কুরআন নাযিল হয়েছে, যাতে মানবজাতির জন্য রয়েছে দিশারি এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য। সূরা বাকারা : ১৮৫] কুরআনের এসব বিষয়ে বক্তব্য বা মানবজাতির কাছে আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যের আবেদন বিশ্বকেন্দ্রিক, কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান কেন্দ্রিক নয়। গ্লোবাল ভিলেজ–এ ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত বর্তমান বিশ্বে তাই ইসলামী জীবনাদর্শ এখন এক আকাঙ্খিত চেতনার নাম। "আমি মানুষকে তৈরি করেছি এবং তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছি [সূরা আর-রাহমান : ২-৩]" আল্লাহর এ কথাগুলো গ্লোবালী সকল বর্ণের মানুষ এবং তাদের মনের ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে সরলভাবেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়াসহ গোটা বিশ্বের সকল মানুষ যেমন তার সৃষ্টি তেমনি তাদের ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। তাই ইসলামী জীবনাদর্শ এখন এক গ্লোবাল জীবনাদর্শ। ক্ষমতা কিংবা অর্থের কুপ্রভাবে বিকৃত মনের মানুষ ছাড়া এই সত্যকে কেউ অস্বীকার করে না।

সত্যান্বেষণ মানুষের এক সহজাত স্বভাব

ক্ষমতা কিংবা অর্থের কুপ্রভাবে বিকৃত মনের মানুষ কখনোই সত্যকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না। ক্ষমতার কুপ্রভাবে বিকৃত মনের মানুষ আবু জাহেল, ফিরাউন, নমরূদ তাই করুণ পরিণতিকে বরণ করেছেন কিন্তু কখনোই সত্যকে স্বীকার করেননি। অন্যদিকে অর্থের কুপ্রভাবে বিকৃত মনের মানুষ ছিলেন সাদ্দাদ এবং কারূন। সাদ্দাদ দম্ভভরে পৃথিবীর বুকে বেহেশ্‌ত তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাতে প্রবেশ করার সুযোগ তার হয়নি। 'লাল ঘোড়া দাবড়াইয়া দিমু'–এ দেশের এমন দম্ভোক্তিকারী রাজনৈতিক সাদ্দাদ ক্ষমতার বেহেশ্‌ত তৈরি করেছিলেন কিন্তু তা উপভোগ করার সুযোগ হয়নি। আর কারূন? হ্যাঁ, কারূনের বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

www.pathagar.com

"আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, 'দম্ভ করোনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর এবং ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে তুমি উপেক্ষা করো না। তুমি সদয় হও, যেমন আল্লাহ তোমার ওপর সদয়। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।

সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানতো না আল্লাহ তার পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন যারা তার চেয়েও শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল সমৃদ্ধ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।' কারুন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমকের সাথে উপস্থিত হয়েছিল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বলল, 'আহা! কারুনকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি তেমনি দেয়া হতো! সত্যিই সে বড় ভাগ্যবান।' আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক তোমাদের, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ছাড়া কেউ তা পাবে না।' তারপর আমি কারুনকে এবং তার প্রাসাদকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারতো। আর সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারেনি। আগের দিন যারা তার মতো হতে চেয়েছিল তারা বলতে লাগলো, 'দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বাড়ান এবং যার জন্য ইচ্ছা কমান। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। দেখলে তো! অবিশ্বাসীরা [আল্লাহর ওপর আস্থাহীনরা] সফল হয় না।' [সূরা কাসাস : ৭৬-৮২]"

যুগে যুগে এসব বিকৃত মনের মানুষগুলো পৃথিবীতে শুধুই ক্ষমতা কিংবা অর্থ-সম্পদ কুক্ষিগত করার আসক্তিতে নেশাগ্রস্ত মানুষের মতো আচরণ করে। আর এ জন্য যতটা নিষ্ঠুর হওয়া যায় ততটাই নিষ্ঠুর ও নির্মমতার আশ্রয় নেন। এখনও যারা এ বিকৃত মানসিকতায় আক্রান্ত তাদের ভাষায় এ নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতার প্রকাশ ঘটে– "যতটা কঠোর হওয়া প্রয়োজন, ততটাই কঠোর হবো" কিংবা "ক্ষমতায় থাকলে আয় বাড়ে এটাই পৃথিবীর নিয়ম" এমন মন্তব্য আমরা আমাদের ধারে কাছের সেসব মানুষ থেকে শুনি। তাদের এসব নির্মমতা সাধারণ মানুষকে নরক যন্ত্রণায় পীড়িত করে। মানুষ নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যের সে সব অস্বীকারকারীরা, আল্লাহর প্রতি আস্থাহীনতার সনদধারীরা তাদের করুণ পরিণতিকে এড়াতে পারে না। আর পারে না বলেই নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়নের পরও মানুষের সত্যান্বেষণের সহজাত স্বভাবটি এখনও অটুট আছে।

মুহাম্মাদ [সা সত্যের নির্ভীক ও বিনীত প্রচারক এবং আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন

কোনো নির্যাতন ও নিপীড়নই সত্যনিষ্ঠ মানুষের সত্যের প্রতি অবিচল আস্থাকে পরাজিত করতে পারে না। মানবজাতির মালিকের পক্ষ থেকে মনোনীত ["আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। 'সূরা সাবা : ২৮']" রাসূলও ছিলেন শত নির্যাতন ও নিপীড়নের মুখে অবিচল, অপরাজিত। কোনো নির্যাতনই পরাজিত করতে পারেনি মুহাম্মাদ [সা]-কে। পারেনি তাঁর একান্ত

www.pathagar.com

অনুসারীদেরকে। পারেনি মূসা [আ]-কে। পারেনি তাঁর একান্ত অনুসারীদেরকে। জাতিকে 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির মাধ্যমে বিভক্ত করে শাসন করার দৃষ্টান্ত স্থাপনকারীদের অগ্রদূত, নিজ দেশের নাগরিকদের মাঝে স্বৈরাচারী এবং নির্বিচারে দেশের নাগরিক হত্যাকারী ফিরাউনের সামনেই সত্যের উন্মোচনে সাড়া দিলেন সমবেত সব জাদুকররা। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হলো, ফিরাউন যখন তাদের শুলে চড়ানোর এবং এরকম আরো কঠিন কঠিন সব শাস্তির ঘোষণা দিচ্ছিল তখন তাদের সত্যের প্রতি অবিচলতা যেন বৃদ্ধিই পাচ্ছিল কেবল।

কুরআনে সেসব অকুতোভয় বিশ্বাসীদের কথা আল্লাহ তুলে ধরে বললেন, "অতঃপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হলো এবং বললো, 'আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। ফিরাউন বললো, 'কী, আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! এখনতো দেখতে পাচ্ছি সেই তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হাত-পা উল্টো দিক দিয়ে কেটে ফেলবো এবং আমি তোমাদের খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবোই এবং তোমরা অবশ্যই জানবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।' তারা বলল 'আমাদের কাছে সত্যের যে সুস্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপর তোমাকে আমরা কিছুতেই মর্যাদা দিব না। সুতরাং তুমি যা চাও করতে পারো। তুমি তো কেবল দুনিয়ার এই জীবনেই আমাদের ওপর খবরদারী করতে সক্ষম। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছো তা। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী।' [সূরা ত্ব-হা : ৭০-৭৩]"

সত্যকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে কি পরিমাণ সাহসিকতা, দৃঢ়তা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন তাই-ই উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত দিয়ে তুলে ধরলেন। আর রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দৃঢ়তা ছিলো কুরআনের বাস্তব প্রতিফলন। কিন্তু দৃঢ়তা তাঁর সংবেদনশীল মনকে কখনো নির্মমতায় আচ্ছন্ন করেনি। এ বিষয়টিও আল্লাহ তায়ালা তুলে ধরলেন এভাবে, "ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনের দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। [সূরা শুয়ারা; ২৬ : ০৩]" এতটা দরদী মন এবং সত্যের প্রতি অবিচলতা দিয়ে যে মানুষটিকে আল্লাহ- মানবজাতিকে সত্যের দিকে আহ্বানের জন্য মনোনীত করলেন– আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি। [সূরা ফুরকান : ৫৬] আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি– [সূরা আম্বিয়া : ১০৭] এবং মানুষকে সকল সৃষ্টির মাঝে অতুলনীয় মর্যাদা দিলেন [আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। [সূরা বনী ইসরাঈল; ১৭:৭০] মানুষকে জানালেন চোখের অন্তরালের অদৃশ্য জীবনের সত্যগুলোকে [কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে– [সূরা যিলযাল : ৭-৮], সময় দিলেন মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সাজিয়ে নেয়ার [আমি যখন কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করি প্রকৃতিগতভাবে তার অবনতি ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝে না? [সূরা ইয়াসিন : ৬৮], তিনিই যে আসমান-জমিনের সবকিছুর সার্বভৌমত্বের অধিকারী–এ সত্য অস্বীকারীকে নিজ দায়িত্বে জাহান্নামকে বেছে নেয়ার সময় দিলেন, যেমনটি বেছে নিয়েছে ইবলিশ, সতর্ক করলেন মানবজাতিকে মানবজাতির অদৃশ্য অথচ প্রকাশ্য শত্রুকে চিহ্নিত করে

www.pathagar.com

[হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়। [সূরা বাকারা : ১৬৮-১৬৯] এভাবে তিনি কি মানবজাতির প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ ভালোবাসারই প্রতিফলন ঘটালেন না? [তোমার প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু ওদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন রহস্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। [সূরা নমল; ২৭ : ৭৩-৭৫]

কিন্তু এখন এদেশে তথাকথিত ৯০% মুসলিমের দেশে আমাদের অবস্থা হয়েছে রাসূল [সা]-এর সেই আর্তির মতো, যেখানে তিনি আল্লাহকে বলেছিলেন, "আর রাসূল বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে। আল্লাহ বললেন, এভাবেই আমি দুষ্কৃতকারীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম। পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার প্রতিপালকই তোমার জন্য যথেষ্ট।' [সূরা ফুরকান : ৩০-৩১] এরা অনেকেই নিজেদেরকে ফিরআউনের মতো খোদার আসনে বসিয়ে নিয়ে নিজেদের মতো হালাল-হারাম ঘোষণা করছে। শিশুদের শেখানো হচ্ছে, দেবতার নামে জবেহ করা প্রাণী হালাল। অথচ আল্লাহ বলছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদের আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যার ওপর আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারা : ১৭২-১৭৩]'

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, আখিরাতের ওপর দৃঢ় ঈমানের অধিকারীদের আল্লাহর সাহায্য আসা পর্যন্ত ধৈর্যের পথ পাড়ি দিয়ে এই নব্য দুস্কৃতিকারীদের মোকাবেলা করে যেতে হবে। আর মনে রাখতে হবে আল্লাহ তায়ালার সেই কথাগুলো :

"১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন-তার মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। তিনিই আল্লাহ–আমার প্রতিপালক; তাঁরই নিকট আমি নির্ভর করি আর তাঁরই অভিমুখী আমি। ১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তাদের জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশবিস্তার করেন; কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। তিনি যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ১৩. তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি অহি করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ করো না।" [সূরা শূরা : ১০-১৩]

www.pathagar.com

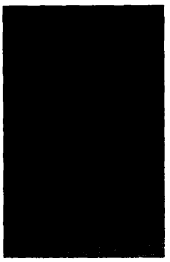

মানবজাতির দিকদর্শন

শহিদুল ইসলাম

আল্লাহ্ তিনিই মহাপ্রকৌশলী যিনি বুদ্ধিবৃত্তি, জীববৃত্তি এবং বস্তুর (rationality, animality and matter)-এর সমন্বয় ঘটিয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠ অবয়ব দান করেছেন। তিনি মানুষকে চিন্তাশক্তি এবং আবিষ্কার করার ক্ষমতা দিয়ে তাঁর নিজের চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। গোটা ইউনির্ভাসের ভেতর অস্তিত্বশীল মানব সত্তাই একমাত্র সৃষ্টির রহস্য জানতে পারে যা চাক্ষুমান ব্যক্তিদের নিকট সহজ। পরীক্ষার ক্ষেত্র এই দুনিয়ায় যুগে যুগে এই মানবজাতি প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা করে জীববৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে আলোর পথ ছেড়ে অন্ধকার পথে ধ্বংসের দিকে চলেছে। এই পথ হারা মানুষের আলোর দিশারিস্বরূপ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে প্রতিনিধি এবং দিক-নির্দেশনা। নবুওয়তের ক্রমধারায় সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ করে যাকে পাঠানো হয়েছে তিনি হলেন রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ [সা]। তিনি মানবজাতির শোষণ, নিপীড়ন ও শিরক থেকে এবং ইহ ও পরকাল মুক্তির পয়গম নিয়ে এসেছেন তিনি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল জ্ঞান মানুষকে একটার পর একটা শিখাইছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষণীয়। তিনি ঘোষণা করেন নিজের নবুওয়তের কথা, আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্ববাদের কথা। তিনি বলেছেন আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, চিরঞ্জীব, তিনি সবকিছু করতে পারেন। কবর, হাশর, কিয়ামত হবে। পৃথিবীসহ গোটা সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। একমাত্র পরাক্রমশীল আল্লাহ্ তায়ালার অস্তিত্ব টিকে থাকবে। জাহান্নাম, জান্নাত মানুষের কর্মফল অনুসারে নির্ধারিত হবে। এমন এমন কঠিন সত্য তথা তিনি প্রচার করেছেন যা বিশ্বাসীরাই একমাত্র বিশ্বাস করতে পারেন। তবে এ বিশ্বাস লৌকিক বিশ্বাস নয়। নবুওয়তের আলামত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে তিনি কালজয়ী, সুসামঞ্জস্য মতামতই শুধু দেননি বরং যা সমাজে বাস্তবায়ন করে গেছেন। তিনি বলেছেন আমার যুগ হলো শ্রেষ্ঠ যুগ আমার জাতি হলো শ্রেষ্ঠ জাতি। তাছাড়া আল্লাহ্ বলেন– "আমি তোমাদের ওপর আমার রহমতকে পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।" অনেকের মনে ধারণা আছে ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আসলে ইসলাম গতানুগতিক কোনো ধর্ম নয়। ধর্ম বলার সাথে সাথে সংকীর্ণ মনোভাব এসে যাচ্ছে। বিশেষ করে ধর্মের সংজ্ঞা নিয়ে ধর্ম-দার্শনিক, ভূ-বিজ্ঞানী এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা ধুয়া তুলে ঘোলাটে করে ফেলেছেন। শ্রেষ্ঠ বলার সাথে সাথে প্রশ্ন

www.pathagar.com

জাগছে আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ কিছু না গ্রহণ করে তার নিচেরটা গ্রহণ করি তাহলে মন্দ কিসে। সুতরাং ইসলামের বিকল্প কিছু পথ খোঁজার চেষ্টা করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম যা মুহাম্মাদ [সা] আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছেন। সুতরাং বিজ্ঞানী সাহেব, দার্শনিক সাহেব, সাহিত্যিক সাহেব আপনি যত বড় আবিষ্কার এবং শিল্পকর্ম দেখান না কেন জীবনটা কোন পথে প্রবাহিত করবেন যা শিক্ষার বিষয়। কারণ যারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধানকে অস্বীকার করবে এবং মানুষের তৈরি করা মতামতকে গ্রহণ করবে তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হবে। পৃথিবীর বুকে অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে ঐশী তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে আল্লাহর প্রদত্ত সীমারেখাকে লঙ্ঘন করেছে। তারা নিজেদের চিনতে ব্যর্থ হয়ে নিছক প্রকৃতির জীব এবং যন্ত্র হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। মৃত্যুর পর মাটির সাথে মিশে যাবে অথবা বিনষ্ট হবে এই চিন্তায় পরকালকে অস্বীকার করেছে। অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ কোনো অতিন্দ্রীয় সত্তার অস্তিত্বকে তারা অস্বীকার করেছে। মোট কথা এই ধরনের মনোভাব যারা পোষণ করেন তাদেরকে কুরানের ভাষায় কাফির বলা হয়। আর এদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা। এই যে কঠিন জ্ঞান রাসূল শিক্ষা দিলেন এটা কি শুধুমাত্র বিশ্বাসের ব্যাপার না মানুষের পক্ষে বিষয়টি বোঝা সম্ভব। পবিত্র কুরআনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সে এটা এমন একখানি কিতাব যার ভেতর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।" যাদের জ্ঞান আছে এবং যারা চক্ষুষ্মান তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর এই বিশ্বাস কোনো লৌকিক বিশ্বাস কিনা প্রমাণের প্রয়োজন না থাকলেও মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞান দর্শন যতটুকু জানতে পেরেছে তার ভিত্তিতে কিছু তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হলো :

মানুষ জগতে কোনো স্বর্গীয় অবতার নয় আবার পশুও নয়। ভব যন্ত্রণা তাকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে চলেছে। ভোগ লালসা তাকে বিভিন্ন অমানবিক কাজে নামিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মানুষের ভেতর অন্যায় এবং শৃঙ্খলাহীনতা অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বুকে সব অন্যায় এবং কৃতকর্মের সঠিক মূল্যায়ন এবং বিচার পাওয়া অসম্ভব। তাই এমন একটা স্থান থাকতে হবে সেখানে চূড়ান্তভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার পাওয়া সম্ভব হয় এবং কৃতকর্মের সঠিক মূল্যায়ন হয়। আল্লাহ একমাত্র Absolute Justice তিনি একমাত্র সবকিছু চূড়ান্ত ফয়সালাহকারী। যুক্তি অনুসারে আমরা বলতে পারি যে এ জগৎ দ্বান্দিক প্রক্রিয়ায় (Dialectical method) অনুসারে বিকাশমান। এখানে প্রতিটি বিষয় বা বস্তুর বিপরীত অবস্থা বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ঠাণ্ডা-গরম, ডান-বাম, আলো-অন্ধকার, নিকট-দূর, উঁচু-নিচু, উত্তর-দক্ষিণ, সাদা-কালো, নর-নারী, জীব-জড়, ভেতর-বাহির এমন কি বস্তুর কণিকায় কণিকায় এটা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– quark-anti-quark, matter-anti-matter, election-anti-election প্রভৃতি। বর্তমান physics প্রমাণ করেছে যে জগতের ভেতর এমন কোনো বিষয় বা বস্তু নেই যার বৈপরীত্য নেই। এ ব্যাপারে মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেল হকিংস, আইনস্টাইন একমত। তাহলে আমরা বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে বলতে পারি যে বস্তু থাকবে আধ্যাত্ম্য থাকবে। আর যা আছে তাই নেই অর্থাৎ Nothing is Existence and Existences is Nothing. তাছাড়া আমরা যে অভিজ্ঞতা লব্ধ পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রতিনিয়ত আলোকন করছি স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একালের বিপরীতটা কী?

Logic অনুসারে–

www.pathagar.com

এইকাল থাকলে তার বিপরীত পরকাল থাকবে। এইকাল আছে। অতএব পরকাল আছে। বর্তমান গাণিতিক যুক্তি (Mathematical Logic) ব্যবহার করে উপরিউক্ত যুক্তিটি বলতে পারি–

$$P \supset q$$
$$p$$
$$\therefore q$$

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস কোনো অন্ধ অনুসরণ নয়। ইহা যুক্তিবুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-দর্শনসম্মত চেতনার প্রতিফলন; যা রিসালতের মাধ্যমে মানুষকে জানানো হয়েছে। আজকের জগতের পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা পরম সত্তা (Absolute being) বা স্রষ্টা নিয়ে হাসি-তামাশা শুরু করেছে। তাদের অনেকে বলা শুরু করেছে– "The word God in the dictionary is nonsensical, Where there is no mathematics and logic only believe throw it into dustbin." স্রষ্টা সম্পর্কে এমন মন্তব্য তারা Sense থাকতে চাচ্ছে কিনা বিশ্লেষণ করে দেখার দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে নিজেদের পরিচয় নিজেরা যেভাবে দিয়েছে দেখা যায় ঠিক সেভাবে তাদের বিশ্বাস আচরণ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তারা মানবদেহের ভেতর জড়, বস্তু হিসেবে আত্মার অস্তিত্ব না পেয়ে আত্মাকে অস্বীকার করেছে। আত্মার পরিবর্তে মন এবং পরবর্তীতে আচরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু Psychology যে বিষয় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সেটা কতটুকু যুক্তি যুক্ত সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা জরুরি। কারণ রূহ বা আত্মা কোনো জড় বস্তু নয়। আত্মা বা রূহ হলো আল্লাহ্‌র হুকুম। যতদিন পর্যন্ত বান্দার ওপর আল্লাহ্‌র হুকুম থাকে ততদিন রূহ বা আত্মা বিরাজ করে এবং মানুষকে জীবিত থেকে কর্মক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। মানবদেহের সমস্ত শক্তি এবং কর্মক্রিয়ার উৎস হলো আত্মিক শক্তি বা প্রাণ। এটা বাদ দিয়ে নিছক যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করা হাস্যকর। কারণ সাধনা, কল্পনা, নন্দনতত্ত্ব, মানবতা যন্ত্রের থাকে না কিন্তু মানুষের ভেতর এটা বিরাজমান। স্রষ্টাকে চিনতে হলে তাঁর সৃষ্টিকে জানার দরকার। যে নিজকে চিনতে পেরেছে সে তাঁর স্রষ্টাকে চিনতে পেরেছে। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের শ্রেষ্ঠ উক্তি– Know Thyself সূত্র মতে Cognise psycho being অর্থাৎ আত্মাকে চিনতে পারলে সে তার স্রষ্টাকে চিনতে পারবে। আমরা বাস্তব জগতে তাই দেখতে পাই। মহাশক্তিধর রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌কে বস্তু দ্বারা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষ করা অবাস্তব। Mathematician বা গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বৈধতা Validity কে সত্যতা এর মধ্যে আনয়ন করার এবং তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার এক গোপন সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কার করেছে; যা বিভ্রান্তিকর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অভিজ্ঞতার এ বিচার বুদ্ধির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে স্রষ্টাকে জানা অসম্ভব। কিন্তু প্রজ্ঞা বা স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা সম্ভব যা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট সহজ। স্রষ্টা চিরঞ্জীব এবং শাশ্বত। physics প্রমাণ করেছে যে যার সৃষ্টি আছে তার ধ্বংস আছে। যার সৃষ্টি নেই তার ধ্বংস নেই। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ভেতর পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন– "তিনি কোথাও হতে জন্ম নেননি আবার কাউকে জন্ম দেননি।" তাহলে স্রষ্টা যে শাশ্বত একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ তিনি সৃষ্ট নন অথচ অস্তিত্বশীল। আসলে–

www.pathagar.com

"Islam is the satisfective answer of all absolute issues and every word in it is philosophycal." এখানেই মানবজীবনের চরম সত্যের যুক্তি বুদ্ধির মাধ্যমে মুক্তি যা মানবজীবন এবং সমাজ ও সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল্লাহ জগৎ সৃষ্টির পর মানুষ সৃষ্টি করেছেন। নবুওয়ত জীবন চলার জন্য পথ প্রদর্শক নির্বাচন করেছেন, নবুওয়ত চেয়ে পাওয়া যায় না। নবুওয়ত দাবি করে হয় না। নবুওয়ত আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানবজাতির আলোর দিশারি হিসেবে যাদের দুনিয়ার আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বীনী দাওয়াত দিয়েছেন। কোনো পয়গম্বর যন্ত্র কীভাবে চালাতে হয় এর জন্য আসেনি। তাঁরা আসছে মানুষের জীবন কীভাবে চলবে। মানুষ কীভাবে শান্তি পাবে। মানুষ কীভাবে সত্য পথ পেয়ে মুক্তি পাবে। মানুষের মুক্তিই ছিলো তাঁদের জীবনের একমাত্র কামনা। তাঁরা এহকালীন সমস্ত প্রকার অশান্তি ও জটিলতা থেকে মুক্তি এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার শিক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। মানুষ যা করে তার জন্য উপদেশ দেওয়ার দরকার নেই। যা মানুষ করে না এবং যা মানবসমাজ ও সভ্যতার জন্য প্রয়োজন তার জন্য নৈতিক হিত উপদেশ বিদ্যমান। আদি পিতা আদম [আ] থেকে শুরু করে বর্তমান সভ্যতার সকল স্তরে নৈতিকতার শিক্ষা প্রয়োজন আছে। মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে নীতির প্রশ্নে অটুট থাকতে হবে। আজ সভ্যতার এই জটিল অবস্থায় নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্র কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। সভ্যতার দ্বন্দ্বে মানবসমাজ আজ অসহায়। আজ এমন এমন মারণাস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে যার বোটমে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে মুহূর্তে এক শহরের মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করা সম্ভব। কম্পিউটার তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে যে আমেরিকার একজন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাবিশারদ Ray Kurjwell বলেছেন ২০৯৯ সালের দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে স্মৃতি শক্তির কয়েক কোটি গুণ বেশি স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হবে। আবিষ্কৃত এই সমস্ত মারণাস্ত্র এবং যন্ত্রের সাথে মানুষের আচরণ কেমন হবে তা জানতে আজ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। পৃথিবীতে বিভিন্ন মতাদর্শ আছে। কিন্তু মানব রচিত মতামত পৃথিবীতে শান্তি দিতে পারে না। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন চলার গাইড লাইন দিয়েছেন। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী মুহাম্মাদ [সা] বিদায় হজের ভাষণ দিতে যেয়ে একপর্যায়ে বলেছেন– "আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি ১. পবিত্র কুরআন ২. আমার সুন্নাহ। যতদিন তোমরা এ দু'টি জিনিস আঁকড়ে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।"

সভ্যতার বিচারে মানুষের ব্যক্তি জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন তার মূল্যায়ন করা হবে ব্যক্তি হিসেবে। পরকালে মানুষকে বিচার করা হবে এই ব্যক্তির কর্মক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং ব্যক্তি চরিত্র কেমন হবে। কেমন হবে তার আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, প্রথা, বিশ্বাস? মানুষ যদি সত্যের পথ ছেড়ে মিথ্যার পথ অবলম্বন করে, তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সত্য সরল সহজ, যেখানে সকল সৌন্দর্য ও মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে। নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলেছেন– "কোনো কিছু করার পর যা ভালো মনে হয় তাই অনৈতিকতা।" মানুষের বিবেক হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কারাগার। বিবেকের শাসন যদি থাকত তাহলে অন্যের আত্মার আর্তনাত নিজের আত্মার মনে হতো তখন মানবসমাজের দশা এমন

www.pathagar.com

হতো না। ধর্মের সাথে নৈতিকতার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। অধ্যাপক বেঞ্জামিন কিড ও সি এম লিউউস বলেন- "Religion and morality go together and that morality without religion has no solid foundation" ইসলাম কোন আচরণসর্বস্ব অলৌকিক জীবনব্যবস্থা নয়। বরং পরকালের জ্ঞান ও অলৌকিক জ্ঞান তার জীবন ব্যবস্থাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত করার একটা চূড়ান্ত সুযোগ ও ভিত্তিস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে ও হাদিস শরীফের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের সতর্কতা ও নির্দেশনাবলি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর না। আর জেনেশুনে সত্য গোপন কর না।" - [সূরা বাকারা, আয়াত : ২৪]

"তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং দেখ যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পরিণতি।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৭]

পবিত্র হাদিসে উল্লেখ আছে- "তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যার আচার আচরণ- উত্তম।" অন্যত্র বলা হয়েছে- "বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যিনি নৈতিক দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" নবীকে পাঠানো হয়েছে সু-সংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। আজ চারদিকে চলছে বর্বরোচিত হত্যা, গুম, বোমা হামলা, হানাহানি, নির্যাতন, সন্ত্রাস, খুন-খারাপী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার জগৎবাসীকে হতভম্ব করে ফেলেছে। হিরোশীমা ও নাগাসাকিতে কালের অভিশাপ নিয়ে আজও দুই একজন বেঁচে আছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন পারমাণবিক যন্ত্রের ধ্বংসলীলা দেখে আফসোস করে বলেন- "হায়! এ রকম একজন বিজ্ঞানী হয়ে বিশ্বের ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করার কারণ না হয়ে যদি ঈশ্বর আমাকে অশিক্ষিত মুচি অথবা মেথর করে সৃষ্টি করতেন!"

হিরোশীমা ও নাগাসাকির দুঃখজনক ঘটনার পর আইনস্টাইন যখন তাঁর ঐতিহাসিক চিঠির জন্যে সমালোচিত হন তখন তিনি দুঃখ ও ক্ষোভে বলেছিলেন- "যদি কাউকে এর জন্য দায়ী করা হয় তবে তা বিজ্ঞান নয় রাজনীতি। বিজ্ঞানীরা রাজনীতি বোঝে না। আর এই রাজনীতি কি ধর্ম ছাড়া হবে। ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হলে তার অবস্থা কী হবে এ ব্যাপারে কবি সম্রাট আল্লামা ইকবাল বলেন- "ধর্ম থেকে রাজনীতিকে যদি পৃথক করা হয় তাহলে কেবল বর্বরতাই অবশিষ্ট থাকে।"

আজ খাদ্যে বিষক্রিয়া এবং অপচয়, সমুদ্র গর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, সেক্স ইন্ডাস্ট্রি ও ট্রেড, মহাকালে স্টেশন, রোবটের প্রার্থনা, নেপনিং, ভ্রুণ হত্যা, কৃত্রিম হৃদপিণ্ড ও রক্ত ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও ভাগাভাগি, মৃত্যুদণ্ড, আত্মহত্যা, মরণব্যাধি, জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে চিন্তার দ্বন্দ্ব, জাগতিক এবং মহাজাগতিক নানা সমস্যা আজ মানুষকে জটিল সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে। মানুষের জীবনের এমন কোনো অন্ধকার নেই যে কুরআন-হাদিসের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়নি। যদি বর্তমান সভ্যতার সমস্যা সমাধানে পবিত্র কুরআন-হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকে আল্লাহর রাসূল [সা]-এর হাদিসে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। যখন মা'আজ ইয়েমেনে গভর্নর নিযুক্ত হন; রাসূল [সা] তাঁকে প্রশ্ন করেন- "তুমি কীভাবে তোমার সামনে উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করবে? মা'আজ উত্তর দিলেন- "আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা মীমাংসা করবো।" রাসূল [সা] আবার প্রশ্ন করেন- "যদি আল্লাহর কিতাবে তার কোনো নির্দেশ

www.pathagar.com

না পাও? মা'আজ উত্তর দিলেন– আল্লাহর রাসূল [সা]-এর উদাহরণের অনুসরণ করবো। রাসূল [সা] আবার তাঁকে প্রশ্ন করেন যদি আল্লাহর রাসূলের জীবন থেকে কোনো উদাহরণ না পাও। তার উত্তরে মা'আজ বলেন– তাহলে আমি আমার বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করবো। রাসূল [সা] তাঁর এ উত্তরে বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বিশ্ব সমাজ আজ অশান্তির বিভীষিকায় দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত। শান্তির অন্বেষায় ছুটে চলছে। কিন্তু কোন পথে আসবে শান্তি তা নিয়ে চিন্তাবিদরা বিভিন্ন দর্শন প্রচার করেছেন। আমেরিকার হাতে এত সম্পদ, এত মারণাস্ত্র আছে যার দ্বারা তারা পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু তাদের ভেতর শান্তি আছে কী? সভ্যতার দ্বন্দ্বে মানবসমাজ আজ অস্থির। যেখানে ভোগের পিয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায় তাদের তো শান্তিতে থাকার কথা। বাংলাদেশের ৮৮% মুসলমান। এ জাতির ভেতর শিক্ষার অনগ্রসরতা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। তবুও আমরা শান্তি প্রিয়। তবে পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তিনিই একমাত্র গাইড লাইন দিতে পারেন। মহান আল্লাহ পাক কালামে এরশাদ করেন– "তিনি তাকে কি বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। তারপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। তারপর তার চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন।" [সূরা আবাসা, আয়াত : ১৯-২০]

যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানবজাতির জন্য হিদায়েতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা কীভাবে মানবজাতি শান্তি পাবে এবং ইহকালে সমস্ত প্রকার অশান্তি থেকে মুক্তি এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তার শিক্ষা গোটা মানবজাতিকে উপহার দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। অন্য কোনো পথে অন্য কোনো মতাদর্শে মুক্তির কোনো নিশ্চয়তা ও সুযোগ নেই। আল্লামা ইকবাল যখন তাঁর কাব্য দর্শন দ্বারা আলোচিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন তখন ব্রিটিশ তাঁকে স্যার উপাধি দেন। এই সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ইকবালের কাব্য পড়ে নাক সিটকিয়ে বলেছিলেন যে, ইকবালের কাব্য থেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আসে। তাহলে ইসলাম কী সাম্প্রদায়িক! ইসলাম সম্প্রদায় নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা, দল নিয়ে দলাদলি, মত নিয়ে মাতামাতি, কাদা ছোড়াছুড়ি পছন্দ করে না, এখানে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে-সহ অবস্থান এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে– যে ব্যক্তি একজন মানুষকে বাঁচালো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো। যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিক হত্যা করলো। ইসলাম মধ্যপন্থী এবং উদারতাবাদের শিক্ষা দেয়, যার উদ্দেশ্য শান্তি স্থাপন।

জাগতিক ও পারলৌকিক দুই কাল নিয়ে মানবজীবন। দুই কালকে সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অপরাধীদের বিচার সঠিকভাবে করার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একদিকে বিচারকের, অন্য দিকে অপরাধীর যার যেমন প্রাপ্য তার ফয়সালাহ তেমনভাবে করা হয়েছে। বিভিন্ন পেশার লোকজন তার স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে সুনীতি ও দুর্নীতির ওপর পুরস্কৃত এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন এক ফকির দুনিয়ায় তার অসহায়ত্বকে উপেক্ষা করে সততার সাথে বেঁচে থেকে পরকালে যদি জান্নাত পায় তাহলে সে ভাগ্যবান হিসেবে চিহ্নিত হবে। আবার যদি কোনো প্রাচুর্যবান ব্যক্তি অপরাধের কারণে যদি জাহান্নাম পায় তাহলে মনে রাখতে হবে তার

www.pathagar.com

মতো হতভাগ্য লোক আর পৃথিবীতে নেই। দুই কাল হলো নগদ। এখানে বাকীর কোনো শিক্ষা নেই, সুযোগ ও নেই। ফার্সি কবি ওমর খৈয়াম বলেন– "নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতা শূন্য থাক।" তিনি বস্তুবাদী ছিলেন। কিন্তু ইসলামে বস্তুবাদের সাথে আধ্যাত্মিকতাবাদের মধ্যে সমন্বয় করে পূর্ণরূপ দেওয়া হয়েছে। যার ভেতর মানবতার মুক্তির কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরাধের বিচারের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক বলেন– "আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে দেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ কর তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।" [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ১৩,১৪]

ইসলামে সত্য সুন্দর ও শুভ এবং সাম্য মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক মানবাধিকারের যে সর্বাজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ ও জারি করা হয় তার সাথে ইসলামের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে দুই একটি যদি সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে মনে রাখতে হবে সেটা মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। জ্ঞানের সীমানা এত ব্যাপক যে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের জনক হলেও তাদের ভেতর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির উপস্থিতির কারণে বিশ্বাস চলে আসা খুবই সঙ্গত। তাই তো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যার কারণে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টানের মুখে শোনা যায়– মহাবিশ্বের বহুবিধ- লীলাখেলা থেকে একজন নিবেদিত প্রাণ বিজ্ঞান কর্মীকে, এটা মানতেই হবে যে অকল্পনীয় সেই শক্তি যা মানুষের বেয়ে সীমাহীনভাবে বড় এবং যার সামনে আমাদের নতজানু হতেই হবে।" মহাকালের কবির মুখে শোনা যায়– "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাঁচাও আপন সুর।" আসলে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে সে শুধু স্রষ্টাকে কল্পনাই করতে পারে। বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা তার সীমানার অতীত বলে এটাকে রহস্যময় মনে হয়। আর যদি কেউ অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি এবং স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তাদের সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান শতাব্দির সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেছে– "If you want to know one micro gram salt you need 1000 Russell's head."

এত ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য যদি এরকম মনে হয় তাহলে গোটা ইউনিভার্সের অবস্থা কী? অদৃশ্যের জ্ঞানের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাক কালামে ইরশাদ করেন– "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী পরন্ত তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান কারোও কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" [সূরা জিন, আয়াত : ২৬, ২৭]

মহান আল্লাহ যার শিক্ষক তাঁর তো জানতে কিছু বাকি থাকার কথা নয়। তাই তো তিনি মুহাম্মদ [সা] বলতে পারেন– "আমি হলাম জ্ঞানের শহর আর হযরত আলী হলো তার দরজা।" সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ ও মুক্তি সম্ভব নয়, মানুষ যত সত্য জ্ঞানের কাছে আসবে তত মুক্তির পথ সহজ হবে। বিশ্ব সমাজ যদি টিকে থাকতে চায় তাহলে আমাদের সত্য শিক্ষা তথা কুরআন ও হাদিসের জ্যোতি ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই বিশ্ব সমাজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে মানবতার শীর্ষে পৌছে যাবে।

www.pathagar.com

অতুলনীয় এক নেতার আবির্ভাব

মূল : ওয়াশিংটন আরভিং

তরজমা : হোসেন মাহমুদ

লোহিত সাগর, ফোরাত নদী, পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগর দ্বারা যে বিরাট উপদ্বীপ গঠিত তা আরব নামে পরিচিত। লিখিত ইতিহাসের শুরু থেকে সাত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ কাল পরিসরে এশিয়ার বাকি অংশ প্রকম্পিত করা এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার কেন্দ্র পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করা নানা ঘটনা সংঘটিত হলেও সেগুলো আরব উপদ্বীপে কোনো পরিবর্তন আনেনি বা প্রভাবও ফেলেনি। রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলোতে যখন উত্থান ও পতন সংঘটিত হয়েছে, প্রাচীন রাজবংশসমূহের যখন বিলুপ্তি ঘটেছে, বিভিন্ন দেশের সীমানা ও নাম যখন পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের অধিবাসীরা নির্মূলীকরণের শিকার হয়েছে বা বন্দিত্ব বরণ করেছে, তখন সীমান্ত এলাকাগুলোতে কিছু উত্থান-পতন সত্ত্বেও আরব দেশ তার মরুভূমির গভীরে নিজের আদিম চারিত্র্য ও স্বাধীনতা অটুট রেখেছে। উদ্ধত গ্রীবা আরবরা কারো বশ্যতা স্বীকার করেনি।

আরবরা তাদের দেশের ঐতিহ্যকে প্রাচীনত্বের সর্বোচ্চ সীমানায় স্থাপন করেছে। তারা বলে, মহাপ্লাবনের অব্যবহিত পর হযরত নূহের [আ] পুত্র শামের সন্তানরা এখানে বসতি স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে তারা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত হয় যাদের মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছিল আদ [Adites] ও সামুদ [Thamudites]। জানা যায়, এ প্রাচীন জনসম্প্রদায়গুলো তাদের পাপের শাস্তি পেয়ে পৃথিবী থেকে হয় নির্মূল হয়ে গেছে নয় জাতিগত পরিবর্তনের পরিণতিতে বিলীন হয়ে গেছে। ফলে তাদের সম্পর্কে প্রাচীন অস্পষ্ট বিবরণ ও পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত ছাড়া আর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। প্রাচ্য ইতিহাসে তাদের কখনো কখনো 'প্রাচীন আদি আরব' [Old primitive Arabians], 'হারানো জাতি' [The lost tribes] বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপদ্বীপের স্থায়ী জনগোষ্ঠীর নামকরণ হয়েছিল শামের চতুর্থ প্রজন্মের বংশধর কাহতান বা জোকতান-এর নামে। তার বংশধররা উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ ও লোহিত সাগর উপকূল বরাবর ছড়িয়ে পড়ে। তার এক পুত্র ইয়ারাব ইয়েমেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে তার নামে আরব ভূখণ্ডের নামকরণ করা হয়। সেখান থেকে আরবদের নাম ও দেশের নাম উদ্ভূত হয়েছে।

www.pathagar.com

তার আরেক পুত্র জুরহাম হেজাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার বংশধরগণ বহু প্রজন্ম ধরে সেখানে রাজত্ব করে। ইবরাহিম [আ] যখন হাজেরা [আ] ও তার পুত্র ইসমাইল [আ]-কে নির্বাসন দেন তখন এ লোকেরা তাঁদেরকে সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করে। পরে ইসমাইল [আ] জুরহামের বংশধর ক্ষমতাসীন নেতা মোদাদের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং এভাবে একজন আগন্তুক মূল আরব জনগোষ্ঠীতে যুক্ত হন। ইসমাইল [আ]-এর স্ত্রী বারোটি সন্তানের জন্ম দেন যারা সারাদেশের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে। তাদের বিপুলসংখ্যক বংশধর বারোটি গোত্রে বিভক্ত হয় এবং তারা জোকতানের আদি জনগোষ্ঠীকে বহিষ্কার, পরাজিত বা ধ্বংস করে।

উপদ্বীপের আরবগণ এভাবেই তাদের উৎস সম্পর্কে বর্ণনা করেছে এবং খ্রিস্টান লেখকরা একে ঈশ্বরের সাথে ইব্রাহিমের [আ] চুক্তি পূরণসংবলিত বলে উদ্ধৃত করে থাকে যেমনটি বাইবেলে বলা হয়েছে: "তখন আব্রাহাম ঈশ্বরকে বলল, "আশা করি ইশ্মায়েল বেঁচে থেকে আপনার সেবা করবে।... তুমি ইশ্মায়েলের কথা বলেছ এবং আমি সে কথা শুনেছি। আমি তাকে আশীর্বাদ করব। তার বহু সন্তান-সন্ততি হবে। সে বারো জন মহান নেতার [Twelve princes] পিতা হবে। তার পরিবার থেকে সৃষ্টি হবে এক মহান জাতির।" [আদি পুস্তক ১৭: ১৮,২০]

এ বারো জন নেতা ও তাদের গোত্রের ব্যাপারে বাইবেলে পুনরায় বলা হয়েছে এভাবে যে 'তারা হাবিলা থেকে মিসরের কাছে শুর [Shur] এবং সেখান থেকে আসিরিয়া [Assyriah] পর্যন্ত' বিস্তৃত দেশ অধিকার করেছিল যে অঞ্চলটিকে বরেণ্য ঐতিহাসিকরা আরবের অংশ বলে শনাক্ত করেছেন। তাদের সে বর্ণনা বর্তমানে কালের আরবদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের কিছু লোকের বাস ছিল শহর ও দুর্গে, কিছু বাস করত তাঁবুতে আর কিছু বাস করত মরুভূমির গ্রামগুলোতে। ইসমাইল [আ]-এর প্রথম দুই পুত্র নেবাইওস [Nebaioth] ও কাদের [Kedar] তাদের পশুপাল সম্পদ ও ভেড়ার চমৎকার পশমের কারণে এসব নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাত ছিলেন। নেবাইওসের পুত্র নাবাসাই [Nabathai] আরবের পাথুরে এলাকায় বাস করতেন, পক্ষান্তরে সমগ্র আরব জাতিকে সংজ্ঞায়িত করতে বাইবেলে মাঝে-মধ্যে কাদেরের নাম দেয়া হয়েছে। সামগীত রচয়িতা বলেন, "আমার দুঃখ যে আমি মেশেকে [Mesech] কিছুদিন ছিলাম, আমি কাদেরের তাঁবুতে বাস করেছিলাম।" মনে হয়, তারা উভয়েই মরুভূমিতে অবাধে বিচরণকারী যাযাবর বা পশুপালক আরবদের পূর্বপুরুষ ছিলেন। নবী জেরেমিয়াহ [Jeremiah] বলেন, "তারা সম্পদশালী জাতি যারা সতর্কতা অবলম্বন না করেই বাস করে, যাদের কোনো দরজা বা অর্গল নেই, যারা একাকী থাকে।"

প্রাচীনকালে "শহর ও দুর্গে বসবাসকারী" ও "তাঁবু বাসী" আরবদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। শহর ও এসব শহর ও দুর্গগুলো আঙ্গুর কুঞ্জ ও ফলের বাগান, তাল গাছের সারি, ফসলের মাঠ ও বিরাট পশুপাল বেষ্টিত ছিল। তারা ছিল নিজেদের অভ্যাসে অভ্যস্ত, নিজেদের নিয়োজিত করেছিল জমি চাষ ও পশুপালনে।

এ শ্রেণীর অন্যরা নিয়োজিত হয়েছিল বাণিজ্যে। তাদের বন্দর ও শহরগুলো ছিল লোহিত সাগর, উপদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলীয় সমুদ্র ও পারস্য উপসাগরের তীরে। তারা জাহাজ বা কাফেলাযোগে বিদেশ থেকে পণ্য আনত। এ রকমই বিশেষ ধরনের ছিল মসলা, সুগন্ধি ও ধূপ-ধুনার দেশ, কবিদের সাবিয়া, বাইবেলে উল্লিখিত শেবা ইয়েমেন বা সুখী আরবের

www.pathagar.com

[Arabia the happy] লোকেরা। তারা ছিল পূর্ব সাগরগুলোর সবচেয়ে সক্রিয় বাণিজ্যিক নৌচালকদের [Navigator] অন্যতম। তাদের জাহাজগুলো অপর পারের বারবেরা [Berbera] উপকূল থেকে উপদ্বীপের আরবরা যারা সবাই ছিল শামীয় জাতির, তারা ছাড়াও অন্যান্য জাতির লোকেরাও ছিল যাদের কুশীয় বলা হতো। তারা ছিল হামের পুত্র কুশের বংশধর। তারা ফোরাত নদী ও পারস্য উপসাগরের তীরে বাস করত। ধর্মগ্রন্থে সাধারণভাবে আরবদের কুশের নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারা অবশ্যই এ জাতির আরবই হবে যারা প্রাচীন আসিরিয়ার জনহীন অঞ্চলগুলোতে বিচরণ করে এবং সম্প্রতি তাদের নিনেভের দীর্ঘকাল আগে লুপ্ত ধ্বংসাবশেষ খননের কাজে লাগানো হয়েছে। তাদেরকে কোনো কোনো সময় সিরীয়-আরব নামেও অভিহিত করা হয়। এ গ্রন্থটি শুধু উপদ্বীপের আরবগণ বা খোদ আরবের সাথেই সম্পর্কিত।

ভারত ও ক্রান্তীয় আফ্রিকার সোনা, মসলা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রীর সাথে গন্ধতরু ও সুগন্ধি কাঠ বহন করে আনত। তাদের নিজেদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের সাথে এসব সামগ্রী মরুভূমি ওপর দিয়ে কাফেলার মাধ্যমে আম্মন [Ammon], মোয়াব [Moab] এবং এদোম [Edom] বা ইদুমিয়ার [Idumea] মতো আধা আরব রাজ্যসহ ভূমধ্যসাগরের ফিনিশীয় বন্দরগুলোতে পৌঁছত এবং সেখান থেকে পাশ্চাত্য জগতে ছড়িয়ে পড়ত।

উটকে বলা হতো মরুভূমির জাহাজ, আর কাফেলাকে বলা যেতে পারে জাহাজ বহর। সাধারণত ইয়েমেনের কাফেলাগুলো সজ্জিত করা, সেগুলোর লোকবল, পরিচালনা ও প্রহরার কাজে নিয়োজিত থাকত যাযাবর আরবরা। এ কারণে তাদেরকে মরুভূমির নাবিক বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তারা কাফেলার অসংখ্য উটকে সজ্জিত করত, সে সাথে তাদের অসংখ্য ভেড়ার উৎকৃষ্ট পশম পণ্য বহরে যোগ করত। মহানবী [সা]-এর পত্রে এ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যার মাধ্যমে দক্ষিণের ধনী দেশগুলো, ভারত, ইথিওপিয়া এবং সুখী আরব প্রাচীন সিরিয়ার সাথে যুক্ত ছিল।

টায়ারের জন্য বিলাপে এজকেল বলেন, "কাদেরের সব পুত্র মেষ, মেষ শাবক ও ছাগলের পাল দিয়ে আরব অধিকার করে নিল এবং এভাবে তারা ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। শেবা ও রা'মাহর ব্যবসায়ীরা তাদের প্রধান মসলা সম্ভার এবং মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণ দিয়ে আরবের মেলাগুলো দখল করল। শেবা, আশুর ও চেলমাদের বণিকরা ছিল হারান, কানাহ ও এডেনের বণিক।" এবং ইসাইয়াহ জেরুসালেম সম্পর্কে বলেন, "অসংখ্য উটে জেরুসালেম ভরে উঠবে, মিডিয়াম ও এফার এক কুঁজওয়ালা উট, তাদের সবই আসবে শেবা থেকে আর তারা বয়ে আনবে স্বর্ণ ও ধূপ-ধুনা। কাদেরের সব পশুপাল তার কাছে জড়ো হবে, নেবাইওসের মেষরা তার প্রয়োজন মেটাবে।" [ইসাইয়াহ ৯: ৬,৭]

যাহোক, কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী, শহর ও নগরগুলোতে বসবাসকারী আরবরা কখনোই আরব জাতির প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হতো না। আরবের অন্য যে কোনো অংশের চেয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ ছিল অনেক বেশি সহজ এবং লোভীদের বিপুলভাবে প্রলোভিত করে তা বারংবার আগ্রাসনের শিকার ও পদানত হয়।

অন্যান্য শ্রেণির আরবদের মধ্যে মরুভূমিতে বিচরণকারী, তাঁবুবাসী আরব, এ দু'য়ের প্রায় সবার মধ্যেই তাদের জাতীয় চরিত্র আদিম শক্তি ও তরতাজা রূপ নিয়ে বিদ্যমান ছিল। স্বভাবে

www.pathagar.com

যাযাবর ও পেশায় পশুপালক এবং অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যে ঋদ্ধ এ আরবগণ মরুভূমির সকল গোপন সম্পদসহ চারণ জীবন যাপন করত। তারা সেসব কূপ ও ঝর্ণার সন্ধানে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত যেগুলো ছিল আদিকাল থেকে তাদের পূর্বপুরুষগণের অবলম্বন। যেখানেই তারা ছায়াদানকারী খেজুর গাছ, খাদ্য এবং তাদের পশুপাল, ঘোড়া ও উটের জন্য চারণক্ষেত্র খুঁজে পেত সেখানেই শিবির স্থাপন করত। সেখানকার ঘাস-পানির মজুদ শেষ হয়ে এলে তারা বেরিয়ে পড়ত নতুন বাসস্থানের সন্ধানে। হারান, কানাহ ও এডেন ভারত মহাসাগর তীরবর্তী বন্দর।

এ যাযাবর আরবরা অসংখ্য গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত ও উপবিভাজিত ছিল যাদের প্রধান ছিলেন শেখ ও আমিরগণ। তারা ছিলেন প্রাচীন কালের গোষ্ঠীপতির প্রতিনিধি। তার নেতৃত্বের প্রতীক হিসেবে তার তাঁবুর সামনে একটি বর্শা প্রোথিত থাকত। অনেক ক্ষেত্রেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই পরিবারে এ নেতৃত্ব বজায় থাকলেও তা বংশ পরম্পরা ধরে চলার বাধ্য-বাধ্যকতা ছিল না। এটা নির্ভরশীল ছিল গোত্রের শুভেচ্ছার ওপর। তাকে সরিয়ে দেয়া যেত এবং ভিন্ন ধারার একজনকে তার জায়গায় নির্বাচন করা হতো। তার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হতো, নেতৃত্ব নির্ভর করত তার ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও তার ওপর গোত্রের অর্পিত আস্থার ভিত্তি। শান্তি আলোচনা ও লড়াই পরিচালনা, শত্রুর বিরুদ্ধে গোত্রকে নেতৃত্ব দেয়া, শিবিরের স্থান নির্বাচন এবং আগত নানা ধরনের ব্যক্তিকে স্বাগত জানানো ও তাদের সাথে আচরণের মধ্য দিয়ে তার নেতৃত্বের যোগ্যতা নির্ধারিত হতো। যদি সে এগুলোতে সফল হতো তাহলেও তাকে তার লোকদের মতামত ও ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হতো।

যাহোক, সংখ্যাধিক্যতা আর সময় একটি গোত্রের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করতে পারত, কোনো কোনো শাখার নেতা সতর্কভাবে মনের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখত আত্মীয়তার সম্পর্ক। একটি গোত্রের সকল শেখ অভিন্ন স্বার্থে একজনকে প্রধান নির্বাচন করত, তাকে বলা হতো শেখদের শেখ। তিনি পাথরের নির্মিত প্রাসাদে আরাম-আয়েশের মধ্যেই থাকুন আর মরুভূমির বুকে পশুপাল, ঘোড়া-উটের মধ্যে তাঁবুতেই থাকুন, গোত্রের অভিন্ন কল্যাণে জরুরি প্রয়োজনে সকল শাখাকে তার পতাকা তলে জড়ো করতে পারতেন।

বার্কহার্ড [Burckhard] বলেন, "গ্রীষ্মের সময় যাযাবর আরবগণ এক স্থানে কদাচিৎ তিন বা চারদিনের বেশি থাকত। পানির কাছে তাদের পশুপালের খাদ্য লতাপাতা ফুরিয়ে গেলে গোত্রটি নতুন চারণ ভূমির সন্ধানে রওনা হতো। তাদের ছেড়ে যাওয়া স্থানে আবার ঘাস-লতা-পাতা অংকুরিত হতো ও পরের আগত দলের প্রয়োজনে লাগত। তাদের শিবির গড়ে উঠত তাঁবু দিয়ে। সবার তাঁবুর সংখ্যা সমান ছিল না। শিবিরে ৬শ' থেকে ৮শ' তাঁবু থাকত। যখন তাঁবুর সংখ্যা খুব কম হতো তখন সেগুলো গোলাকারে স্থাপিত হতো। কিন্তু বেশি হলে সোজা সারি অথবা একটি তাঁবুর সারিতে বিন্যস্ত হতো। বিশেষ করে কোনো নদী তীরে তিন বা চারটি সারিতে তারা তাদের তাঁবু বিন্যাস করত। শীতকালে যখন পানি বা পশুচারণ ভূমির কোনো কোনো সমস্যা থাকত না তখন তারা বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে তিন বা চারটি তাঁবুর এক একটি দল হিসেবে ছড়িয়ে থাকত। একটি দল থেকে আরেকটি দলের দূরত্ব থাকত প্রায় আধা ঘণ্টার। শেখের তাঁবু সব সময়ই একপাশে থাকত যেখানে শত্রু বা অতিথিকে আশা করা হতো। প্রথমোক্তের মোকাবেলা আর শেষোক্তকে সম্মান করাই ছিল শেখের প্রধান কাজ। প্রতিটি

www.pathagar.com

পরিবারের পিতা তার তাঁবুর পাশের মাটিতে বর্শা প্রোথিত করে রাখত আর সামনেই বাঁধা থাকত তার ঘোড়া। তার উটও রাতে বাঁধা থাকত সেখানে।" – Burckhardt, Notes on Beduins,vol 1, p.33.

আসিরিয়ার আরবদের সম্পর্কে একটি বর্ণনা নিম্নরূপ যদিও তা প্রায় সামগ্রিকভাবে গোটা জাতি সম্পর্কেই প্রযোজ্য:

"পশুচারণ ভূমির উদ্দেশ্যে অভিবাসী একটি বিরাট গোত্রের উপস্থিতি বর্ণনা করা একটি কঠিন কাজ। আমরা শিগগিরই আমাদের দেখতে পাব এক বিরাট বিস্তৃত মেষ ও উটের পালের মধ্যে। ডানে, বামে, সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু চলমান জনতা। গাধা ও বলদের দীর্ঘ সারি, তাদের পিঠে কালো তাঁবু, বিরাট কড়া, বিচিত্র ধরনের কার্পেটের বোঝা; গেরস্থালিসামগ্রীর স্তূপের সাথে হাঁটতে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা; ঘোড়ার পিঠে ঝোলানো থলের মধ্য থেকে সংকীর্ণ মুখ দিয়ে বেরিয়ে থাকা শিশুর মাথা, পশুর ভারসাম্য রক্ষার জন্য দু'পাশে বাঁধা শিশু বা মেষ শাবক; আঁটোসাঁটো আরবি শার্ট পরিহিত তরুণীরা যাতে তাদের সুন্দর দেহ কাঠামো প্রস্ফুটিত; সন্তান কাঁধে মায়েরা; ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নেয়া বালকরা; লোমের গুচ্ছ শেভিত দীর্ঘ বর্শা হাতে অশ্বারোহীরা, ঘোটকীর পিঠে আরোহী হয়ে প্রান্তরে ছুটে বেড়ানো; আরোহীদের ছোট হুক লাগানো লাঠি দিয়ে উট চালনা, গলার দড়ির সাহায্যে উন্নত জাতের ঘোড়াগুলো টেনে নেয়া; পালের মধ্যে ধাবমান অশ্বশাবকগুলো; এ রকমই ছিল ধূলি-ধূসরিত মানুষ ও প্রাণির সেই দঙ্গল যার মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হয়েছিল আমাদের।" [Layards Nineveh 1,4.]

যাযাবর গোত্রগুলোর সংখ্যাধিক্যতা, প্রত্যেকেরই নিজস্ব নেতা ও নিজস্ব ভূখণ্ড, কিন্তু কেন্দ্রীয় কোনো নেতা না থাকায় প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হতো। প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল তাদের প্রায় একটি ধর্মীয় নীতি। মৃত স্বজনের হত্যার প্রতিশোধ নেয়া ছিল তাদের পরিবারের দায়িত্ব, প্রায়ই তা গোত্রের মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত, অনেক সময় এ ঋণের দায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অমীমাংসিত থাকত, চলতে থাকত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

মেষপাল ও পশুপালকে রক্ষা করার জন্য সব সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা শিশুকাল থেকেই মরুভূমির আরবদের অস্ত্র চালনার সাথে পরিচিত করে তুলত। ধনুক, বর্শা ও তলোয়ার ব্যবহার এবং একাকী নৈপুণ্যের সাথে ঘোড়ায় চড়ার দক্ষতা অর্জনে কেউ কারো পিছনে থাকতে চাইত না। সে ছিল এক লুটেরা যোদ্ধা, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে সে নিয়োজিত হয় বণিকদের সেবায়, সে তার মালামাল বহনের জন্য বণিককে উট, গাইড ও চালক সমন্বয়ে সাজিয়ে দেয়, কাফেলার অভিযাত্রায় ভূমিকা রাখতে আবার মরুভূমির মাঝে কষ্টকর যাত্রার সময় তা লুটপাট করায়ও সে পটু। এর সবকিছুই সে অস্ত্রের বৈধ অনুশীলন বলে গণ্য করে, নোংরা অভ্যাস ও ধাওয়ার নীচ মানসিকতার কারণে ব্যবসায় অর্থশালীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে।

এমনই ছিল মরুভূমির আরব, তাঁবুর অধিবাসী, যেখানে পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছিল তার পূর্বপুরুষ ইসমাইলের [আ] ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ নিয়তি। "সে হবে স্বাধীন ও উদ্দাম। সে সবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সবাই হবে তার প্রতিপক্ষ।" প্রকৃতি তাকে তার ভাগ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছে। সে হালকা দেহের অধিকারী এবং কৃশকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ ও কর্মঠ এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণু। সে সংযমী ও মিতাহারী, তার প্রয়োজন সামান্য পরিমাণ ও অতিসাধারণ খাদ্য। তার শরীরের মতো তার মনও হবে হালকা ও চঞ্চল। তার মধ্যে রয়েছে শেমিটিক জাতির

www.pathagar.com

পর্যাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক গুণ, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিচক্ষণতা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনা। তার অনুভব ক্ষমতা দ্রুত ও ব্যাপক, যদিও তা স্থায়ী নয়; তার পাতুর মুখ গর্ব ও বেপরোয়া ভাবের ছাপ আঁকা, কালো, উজ্জ্বল চোখের চাহনি দ্যুতিময়। সে তেজস্বী বক্তৃতার আবেদনে জেগে উঠত, কবিতার মাধুর্যে হত মুগ্ধ। সে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষায় কথা বলত, তার শব্দগুলোর তুলনা হত রত্ন ও ফুলের সাথে, সে ছিল স্বভাবজাত বাগ্মী, তবে সে আলঙ্কারিক বক্তৃতার তুবড়ি ছোটানোর চেয়ে প্রবচন ও নীতিবাক্যেই আনন্দ লাভ করত এবং প্রাচ্য রীতিতে রূপক কাহিনী ও নীতিকাহিনীর মধ্যদিয়ে তার ধারণা ব্যক্ত করতে পছন্দ করত।

একজন অক্লান্ত যোদ্ধা ও লুটেরা হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল উদার ও আতিথ্যপরায়ণ। সে উপহার দিয়ে আনন্দ পেত, পথিকের জন্য তার দরজা ছিল চির উন্মুক্ত, তার সাথে সে সর্বশেষ খাদ্যকণাও ভাগ করে খেতে দ্বিধা করত না, আর চরম শত্রুও যদি একবার তার সাথে রুটি ভাগ করে খেত তাহলে সে তার তাঁবুতে অলঙ্ঘনীয় নিরাপত্তাধীনে শান্তিতে রাতে ঘুমাতে পারত।

যাকে তারা বলত অজ্ঞতার যুগ, সে সময় ধর্মের দিক দিয়ে বেশিরভাগ আরবই সমকালে প্রাচ্য জগতে প্রচলিত দু'টি ধর্ম সাবিয়ান ও ম্যাজিয়ানের অনুসারী ছিল। তবে সাবিয়ান ধর্মের ভক্তের সংখ্যাই ছিল বেশি। সেথের পুত্র সাবি থেকে এ ধর্ম পেয়েছে বলে তারা দাবি করত যিনি তার পিতা ও ভাইয়ের সাথে বিভিন্ন পিরামিডের আদি পুস্তক: ১৬, ১২।

মধ্যে সমাধিস্থ হন বলে অনুমান করা হয়। অন্যরা দাবি করেন যে নামটি এসেছে হিব্রু শব্দ সাবা বা তারা থেকে, তারা এ ধর্মের উৎস সন্ধান করেন আসিরীয় মেষের রাখালদের কাছে, যারা রাতে সমভূমিতে তাদের মেষপালের ওপর নজর রাখত, যারা মেঘহীন আকাশের নিচে স্বর্গীয় দূতদের আকৃতি ও চলাফেরা লক্ষ্য করে এবং মানবীয় ব্যাপারসমূহের ওপর তাদের শুভ ও অশুভ প্রভাববিষয়ক তত্ত্বের সৃষ্টি করে; এটি ছিল ভুয়া ধারণা যাকে ক্যালডীয় দার্শনিক ও পুরোহিতগণ একটি ব্যবস্থা হিসেবে অবনমিত করেন, তাকে মিসরীয়দের চেয়েও অধিকতর প্রাচীন বলে মনে করা হয়।

অন্যদের মতে, এ ধর্ম উদ্ভূত হয়েছে আরো উচ্চপর্যায় থেকে এবং তা প্রাগৈতিহাসিক কালের বলে দাবি করা হয়। তারা বলেন, মহাপ্লাবনের পরও তা টিকে থাকে এবং গোষ্ঠীপতিদের মধ্যদিয়ে তা প্রবহমান ছিল। ইব্রাহিম [আ] এ ধর্ম শিক্ষা দেন। তাঁর বংশধর, ইসরায়েলের সন্তানগণ কর্তৃক তা অনুসৃত হয় এবং সিনাই পর্বতে বজ্র ও বিদ্যুতের মধ্যে মূসাকে [আ] প্রদত্ত আইনের অনুশাসনে তা পবিত্রকরণ ও নিশ্চিত করা হয়।

আদি অবস্থায় সাবিয়ান ধর্ম ছিল পবিত্র ও আধ্যাত্মিক। তখন এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস, পরকালে পুরস্কার ও শাস্তি এবং সুখী অমরত্ব লাভের জন্য সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয়তার মতবাদ। সর্বোচ্চ সত্তার প্রতি সাবিয়ানদের ভক্তি এত প্রবল ছিল যে, তারা কখনো তাঁর নামও উল্লেখ করত না। মধ্যবর্তী কোনো অবলম্বন বা স্বর্গীয় দূতের মাধ্যম ছাড়া তাঁর নৈকট্য লাভেরও সাহস পেত না তারা। মানবদেহে যেমন একটি আত্মার অধিষ্ঠান ও বসবাস তেমনি স্বর্গীয় দূতের দেহেও এগুলোর অধিষ্ঠান ও বসবাস বলে মনে করা হতো। এ দূতেরা নিজ নিজ পর্যায়ে অবস্থান করে সর্বোচ্চ প্রভুর অধীনস্থ বিশ্বজগত তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করতেন। তারা ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আচরণে সাবিয়ানরা

www.pathagar.com

তাদের দেব-দেবী হিসেবে উপাসনা করত না, তবে সর্বোচ্চ প্রভুর সাথে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তারা এই স্বর্গীয়দূত সুলভ পরিব্যাপ্তকারীদের শুধু শান্ত রাখতে চাইত, আর এসব সৃষ্ট জিনিসের মধ্যদিয়ে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌র সন্ধান করত।

পর্যায়ক্রমে এ ধর্ম তার আদি সরলতা ও পবিত্রতা হারায় এবং রহস্যের জালে আবৃত হয়, এর মধ্যে ঢুকে পড়ে মূর্তিপূজা। সাবিয়ানরা স্বর্গীয় দূতদেরকে আর স্রষ্টাকে পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করে দেব-দেবীরূপে উপাসনা করতে শুরু করে। তারা পবিত্র উদ্যান, বনের ছায়ায় তাদের খোদাই করা মূর্তি স্থাপন এবং শেষ পর্যন্ত মন্দিরগুলোতে মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক দেবতার মর্যাদায় তাদের উপাসনায় নিয়োজিত হয়। যেসব দেশে সাবিয়ান ধর্মমত বিস্তৃত হয়েছিল সেসব দেশে তার পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন ঘটে। মিসরকে দীর্ঘকাল ধরেই এ ধর্মকে অবনমনের শোচনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। এ রহস্যময় দেশটির মূর্তি, হায়ারোগ্লিফিকস, অলঙ্কৃত সমাধিসমূহ শুধু সৌর জগতের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রই শুধু নয়– একবারে নিম্নস্তরের প্রাণী, এমনকি জড় বস্তুরও উপাসনার পরিচয় বহন করে।

আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রাচীন সভ্যতার সর্বাপেক্ষা উন্নত এ দেশটির কলঙ্ক ধীরে ধীরে অপনোদন করছে এবং তা মিসরের সমাধিগুলোর ওপর ঝুলে থাকা রহস্যের ঘোমটা অপসারণের পাশাপাশি এটা উন্মোচন করছে যে তারা যেসব বস্তু ও প্রাণীর উপাসনা করত বলে মনে করা হয় সেগুলো এক সর্বোচ্চ সত্তারই নানা গুণ ও রূপের প্রতীক যাঁর নাম মরণশীলদের উচ্চারণযোগ্য নয়। আরবদের মধ্যে সাবিয়ান ধর্মের সাথে সীমাহীন কুসংস্কারের মিশ্রণ ঘটে এবং তা ঘৃণ্য মূর্তিপূজায় রূপ নেয়। প্রতিটি গোত্রই তাদের নির্দিষ্ট তারা বা গ্রহের উপাসনা করত অথবা নিজেদের পছন্দের মূর্তি স্থাপন করত। শিশু হত্যাকে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল। যাযাবর গোত্রগুলোর মধ্যে কন্যাশিশুর জন্মকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করা হতো। তারা স্বভাবে যাযাবর ও লুটেরা হওয়ায় মেয়েরা তাদের সামান্যই কাজে আসত। পক্ষান্তরে ব্যভিচারিণী হয়ে বা বন্দিত্ব বরণ করে তার পরিবারের জন্য অসম্মান বয়ে আনার আশঙ্কা ছিল। ধর্মীয় অনুভূতির সাথে অস্বাভাবিক নীতির সংমিশ্রণের ফলে তারা কন্যা শিশুদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিত কিংবা জ্যান্ত কবর দিত।

প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাজিয়ান বা গুয়েবেরেস [অগ্নি উপাসক] ধর্ম প্রাচ্যের ধর্মীয় সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করে পারস্যে তার উত্থান ঘটায়। কিছুকাল পর মহান নবী ও শিক্ষক জরথুস্ত্র [zoroaster] তাঁর জেন্দাবেস্তা [Zendavesta] ধর্মগ্রন্থে এ ধর্মের মৌখিক মতবাদকে লিখিত রূপ দেন। যাঁর মাধ্যমে ও যাঁর দ্বারা বিশ্বজগৎ অস্তিত্বশীল সেই এক সর্বোচ্চ ও শাশ্বত আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসসহ এ ধর্মমতও সাবিয়ানদের মত গোড়াতে সরল ও আধ্যাত্মিক ছিল। এ ধর্মমতে ছিল যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিবাণীর মধ্যদিয়ে দু'জন স্বর্গীয় দূত সৃষ্টি করেন। একজন Ormusd, তিনি হলেন আলো বা শুভর দূত; অন্যজন Ahriman, তিনি আঁধার বা অশুভের দূত। এভাবে বিপরীত উপাদানসমূহের সংমিশ্রণে বিশ্ব সৃষ্টি হয়। তখন থেকে সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ লাভে এ দু'য়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে আসছে। যখন যার প্রাধান্য– এ ভিত্তিতে উত্থান ও পতনের মধ্যদিয়ে উভয়ের দ্বন্দ্ব পৃথিবীর বিলয় পর্যন্ত চলতে থাকবে। তারপর সার্বিক পুনরুত্থান ও বিচার দিবস আসবে; তখন অশুভের দূতকে তার অনুসারীদেরসহ শোচনীয় শাস্তি ভোগের জন্য এক

www.pathagar.com

যন্ত্রণাদায়ক অন্ধকার স্থানে নির্বাসন দেয়া হবে, আর তাদের বিরোধীরা চির-আলোকিত স্থানে সুখের আলয়ে প্রবেশ করবে।

এ ধর্মের আদি আচার-অনুষ্ঠান ছিল একবারেই সহজ। ম্যাজিয়ানদের মন্দির, বেদী বা কোনো প্রকার ধর্মীয় প্রতীক ছিল না। তাদের প্রার্থনা ও স্তোত্রসমূহ সরাসরি দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করত। তারা মনে করত সূর্য হচ্ছে দেবতার বাসস্থান। দেবতার বাসস্থান হিসেবে এবং আলো ও উত্তাপের উৎস হওয়ায় তারা সূর্যের উপাসনা করত। সূর্যের অনুপস্থিতিতে দেবতাকে আলো জোগাতে তারা পাহাড় চূড়ায় আগুন জ্বালিয়ে দিত। জরথুস্ত্র প্রথম মন্দিরের প্রচলন করেন যেখানে স্বর্গীয় আগুন বলে পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানে সার্বক্ষণিকভাবে পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখা হতো। পুরোহিতরা দিন-রাত এদিকে দৃষ্টি রাখতেন।

কাল পরিসরে সাবিয়ানদের মতো ম্যাজিয়ানরাও প্রতীকের মধ্যে তাদের মূল ধর্মনীতি হারিয়ে ফেলে। তারা প্রকৃত দেবতা হিসেবে আলো বা আগুনের উপাসনা এবং অন্ধকারকে শয়তান বা অপদেবতা হিসেবে ঘৃণাভরে পরিহার করে। ম্যাজিয়ানরা ধর্মীয় উন্মত্ততায় অবিশ্বাসীদের আটক করে এনে দেবতার ক্রোধ শান্ত করতে তাদের আগুনে উৎসর্গ করত। এ দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতবাদ সম্পর্কে 'উইজডম অব সলোমন'-এ চমৎকারভাবে বলা হয়েছে, "যারা ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞ সে মানুষরা নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ, এবং কর্ম বিবেচনায় তারা কর্মপ্রভুকে স্বীকার করে না, কিন্তু আগুন অথবা বাতাস, অথবা বেগবান বায়ু, অথবা তারকাপুঞ্জের আবর্তন, অথবা খরস্রোতা পানি, অথবা স্বর্গীয় আলো ঈশ্বরদেরই বলে মনে করে যারা শাসন করে বিশ্বকে।"

এ দু'ধর্মের মধ্যে আরবদের ওপর সাবিয়ান ধর্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু তার চরম অবনতি ঘটেছিল, তার মধ্যে সকল প্রকার অনাচার এসে মিশে ছিল, এক এক গোত্রে একেক রকমভাবে পালিত হতো। ম্যাজিয়ান ধর্ম প্রচলিত ছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গোত্রগুলোর মধ্যে যাদের পারস্যের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। অন্য গোত্রগুলো তাদের সীমান্তসংলগ্ন বিভিন্ন জাতির কুসংস্কার ও মূর্তি পূজা গ্রহণ করেছিল।

ইহুদি ধর্ম একেবারে প্রথম দিকেই আরবে প্রবেশ করেছিল, তবে অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায়। আজো তার বহু রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও বর্ণময় ঐতিহ্য দেশটিতে শিকড় ছড়িয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে ফিলিস্তিন যখন রোমানদের দ্বারা ছারখার হয় এবং তারা জেরুসালেম অধিকার ও লুণ্ঠন করে, ইহুদিদের অনেকেই এসে আরবদের কাছে আশ্রয় নেয়। তারা স্থানীয় গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নিজেদের সম্প্রদায় গঠন করে। তারা উর্বর ভূমির অধিকার লাভ করে, দুর্গ ও ঘাঁটি নির্মাণ করে যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

আরবদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল। সেন্ট পল গালাতীয়দের কাছে তাঁর পত্রে ঘোষণা করেন যে অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য নির্দেশ পাবার পর তিনি "আরবে গিয়েছিলেন।" তৃতীয় শতকের গোড়ার দিকে পূর্বাঞ্চলের গির্জাগুলোর মধ্যকার মতানৈক্য খ্রিস্টান ধর্মকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে। শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর শুরু করে অত্যাচার-নির্যাতন। তারা বহু লোককে পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রান্তে নির্বাসন দেয়। ফলে আরবের মরুভূমিগুলো খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের দ্বারা ভরে ওঠে। তারা আরবের কয়েকটি প্রধান গোত্রের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের বীজ বপণ করতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

উপরিউক্ত বাস্তব নৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে আরবদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন না ঘটার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও বিশাল মরুভূমি যেমন তাদের বিজয়ীদের হাত থেকে রক্ষা করেছে তেমনি তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ঐক্যের অভাব বিজয়ীদের মতো পরাক্রমশালী হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। তারা ছিল খণ্ড খণ্ড অংশের সমষ্টি, ব্যক্তিগতভাবে তেজস্বী ও বীর, কিন্তু সম্মিলিত শক্তির প্রত্যাশী। যাযাবর জীবন তাদের কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ করেছিল। তাদের বেশির ভাগই ছিল শৈশব থেকেই যোদ্ধা। তারা সীমান্তবর্তী কতিপয় গোত্র যারা বাইরের সাথে যুদ্ধ মাঝে-মধ্যে ভাড়াটে হিসেবে নিয়োজিত হতো তাদের সাথে কখনো কখনো লড়াই করত। তাছাড়া বাকি সময়টা শুধু নিজেদের মধ্যেই হানাহানিতে লিপ্ত থাকত। যেখানে মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোত্রগুলো, যাদের যুদ্ধের প্রতি ব্যাপক কোনো আগ্রহই ছিল না, কালের বিবর্তনে তারা সাফল্যের সাথে সভ্য জগৎকে পরাজিত ও বিশাল জয় করেছিল, সেখানে নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞ এ যোদ্ধা জাতি ঐক্যহীন অবস্থায় ও কারো প্রতি ক্ষতিকর না হয়ে মরুভূমির গভীরে তাদের জীবন অতিবাহিত করছিল।

অবশেষে সেই সময় এলো যখন এ ঐক্যহীন গোত্রগুলো একটি ধর্মীয় পতাকাতলে সম্মিলিত এবং একটি অভিন্ন স্বার্থে উদ্দীপিত হলো; এক অতুলনীয় নেতার আবির্ভাব ঘটল যিনি এ বিচ্ছিন্ন আরবদের ঐক্যবদ্ধ করাসহ তাদেরকে উৎসাহ ও সাহসে উজ্জীবিত করলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে মরুভূমির এ মহাশক্তি বিশ্বের সাম্রাজ্যগুলোকে প্রকম্পিত করে তাদের সম্রাটদের মসনদ উল্টে দিল। তিনি হলেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ [সা]।

খ্যাতনামা মার্কিন লেখক, ঐতিহাসিক, কূটনীতিক ওয়াশিংটন আরভিং [১৭৮৩-১৮৫৯] রচিত ও ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'দি লাইফ অব মুহাম্মাদ' [সা] গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ।

www.pathagar.com

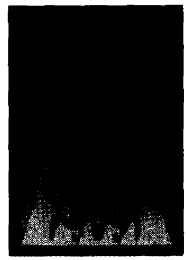

কুরআন, সুন্নাহ, ইসলাম ও মুসলমানের চরম শত্রু সেক্যুলারিজম-সৃষ্ট নাস্তিক্যবাদ

প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ

পূর্বকথা

ইসলামকে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে আক্রমণ করেছে খোদাদ্রোহী-পথভ্রষ্ট অপশক্তি। সর্বসাম্প্রতিককালে এ আঘাত এসেছে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ বা ইহজাগতিক গোষ্ঠীর গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসীদের দ্বারা। বাংলাদেশের শাহবাগকেন্দ্রিক অনাচার এমনই একটি ইসলাম বিরোধিতার তাজা উদাহরণ, যেখানে ইসলাম, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা, নবী করিম [সা]-এর শানে চরম বেয়াদবির ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের বিষয়গুলো তুলনামূলক পর্যালোচনা করে এ গবেষণায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কীভাবে ইসলাম তথা কুরআন ও সুন্নাহর ক্ষতি করছে, সেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিষবৃক্ষ উৎপাটন করে শানে-রেসালাতের সুমহান আদর্শের পবিত্রতায় স্নাত হয়ে প্রতিটি মুসলমান নর-নারীকে ঋদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

১.

ইসলামের সঙ্গে কুফর/জাহিলিয়াত/তাগুত ইত্যাদির লড়াই বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত অপরিহার্য বিষয়।[১] কারণ, ইসলাম হলো নূর, আলো বা জ্যোতি। অপরদিকে কুফর/ জাহিলিয়াত/ তাগুত হলো অন্ধকার। অতএব, আলো ও অন্ধকারের মধ্যে লড়াই-দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্বাভাবিক ঘটনা।[২]

কুফর/জাহিলিয়াত/তাগুত ইত্যাদি নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। নানা ফেতনা ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে কুফর/জাহিলিয়াত/ তাগুত নানা পরিচয়ে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দিক থেকে এসে আত্মপ্রকাশ ও আক্রমণ করেছে। কখনও আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময়ে, কখনও খারিজিদের মাধ্যমে, কখনও মুতাজিলাদের দ্বারা বা কাদিয়ানিদের দ্বারা এই আগ্রাসন ইসলামের ভেতর-বাইরে উভয়বিধ দিক থেকে হয়েছে।[৩]

www.pathagar.com

আধুনিককালে এই আগ্রাসন বাইরে থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রথমে হানা দেয় ঔপনিবেশিক খ্রিস্ট শক্তি দ্বারা, যে শক্তি ক্রুসেডের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ইসলামের শেষ উম্মাহভিত্তিক রাজনৈতিক পরিচয়বাহী উসমানিয়া সালতানাতকে ধ্বংস করে। পরে ইউরোপের খ্রিস্ট শক্তিসমূহ [ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগিজ, জার্মান, ইতালি] মুসলিম জগৎকে বিভিন্ন উপনিবেশে ভাগ করে শত শত বছর শোষণ চালায়। আরও পরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রও এই শোষণে অংশ নেয় এবং খ্রিস্ট শক্তির সঙ্গে এসে ইহুদি শক্তিও মুসলিম নিধনে অংশ নেয়। তখন ইসলামের বিরুদ্ধে একের পর এক সাংঘর্ষিক ও বিরুদ্ধবাদী মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমন, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি। সর্বশেষে এসেছে সেক্যুলারিজ বা ধর্মনিরপেক্ষবাদ, যার হাত ধরে এসেছে নাস্তিক্যবাদ। এসবই হলো কুফর/জাহিলিয়াত/তাগুত-এর আধুনিক সংস্করণ, যা ইসলামের সঙ্গে চরম সাংঘর্ষিক বিষয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার এটাই যে, মুসলিম বিশ্বে এখন এসব ইসলামবিরোধী কুফর/জাহিলিয়াত/তাগুতভিত্তিক মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বা অনেক স্থানে হয়েছেও। এবং বহু মুসলমান জেনে এবং অনেকেই না জেনে এসব মতবাদকে মান্য করছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথা বলা যায়। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শক্তিকে মুসলিম আদর্শের মাধ্যমে বিতাড়িত করে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। পরে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল তথা আজকের বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলাদেশের জন্য ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত কোনো আন্দোলন-সংগ্রামেই ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজমের কথা কোনো দাবি-দাওয়া ও দফায় ছিল, এমন প্রমাণ ঐতিহাসিকদের কাছে নেই। কিন্তু ১৯৭২ সালে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গিয়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা যুক্ত হয় মূলত অতি-উগ্র বামপন্থী গোষ্ঠী এবং একটি বিশেষ দেশের চাপে। পরে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'আল্লাহ প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস' সংযুক্ত ও পরে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' গৃহীত হয়। বর্তমানে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মবিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছে। যে কারণে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চূড়ান্ত প্রকাশ নাস্তিক্যবাদ ও মহানবী [সা]-এর অবমাননার মাধ্যমে ঘটেছে, যার বিরুদ্ধে ওলামায়ে কেরাম ও মুসলিম জনতাকে সরব হতে হয়েছে। এখনও এই অপশক্তি প্রকাশ্য ময়দানে, মিডিয়ায়, তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক কম্পিউটার-নির্ভর-সাইবার জগতে অপতৎপরতায় লিপ্ত। অতএব, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষবাদী/ নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি দ্বারা আক্রান্ত।[৪] এবং এই অপশক্তি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, উচ্চশিক্ষাগত ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে দেশকে মুসলিম ও সেক্যুলার ভাগে বিভক্ত করেছে, যা জাতিগত ঐক্য ও সংহতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশেষত, তরুণ প্রজন্ম, যুব সমাজ, আধুনিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবে এই কুচক্রী মহলের খপ্পড়ে পড়েছে। তাই, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ/ সেক্যুলারিজম/ নাস্তিক্যবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করা জরুরি। জরুরি এহেন কুফর/ জাহিলিয়াত/ তাগুত মতবাদের কারণে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, ধর্মীয়,

www.pathagar.com

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়সহ সর্বক্ষেত্রে কী কী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, সেটা চিহ্নিত ও দূরীভূত করা। এবং ময়দানের প্রতিরোধের পাশাপাশি এর বিরুদ্ধে জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিকভাবে মানুষের মধ্যে দাওয়াতী উদ্যোগ গ্রহণ করাও অপরিহার্য। মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজকে ইসলামের আওতার বাইরে ধর্মনিরপেক্ষতার আওতায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে তৌহিদি জনতা ও ধর্মনিরপেক্ষ জনতা নামে স্পষ্ট দুটি ভাগ হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন হিংসা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি এভাবেই বিপন্ন হচ্ছে। যার ফায়দা নিচ্ছে কুফর/ জাহিলিয়াত/ তাগুত। অতএব ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য চরম ক্ষতিকর এসব বিষয়ে সতর্ক থাকার পাশাপাশি তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক থেকে সচেষ্ট থাকাও এ কান্ত কর্তব্য।

২.

ইংরেজি [Secularism] সেক্যুলারিজমের বাংলা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। এটি একটি নীতি বা আদর্শ। আর সেক্যুলার মানে ধর্মনিরপেক্ষ; এর অর্থ ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা। শব্দটির আরেকটি বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'ইহজাগতিকতা', যার অর্থ হলো, ইহ জগতের বাইরে চিন্তা ও কাজ না করা; সব কিছুকেই ইহ জগতের বা বর্তমান প্রয়োজনের বা গুরুত্বের ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা। ইহকালের পরে পরকালে কী হবে, সে বিষয়ে সতর্ক না থাকা। ক্ষেত্র বিশেষে পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস বা আস্থা না রাখার কথাও এতে বলা হয়। এটা নিছক দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝায়; দুনিয়ার বস্তুগত ভোগ-বিলাস, লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশ খুবই গুরুত্ব লাভ করে। পরকালের কোনো গুরুত্ব সামনে আসে না। ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইহজাগতিকতা, উভয়টিই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং সাংঘর্ষিক। যেমন– ইসলামে ধর্ম মানে দ্বীন বা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই দ্বীন মান্য করতে ও পালন করতে হবে। এই ব্যাপারে নিরপেক্ষতার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআন 'পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হতে' বলেছে; নিরপেক্ষ থাকতে বলেনি। পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যায়: 'হে মু'মিনগণ, তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' [২:২০৮]

আখিরাত বা পরকালকে বিশ্বাস করা মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। শুধু ইহকালকে নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এবং পরকালকে বিবেচনা না করা হলে ঈমানের শর্ত পূরণ হয় না এবং পরকালকে বিশ্বাস না করা ঈমানের খেলাপ ও কুফরের অংশ। মুসলমানদের 'দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ' চাইতে বলা হয়েছে। শুধু দুনিয়ার কল্যাণ চাইতে বলা হয়নি। ফলে এই মতবাদ মুসলমানদের বিশ্বাসের অনুকূল নয় এবং ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে অস্বীকার করার শামিল। এটা একজন আস্তিক বা বিশ্বাসী মানুষকে নাস্তিক বা অবিশ্বাসীতে পরিণত করে।

৩.

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা ইহজাগতিকতার সবচেয়ে বড় কুফল হলো, এটি ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজকে ইসলাম-বিরোধী বানায়। ব্যক্তি মুসলমানদের দ্বীন থেকে নিরপেক্ষ করে ফেলে এবং কেবল দুনিয়ামুখী বানায়। ফলে এই আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ এসে যায়। তারা ক্রমশ ইসলাম, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা, কুরআন, আখিরাত এবং নবী [সা]-এর এমন

www.pathagar.com

বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে, ইসলামের চরম শত্রুরাও যা করতে সাহস পায়নি।[৫] এই নাস্তিকরা নিজের অজান্তেই এক সময় মুরতাদ বা ইসলাম ধর্মত্যাগকারীতে পরিণত হয়।[৬] অতএব দেখা যাচ্ছে, সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ একজন মানুষকে প্রথমে নাস্তিক এবং পরিশেষে মুরতাদে রূপান্তরিত করতে পারে। ফলে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবে এই মতাদর্শের সংস্পর্শে যাওয়া মুসলমানদের জন্য বিপজ্জনক ও ভয়াবহ।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেক্যুলারিজমের কারণে ও কুপ্রভাবে একজন মুসলমানের মধ্যে কীভাবে প্রথমে নাস্তিক ও পরে মুরতাদে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা জন্মে, সেটা আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য আমরা 'মুসলমান কখন ও কীভাবে কাফের হয়', সে বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করতে পারি। মূলত একজন কাফের যেসব বিষয় স্বীকার করলে মুসলমান হয়, কোনও মুসলমান ব্যক্তি তা থেকে একটি বিষয়ও অস্বীকার করলে সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কায়ের হয়ে যাবে।

কারণ, ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী [রহ] বলেছেন:

"শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, নির্দিষ্ট বিষয়সমূহকে আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নেওয়া, যা দ্বীনের জরুরি বিষয় হিসেবে জানা গেছে।"[৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলুসি [রহ.] বলেছেন:

"শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলা হয়, রাসূল [সা]-এর আনীত সমস্ত বিধান আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নেওয়া। বিস্তারিতভাবে যেসব বিধান জানা গেছে, তার ওপর বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে যা জানা গেছে, তার ওপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনা।"[৮]

প্রসঙ্গত কুফর–এর সম্পর্কে ইমাম গাযালি [রহ.] বলেন : "শরীয়তের পরিভাষায় কুফর– এর সংজ্ঞা হলো, দ্বীনের যেসব বিধান নিয়ে রাসূল [সা]-এর আগমন হয়েছে, তা থেকে একটি বিধানকেও অস্বীকার করা।"[৯]

অতএব, প্রতীয়মান হলো যে, কাফের হওয়ার জন্য শরীয়তের সব বিধান অস্বীকার বা অমান্য করার প্রয়োজন নেই। বরং গোটা শরীয়ত থেকে একটি জরুরি বা অত্যাবশ্যকীয় বিধানও যদি কোনো ব্যক্তি অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। তওবা করে পুনরায় ঈমান আনা ব্যতিত তার জীবনের কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তার পক্ষে মুসলমান থাকাও সম্ভব হবে না।[১০]

উক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে কোনো মুসলমান ব্যক্তির কাফের/ধর্মদ্রোহী হওয়ার বিষয়গুলোকে চার শ্রেণি/ভাগে বিভক্ত করা যায়:

ক. বিশ্বাসগত দিক থেকে; খ. বাচনিক দিক থেকে; গ. আমল বা কর্মগত দিক থেকে; এবং ঘ] বর্জন জাতীয় দিক থেকে। এখন চার ভাগ বা শ্রেণির অন্তর্গত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলেও পুরো আলোচনাটি আরও স্পষ্ট হবে।

ক] বিশ্বাসগত দিক থেকে ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্ররোচনায় বিশ্বাসগত দিক থেকে কুফর ৯ ভাবে হতে পারে।

ক-১: আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সঙ্গে শরিক করা : যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে [যেমন মুশরিকরা] অথবা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে অস্বীকার করবে

www.pathagar.com

[যেমন নাস্তিকগণ] বা তাঁর কোনো সিফাতকে অস্বীকার করবে বা এতে কাউকে শরিক করবে, সে কাফের ও ধর্মদ্রোহী হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা, পালন ও নিয়ন্ত্রণকারীরূপে বিশ্বাস বা স্বীকার না করলে, সে কাফের ও ধর্মদ্রোহী হয়ে যাবে।[১১]

ক-২: **আল্লাহর স্ত্রী বা সন্তান-সন্ততি আছে বলে বিশ্বাস করা :** আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার সন্তান-সন্ততি আছে বলে বিশ্বাস করলে অথবা মানুষ্যরূপ আছে বলে বিশ্বাস করলে সে কাফের ও খোদাদ্রোহী হয়ে যাবে। তা ছাড়া, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক বলে বিশ্বাস করলে এবং স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্বকে স্বীকার করলে সে কাফের ও খোদাদ্রোহী হয়ে যাবে।

ক-৩: **কুরআনকে অবিশ্বাস করা :** পবিত্র কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এটি সব ধরনের পরিবর্তন থেকে সুরক্ষিত রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে, যার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নিজেই নিয়েছেন। সুতরাং কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন অথবা এর অংশ বিশেষকে, এমন কি, পবিত্র কুরআনের একটি শব্দ বা অক্ষরকে অবিশ্বাস করলে বা মিথ্যা বলে ধারণা করলে, সে কাফের হয়ে যাবে।

ক-৪: **দ্বীনের সুস্পষ্ট কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা :** কোনো ব্যক্তি দ্বীনের যে কোনো সুস্পষ্ট বিধান, যেমন: নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ, জিহাদ, কোরবানি, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদিকে মেনে না নেয় অথবা পালন না করে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

ক-৫: **রাসূল [সা]-এর শানের পরিপন্থী করা :** রাসূল [সা]-এর শান, ইজ্জত, মর্যাদার পরিপন্থী চিন্তা করা বা বলা বা বেয়াদপি বা বিরোধিতা করা হলে সে ব্যক্তি কাফের।

ক-৬: **হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করা :** সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত ও প্রমাণিত হারাম বিষয়কে হালাল বলে বিশ্বাস করলে ও পালন করলে কাফের সাব্যস্ত হবে। যেমন: মদ্যপান, সুদ, জাদু, অবৈধ মেলামেশা, ব্যভিচার, বেপর্দা ইত্যাদি হারাম কাজকে হালাল বলে বিশ্বাস ও পালন করলে সে ব্যক্তি কাফের।

ক-৭: **সুন্নাহ-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা :** কোনো ব্যক্তি যদি রাসূল [সা] বা তাঁর প্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থা বা সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে।

ক-৮: **সাহাবি [রা]-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা :** কোনো ব্যক্তি যদি সাহাবি [রা]-এর মাধ্যমে দ্বীনের যে বৃদ্ধি ও বিজয় হয়েছিল, সে কারণে বা তাদের ইসলাম গ্রহণ ও রাসূল [সা]-এর অনুসরণের কারণে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।

ক-৯: **কুফর-এর ওপর সন্তুষ্ট থাকলে:** কোনো ব্যক্তি নিজের বা অপরের কুফর-কর্মের ওপর সন্তুষ্ট থাকলে বা অপরের কুফর-এর ওপর অটল থাকাকে কামনা-উৎসাহিত-সাহায্য করলে সে কাফের হয়ে যাবে।

খ] বাচনিক দিক থেকে ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের প্ররোচনায় কুফর ৯ ভাগে হতে পারে। মূলত বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে কর্ম ও বাক্য বা বচনে। কুফর/ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বিশ্বাস কারো মনে বদ্ধমূল হলে তার বাচনিক প্রকাশ সেরূপই লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

খ-১: নিজেকে কাফের বলে ঘোষণা দেওয়া বা কুফর প্রচার করা: কোনো ব্যক্তি নিজেকে কাফের বলে ঘোষণা দিলে অথবা জেনে বুঝে, এমন কি উপহাস ছলে কোনো কুফরমূলক বাক্য উচ্চারণ করলে সে সকল ইমামের ঐকমত্যে কাফের হয়ে যাবে। বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীসহ অপরাপর ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রাধান্যের কারণে বহু মুসলমান, যারা কিছু ইসলামী আমল ও আকিদা পোষণ করে, তারাও নিজেদের কাফের ঘোষণা না করলেও কুফর-বাক্য বেফাঁসে আবছার বলছেন। বিশেষত, রাজনীতির ময়দানে, মিডিয়ায়, নাটক, সিনেমায় ইসলাম, দাড়ি, টুপি, মুসলমানকে অমর্যাদা করার একটি শক্তিশালী ধারা কারো অজানা নয়। এখানে বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কুফর-বাক্য উল্লেখ করা হলো: দ্বীন হিসেবে ইসলামকে অচল, পুরাতন ও প্রাচীনপন্থী বলে বিশ্বাস ও প্রচার করা।

দ্বীনে ইসলামকে আধুনিকতা ও উন্নয়নের পরিপন্থী বলে বিশ্বাস ও প্রচার করা করা।

দ্বীনে ইসলামের আইন ও শরীয়ত সময়োপযোগী নয় মর্মে বিশ্বাস ও প্রচার করা।

দ্বীনে ইসলামের আইন ও শরীয়তকে ন্যায়সঙ্গত নয় বলে বিশ্বাস ও প্রচার করা।

ইসলামী শাস্তি বিধানকে অমানবিক ও মানবাধিকারের পরিপন্থী বলে বিশ্বাস ও প্রচার করা।

ইসলামিক আইনের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস ও প্রচার করে বহালের অব্যাহত চেষ্টা করা।

মানব রচিত বিধান ও আইনকে মানব রচিত বিধানের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া।

'হুকুম একমাত্র আল্লাহর' এই নির্দেশের মূলমর্ম না বুঝে পশ্চিমা মতবাদ ও নীতির অন্ধ অনুসরণ করা।

নারীদের প্রতি ইসলাম জুলুম করেছে মর্মে বিশ্বাস ও প্রচার করে নারী সমাজকে ইসলাম ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ও শত্রুভাবাপন্ন করে তোলা ।

পর্দাকে অস্বীকার ও তিরস্কার করে পালন না করা ও পালনে বাধা দেওয়া।

ইসলামী প্রতীক, যেমন: মিনার, মসজিদ, মিহরাব, মিম্বার, দাড়ি, টুপি ইত্যাদিকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা।

সুদকে হালাল বলে অংশ নেওয়া।

ইসলামের যাকাতভিত্তিক সামাজিক কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থার বিপরীতে পুঁজিবাদী [ক্যাপিটালিজম] কিংবা সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী [কমিউনিজম] অর্থব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতর বিশ্বাস করে মানুষের জন্য মুক্তির একমাত্র পন্থা মনে করা এবং সেই লক্ষ্যে কথা ও কাজের দ্বারা মেহনত করা।

ধর্মনিরপেক্ষতাসহ বিভিন্ন মতবাদকে ইসলামের বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস ও প্রচার করা।

মিরাস বণ্টনের ইসলামের নীতিকে কটাক্ষ ও অস্বীকার করা।

কথা ও কাজে ইসলামের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বা দুনিয়াবি ফায়দার জন্য মাজার গমন, ওরস পালন ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামকে বিকৃতভাবে [বেদয়াত] পালন করা।

নেতা বা নীতির অনুসরণের মাধ্যমে তাদেরকে পূজার বস্তুতে পরিণত করা এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাধররূপে বিশ্বাস করা ও প্রশংসা করা।

দুনিয়াবি নীতি, মত বা নেতৃত্ব-ব্যক্তিত্বকে ইসলামী আকিদা ও শরীয়তের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের মৌলবাদী-জঙ্গিবাদী-ব্যাকডেটেড-

www.pathagar.com

স্বাধীনতাবিরোধী ইত্যাদি অপবাদের দ্বারা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা।

কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক দ্বীনী শিক্ষাকে 'জঙ্গিবাদের ঘাঁটি' বলা, ঘৃণা করা এবং নির্মূল করা জন্য কথা বলা ও কাজ করা।

দ্বীনে ইসলামের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আকিদা, তাহজিব, তমদ্দুনকে হেয় বলে বিশ্বাস ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা নীতিকে এর ওপর প্রতিষ্ঠা করার সরকারি-বেসরকারি, ব্যক্তিগত/ সামষ্টিক নীতি/ পরিকল্পনা/ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

মানুষের মধ্যে দ্বীনে ইসলামের নানা কাল্পনিক ও মিথ্যা ত্রুটি তুলে ধরে ইসলামের বদলে অন্য মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকাশ্য ও গোপন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করা ও কথা বলা।

পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, স্বামীকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে, ইমামকে মুক্তাকিদের বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়া।

ইসলামবিরোধী অশ্লীল জীবনের দিকে ডাকা, কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ করা।[১২]

খ-২: আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ও রাসূল [সা]-এর বিরুদ্ধে কথা বলা ও গালমন্দ করা : আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা, রাসূল [সা] ও দ্বীনকে নিয়ে উপহাসমূলক কথা বলা বা গালমন্দ করা হলে সে ব্যক্তির কাফের বা ধর্মদ্রোহী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। একইভাবে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার আদেশ-নিষেধ, প্রতিশ্রুত বা সতর্ক বাণীকে নিয়ে কিংবা রাসূলের কথা ও কাজের [সুন্নাহ] ব্যাপারে উপহাস বা মন্দ কথা বললে সে অবশ্যই কাফের।[১৩] পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:

"যদি তোমরা তাদের জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, আমরা তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশাই করেছি। আপনি তাদের বলুন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও আয়াতগুলোকে নিয়ে উপহাস করছো? ছলনা করো না। এ কাজের মাধ্যমে তোমরা নিঃসন্দেহে ঈমান আনয়নের পর কুফরি করছো।" [সুরা তাওবা, আয়াত : ৬৫-৬৬]

খ-৩: আম্বিয়া [আ] গণকে গালি দেওয়া : যে ব্যক্তি কোনো নবীকে গালি দেয় অথবা খারাপ উপাধি দিয়ে অভিহিত বা দোষারোপ করে, তাহলে সে কাফের ও ধর্মদ্রোহী।

খ-৪: নবীজীর সহধর্মিণীদের গালি দেওয়া বা মন্দ বলা : নবীজীর সহধর্মিণীগণ মুসলামন তথা উম্মতের জননীস্বরূপ। পবিত্র কুরআনে তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ তাঁদের বিরুদ্ধে অপবাদ, পরিহাস ও কুৎসা রটালে সে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের ভাষ্য এবং পবিত্র সত্তার বিরোধিতাকারীরূপে কাফের সাব্যস্ত হবে।

খ-৫: ফেরেশতাগণকে গালি দেওয়া : ফেরেশতাগণ হলেন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার অতি সম্মানিত ও নিষ্পাপ সৃষ্টি। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অঙ্গ; তাদের গালি দেওয়া/ মন্দ বলা/উপহাস করা ঈমানোর স্পষ্ট কারণ।

খ-৬: পবিত্র কুরআনকে গালি দেওয়া : পবিত্র কুরআনসহ আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি সুধারণা ও বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অঙ্গ। পবিত্র কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার

www.pathagar.com

কালাম এবং অতি সত্য ও পবিত্র বাণী। একে উপহাস করা, গালি দেওয়া, মন্দ বা মিথ্যা বলা জঘন্যতম অপরাধ এবং কুফরের কারণ।

খ-৭: দ্বীন ইসলামকে গালি দেওয়া : দ্বীন ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ফলে দ্বীন ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে গালি দিলে বা উপহাস করলে বা মন্দ কথা বললে সে কাফের হয়ে যাবে।

খ-৮: সাহাবি [রা] গণকে গালি দেওয়া : সাহাবা [রা] গণের সততা, সাধুতা ও নিষ্ঠা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বহু দলিল দ্বারা প্রমাণিত। তাই সাহাবি [রা] গণকে উপহাস, গালি বা অপবাদ আরোপ করা হলে তা কুফর।

খ-৯: নবুওয়তের দাবি করা : রাসূল [সা] হলেন মহানবী, শেষনবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিজেকে নবী দাবি করা কিংবা নবী অপেক্ষা কোনো দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা কুফর।

গ] আমল বা কর্মগত দিক থেকে

ইসলামবিরোধী মতাদর্শের প্ররোচনায় আমল বা কর্মগত দিক থেকে যেসব কুফর করা হয়, তা ৫ ভাগে চিহ্নিত করা যায়।

গ-১: আল্লাহ তায়ালা, নবী ও দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ কর্ম : আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা, নবী-রাসূল ও দ্বীনের প্রতি কটাক্ষ ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ কর্ম, যেমন, কার্টুন, ব্যঙ্গ চিত্র আঁকা, ছড়া-কবিতা-গল্প রচনা করা, মূর্তি বা কাল্পনিক আকার দেওয়া, তুচ্ছ ও অসম্মান-অপমানজনকভাবে প্রদর্শন করা কুফর।

গ-২: আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে প্রভু/ইলাহ মান্য করে মাথা বা ব্যক্তিত্ব অবনত করা : আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মূর্তি/প্রতিমূর্তি, আদর্শ বা নীতির কাছে নিজের মাথা বা অস্তিত্ব অবনত করা এবং সেটাকে পালনকর্তা/ প্রভু/ আইনদাতা/ রিযকদাতা/ কল্যাণদাতা ইত্যাদি মনে করে আমল করা কুফর।

গ-৩: অমুসলমানদের ধর্মীয়/সাংস্কৃতিক পরিচয়বাহী পোশাক পরিধান, আচার-আচরণ করা : মুসলমান অন্য ধর্মের চিহ্ন বহন করলে তাদের অনুসরণ করা হয়। যেমন: ক্রুশ, সিঁদুর, পৈতা, গেরুয়া, টিপ, আল্পনা ইত্যাদি পরিধান এবং এসব শ্রেষ্ঠ বিবেচনায় নিজের জীবনে প্রয়োগ করা, তাদের মতো জীবন-যাপন-অঙ্গসজ্জা-অঙ্গভঙ্গি-আচার-আচরণ নিয়মিত পালন করা কুফর। তদুপরি, তৌহিদের খেলাফ চিহ্ন বা প্রতীক, যেমন: চন্দ্র, সূর্য, নিশানা, লগো, ইত্যাদিকে সম্মানের সঙ্গে শরীরে ধারণ করা এবং কপালে, গালে অঙ্কন করে প্রদর্শন করার একটি উগ্র রেওয়াজ চলছে। অনেকেই ঘরে বিভিন্ন মূর্তির ছবি সংরক্ষণ করছে এবং বলছে যে, এটা সৌন্দর্যের জন্য করা হচ্ছে। কিন্তু যে মূর্তি অপর ধর্ম পূজাকে করে সেটাকে কোনো মুসলমান নিজের ধরে সংরক্ষণ করলে সেটার অনুসরণ করা হয়, নচেৎ অসম্মান করা হয়। ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে কোনোটিই জরুরি নন। বরং মুশরিকদের উপকরণ সংরক্ষণ ও গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজের ঈমান ও আমলের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করা হয় না।[১৪]

গ-৪: দ্বীনের কোনো বিধানকে অস্বীকার করে আমল না করা : দ্বীনের সুস্পষ্ট বিধানসমূহকে অস্বীকার, উপহাস, অবজ্ঞা করে পরিত্যাগ করা এবং আমল না করা কুফর।

www.pathagar.com

গ-৫: **জাদু করা :** কুফরি-শিরকি বাক্য ব্যবহার করে জাদু করা, মানুষের ক্ষতির জন্য এরূপ করতেই থাকা, হাতের রেখা, গ্রহ, নক্ষত্রকে ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করা, সেজন্য তাবিজ-তুমার-রত্ন-পাথর পরিধান করা এবং এগুলো তকদির বদলায় মনে করা ও ভালো-মন্দ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত মর্মে তকদিরে বিশ্বাস না রাখা কুফর।

ঘ] বর্জন জাতীয় দিক থেকে

আমল ও আখলাকের ক্ষেত্রে ইসলামের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত কাজগুলোকে বর্জন করা কুফর। সেক্যুলারিস্টরা ধর্ম-কর্ম পালন করার ক্ষেত্রে উৎসাহ তো প্রদান করেই না, বরং সেগুলোকে বর্জন করতে প্ররোচিত করে। ধর্মকে মনে করে ব্যক্তিগত বিষয়। সমাজে, পরিবারে ও পেশা ক্ষেত্রে ধর্ম পালনকে অগ্রগতির প্রতিবন্ধক বা পশ্চাৎপদতা মনে করে। সমাজের ভয়ে এরা অনেক আমল বর্জন করে। যেমন: সভার প্রয়োজনে কেবল আজানের বিরতি দেয়, নামাজের বিরতি দেয় না এবং ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করে না। অন্যান্য বহু আমলও এভাবে বর্জন করার চেষ্টা করে।

৪.

উপরের আলোচনা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এগুলোর কয়েকটি বা সবগুলোই বাংলাদেশের মুসলিম প্রধান পরিবেশে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনৈতিক জীবনে চর্চা করা হচ্ছে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এদেশে কুফরমূলক কর্মকাণ্ডবৃদ্ধি পাচ্ছে কীভাবে? এক্ষেত্রে উত্তর হলো, ইসলাম বিরোধী মতবাদের প্রাধান্যের কারণে। এই মতবাদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য ও ক্ষতিকর হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা ইহজাগতিকতা, যা ক্রমে ক্রমে মানুষকে আস্তিক্যবাদ থেকে নাস্তিক্যবাদে ঠেলে দিতে দিতে কুফরের মধ্যে দাখিল করে। এখন প্রশ্ন হলো, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সমাজে কীভাবে প্রসার লাভ করছে? উত্তর হিসেবে আমরা কয়েকটি কারণ দেখতে পাই– পশ্চিমা দেশসমূহের মাধ্যমে। তাদের দেশের মতবাদ অনুন্নত দেশে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। বর্তমানে বিশ্বায়ন[১৫] প্রক্রিয়ায় বিশ্বের সকল দেশকেই ইউরোপ-আমেরিকার নীতি ও আদর্শ মানতে বাধ্য করা হচ্ছে।

ধর্মনিরপেক্ষ প্রশাসন-শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। উপনিবেশ আমলে যার সৃষ্টি এবং বর্তমানে সেটাই প্রবলভাবে বিকশিত।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মাধ্যমে।

মিডিয়ার মাধ্যমে। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির দ্বারা।

এনজিওচক্রের দ্বারা।[১৬]

বহুজাতিক কোম্পানি ব্যবসা নীতি ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা।[১৭]

পার্শ্ববর্তী দেশের জীবন ও সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের দ্বারা।

বিভিন্ন জাতীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক দিবস, যেমন: বাংলা নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্র জয়ন্তী, মেলা, পার্বণ ইত্যাদির ধর্মতাত্ত্বিক ব্যবহার, যেমন: দোয়া ইত্যাদির বদলে উৎসবমুখর করার মাধ্যমে।

চলচ্চিত্র ও টিভি সিরিয়াল নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

শিল্পী-সাহিত্যিক-কবি-সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে।

www.pathagar.com

দুনিয়মুখী ফ্যাশন, কসমেটিক ইত্যাদি ভোগ্যপণ্য সরবরাহকারীদের মাধ্যমে।
ইসলাম ও ধর্ম বা শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞানবিহীন মানুষের অন্ধ অনুকরণের বা দেখাদেখি পালন করার মাধ্যমে। দুঃখের বিষয়, সর্ব সময় বিধর্মীরা এসে ইসলামী সমাজে এসব করছে, এমন নয়। মুসলমানদের মধ্যে যারা দৃঢ়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে তারা এবং ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞরাই জেনে এবং না-জেনে এমন সব কাজ করে চলছে।

৫.

ইসলাম গ্রহণের আগে ইরানের পারসিকরা আগুনকে দেবতা-জ্ঞানে উপাসনা করত। ইসলাম-পূর্ব কালের অগ্নি-উপাসক ইরানিদের অধুনা-প্রায় বিলুপ্ত ধর্মের নাম ছিল জরাথুস্ট্রীয় ধর্ম। তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম ছিল জেন্দা-বেস্তা। সমগ্র ইরান বা পারস্য এবং পারসিক জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়টি পালিয়ে ভারতে চলে আসে। বোম্বাই নগরীতে তাদের ক্ষুদ্র একটি অংশ এখনও রয়েছে। নেহেরু-কন্যা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ছিলেন এমনই একজন অগ্নি-উপাসক পারসিক। একইভাবে, ইতিহাসে দেখা যায়, হাজার বছর আগে আর্য জাতি ভারত আক্রমণ করে এদেশ দখল করে। এই আর্য জাতির সঙ্গে ইরানের প্রাচীন অগ্নি-উপাসক এবং ইউরোপের কিছু কিছু জাতির সম্পর্ক রয়েছে। আর্যরা অগ্নি ও লৌহের ব্যবহার জানত। এবং আগুন প্রজ্বলিত করে যাগ-যজ্ঞ-পূজা করত। তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম বেদ। যাতে অগ্নি বা আগুনের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এক অর্থে আর্যরাও অগ্নি-উপাসক। তারা স্থানীয় ভারতীয়দের বেদ পড়তে দেয়নি। তবে তাদের অধীনস্থ রাখে বিভিন্ন আচার-আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে। আর্যঘেঁষা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ শ্রেণির বাইরে ভারতের অধিকাংশই নিম্নস্তরের হিন্দু। চতুর্বর্ণ প্রথায়[৮] সমাজ ও ধর্মের নিম্নতর স্তরে সাধারণদের অবস্থান। তারা ব্রাহ্মণ বর্ণিত অনুশাসন কোনো জিজ্ঞাসা ছাড়াই প্রতিপালন করে থাকে। এই হিন্দু ধর্ম নানাভাবে অগ্নি বা আগুনের পূজা করে। অগ্নিকে ঈশ্বর বা দেবতা জ্ঞান করে। তাদের ধর্মমতে, অরণ্যকে যে আগুন দহন করে তার নাম দাবানল। গৃহস্থের বাড়িতে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যে আগুন উপস্থিত তার নাম হোমাগ্নি। অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয়। সে অগ্নি নাম যোজক। বিবাহের পরে বধূকে নিয়ে স্বগৃহাভিমুখে গমনোদ্যত হয়ে, রথারূঢ় অবস্থায় বৃষচর্মে উপবেশন করার পর পর যে আগুন স্পর্শ করা হয়, তার নাম ধৃতি। শ্বশুরালয়ে তিনদিন ব্রহ্মচর্য পালন করার পর চতুর্থ দিবসে পুনরায় যজ্ঞ করে যে আগুনে আহুতি হয়, তার নাম শিখি। যোজক, ধৃতি ও শিখি অগ্নিসমূহের কোনো কর্তব্য-অপরাধ হলে তার প্রায়শ্চিত্তের সময় যে আগুন প্রজ্বলিত করে পূজার করা হয়, তার নাম বিধু। এসব যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণ করার সময় প্রজ্বলিত অগ্নি নাম মৃড়। যে আগুনে হিন্দু জীবনাবসান ঘটে, তার নাম চিতা।

বাংলাদেশে এখন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এনজিও ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সূচনায় অগ্নি প্রজ্বলন করা হচ্ছে। সাধারণত সূচনায় দোয়া, প্রার্থনা ও পূজা করার বিধান। সূচনার এই অগ্নিকে অগ্নিপ্রেমী উদ্যোক্তারা মধুর ভাষায় ডাকেন 'মঙ্গলপ্রদীপ' নামে। বিভীষিকাময় আগুনের মধ্যে তারা কী মঙ্গল পেলেন, সেটা অজানা এবং সেটাকে জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়ে কী মঙ্গল হাসিল করতে চান, সেটাও দুর্বোধ্য। অগ্নি-উপাসক প্রাচীন পারসিক বা বেদের অনুসারী আর্য হিন্দুদের ধর্ম মতে দাবানল, হোমাগ্নি, যোজক, ধৃতি, শিখি, বিধু, মৃড়, চিতা ইত্যাদি নামধারী

www.pathagar.com

আগুন-দেবতার পূজার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রগতিশীল/সেক্যুলার কর্তৃক প্রজ্বলিত 'মঙ্গলপ্রদীপ'-এর মিল-অমিল-সম্পর্কের বিষয়টিও মুসলমানদের আমাদের অজানা থাকার কথা নয়। সাধারণও কোনো 'লজিক' [যুক্তি] বা 'রিজন' [কার্যকারণ] ছাড়া কোনো কাজ করা হয় না। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অগ্নি-স্তব [বস্তুত পূজা] করার ক্ষেত্রে কি লজিক বা যুক্তি, রিজন বা কার্যকারণ রয়েছে, সেটা প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হওয়া দরকার। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিশেষ করে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অন্য ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্বাসী মানুষদের সতর্কতা জরুরি। দেখা-দেখি বা অভ্যাস বসে এটা-সেটা করা যায়। কিন্তু কিছু না জেনে-বুঝে যার-তার কাছে প্রার্থনা করা যায় না। সৃষ্ট বস্তুর কাছে মঙ্গল কামনা করা, নত মস্তক করা, করজোড়ে মিনতি প্রকাশ করা অর্থহীন কাজ। গুরুত্বপূর্ণ নানা অনুষ্ঠানের শুরুতেই এহেন অর্থহীন কাজের ব্যবস্থা করার হেতু কী? ক্রমশ এহেন অনুষ্ঠানাদি সর্বস্তরে প্রয়োগ ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা করার মানে কী? এহেন অনুষ্ঠানসমূহ সমাজের সর্বস্তরে দ্রুত প্রচার-প্রচার করার মতলব, মকসুদ ও কারণই বা কী?

অগ্নির আরেকটি ব্যাপক ব্যবহার দেখা যাচ্ছে মোমবাতির শিখা প্রজ্বলনের মাধ্যমে। শোক, প্রতিবাদ ইত্যাদি প্রকাশের সময় নারী-পুরুষের সম্মিলিত মিছিল করজোড়ে মোমবাতি ধারণ করে সেটার শিখাকে মস্তকের উপরে উঁচিয়ে মৌনব্রতে নগ্ন পদব্রাজকরূপে প্রদক্ষিণ করছে এবং পরিসমাপ্তিতে সকল মোমবাতির সমন্বিত শিখাকে একত্রে স্থাপন করে বিশাল অগ্নিমঞ্চ নির্মাণ করে নিজ নিজ আকুতি জানাচ্ছে। অগ্নিসাক্ষী করে বা অগ্নিমঞ্চ বানিয়ে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা তৌহিদের পরিপন্থী। এসব অগ্নি-আচারের সঙ্গে অগ্নিপূজক প্রাচীন পারসিক বা হিন্দু-আর্য সম্প্রদায়ের কোনো মিল থাকলেও মুসলমানদের দূরতম সম্পর্ক নেই। এসব আচরণ কে বা কাদের প্রতিনিধিত্ব করছে? এবং কারা কী উদ্দেশ্যে এমন সব তৎপরতার প্রকাশ-বিকাশ ঘটাচ্ছে, সেটাও বোধগম্য না হওয়ার কারণ নেই।

অগ্নিপ্রদীপ, অগ্নিসাক্ষী, অগ্নিমঞ্চ, প্রতীকচর্চার পথ ধরে অগ্নিময়তা সমাজ-মানুষের মধ্যে তীব্র গতিতে বিস্তৃতি লাভ করছে। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদদের কণ্ঠস্বর এখন অগ্নিকণ্ঠ। বাক্য অগ্নিময়। আচরণ অগ্নিমুখী। প্রতিপক্ষকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়ার অগ্নিতৎপরতা প্রকাশ্য। সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্নিঘেঁষানীতি রাজনীতি ও অর্থনীতিকেও আগুনে চিতায় ফেলে দিয়েছে। কিছু হলেই জ্বলছে আগুন। রাজনীতির মাঠ-ময়দান থেমে থেমে আগুনে আক্রান্ত। পোশাক শ্রমিকরা তাদের অধিকার পেতে গিয়ে অগ্নিকুণ্ডে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা দাবি আদায়ের জন্য অগ্নি-সদৃশ হয়ে ওঠছে। কথিত মঙ্গলপ্রদীপের আগুন সর্বত্র মঙ্গলের বদলে অমঙ্গলের আগুন জ্বালছে। পুরো দেশটাই আস্তে আস্তে রাবনের চিতায় পরিণত হচ্ছে।[১৯] এমন কি, সেই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পবিত্র কুরআন। বুলেটের অগ্নিবৃষ্টিতে অঙ্গার করা হয়েছে খুদ্দামুল কুরআন আলেম-ওলামা-মুসলিম জনতাকে। প্রকাশ্য আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়েছে ইসলামকে হিফাজত করার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ঈমানী চেতনাকে। নিজেদের অপরাধের দায় চাপানো হচ্ছে কুরআনপ্রেমীদের ওপর। কুরআন-নবী [সা]-এর মর্যাদা রক্ষায় আন্দোলনকারীরাই কি-না কুরআন পুড়িয়েছে? এমন অকল্পনীয় অভিযোগও তোলা হয়েছে।

www.pathagar.com

অগ্নি-উপাসকরা আগুনের পূজা করলেও আগুন নিয়ে খেলতে বলেনি। কিন্তু ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের সর্বত্র কারা আগুন নিয়ে খেলছে? আগুনের ধর্ম অনুযায়ী সে সব কিছুকেই পুড়িয়ে দেবে। তাকে পূজা করা হলেও আগুন স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না। আগুন নিয়ে খেলা করলেও ফলাফল একই হবে। আগুন নিজস্ব দাহ্য ধর্মানুযায়ী পুড়িয়ে দেবে সব কিছু। বাংলাদেশে এখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদসহ ইসলাম বিরোধী নানা আদর্শের সম্মিলিত নেতৃত্বে আগুনের পূজা আর আগুন নিয়ে খেলার দ্বিমুখী অগ্নিকাণ্ড চলছে। সর্বভুক অগ্নির লেলিহান ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না মানুষ, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি।

ইতিহাসের নানা স্তরে দেখা গেছে ধর্মের আগুন জ্বলে ওঠেছে। কখনও অধর্মের আগুন জ্বলে ওঠে। প্রায়ই প্রজ্বলিত হয় হিংসার আগুন। রাষ্ট্রবিপ্লবের আগুনও রুশ, ফরাসি, ইরানের বিপ্লবের কালে জ্বলে ওঠেছিল। ইতিহাসের পাতায় আবার কাউকে ধ্বংসের জন্য অপশক্তি কর্তৃক গৃহদাহ ও আত্মধ্বংসের আগুন জ্বেলে দিতে দেখা গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ এখন কোনো আগুনের মুখোমুখী?

যখন কোনো সম্ভাবনা ও আশাবাদ জ্বলে ওঠে তখন সেটাকে মাটি চাপা দিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করতে চায় প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপক্ষ। আজ যখন আরব জগতে ইনফেদাতার বৈপ্লবিক আলো জ্বলে ওঠেছে; বইছে জেসমিন বাতাস ও আরব বসন্তের দ্যোতনা, তখন সাম্রাজ্যবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ-প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি জ্বেলে দিয়েছে হিংসা, বিভেদ ও পুড়িয়ে মারা আগুন। সিনাই থেকে সেনেগাল, বেন গাজী থেকে বেনিন পর্যন্ত আরব বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণের বৈপ্লবিক প্রবাহকে পুড়িয়ে দিতে সিরিয়া, তিউনিসিয়া, লেবানন, লিবিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আত্মঘাতী-ভ্রাতৃঘাতী আগুন। একদিকে বিপ্লব আর অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিবিপ্লবের আগুনে জ্বলছে আরব দুনিয়া।

বাংলাদেশ জ্বলছে কোন আগুনে? জনতার সম্মতিতে গণতন্ত্রের ধারায় ইসলামী জনতার উত্থানকে থামাতে ষড়যন্ত্র ও হিংসার আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চলছে ইসলামী আদর্শ, নেতৃত্ব ও সংগঠনকে। ব্যাপক ইসলামিক ধর্ম ও সংস্কৃতির হিফাজতের অরাজনৈতিক আন্দোলনকেও অগ্নিদাপটে পুড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে। একদিকে লেলিহান আগুন আর অন্য দিকে মঙ্গলপ্রদীপ ও মোমের আগুনে ভেতর থেকে পুড়ানো হচ্ছে ঈমান, আকিদা, তৌহিদ। এ এক প্রচণ্ড সঙ্কুল পরিস্থিতি। ভেতরের আর বাইরের আগুনের দ্বারা নির্মিত সামগ্রিক চিতা। কিন্তু চিতায় ব্যক্তির মৃত্যু হলেও জাতির মৃত্যু হয় না। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তো আগুন কিছুই করতে পারে না। ইসলাম মুসলমানদের আগুনকে পূজা করতে বলে না; আগুন নিয়ে খেলতেও নিদের্শ দেয় না। অতএব আগুনে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো ভয় নেই। ভয় তাদের, যারা পূজায় ও খেলায় আগুন দেবতাকে নিয়ে আছে, তাদের। সাপের হাতেই যেমন সাপুড়ের মৃত্যু হয়; আগুনেই অগ্নিপন্থীদের বিনাশ হবে। চারদিকে আগুন, আগুন আর আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিধারীরা নিজেদের দগ্ধতার কালকে ঠেকাতে পারবে না। আগুনের দাহ্য করার সক্ষমতা ও স্বধর্মের কাছেই তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর মুসলমানদেরকে অতি সতর্কতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদসহ নানা কুফর/ জাহিলিয়াত/ তাগুত-সৃষ্ট আগুন এবং অপচেষ্টার মোকাবেলা করে উম্মাহকে শান্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে ঈমান ও আকিদা নিয়ে সম্মানজনকভাবে বাঁচাতে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকতে হবে।

www.pathagar.com

৬.

উপসংহারে আমরা একটি প্রশ্নের মীমাংসা করবো। তা হলো, মুসলমানরা কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ/সেক্যুলারিজম/নাস্তিক্যবাদের বিরোধিতাতেই ব্যস্ত থাকবেন? নিজেরা কিছুই উপস্থাপন করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন। আর কি করবেন, সেটা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামের ইতিহাসে উজ্জ্বলভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কেবল কাউকে বাধা দেওয়াই ইসলামে মুসলমানদের কাজ বলা হয় নি, নিজের শ্রেষ্ঠ বিষয় তুলে ধরতেই বলা হয়েছে। আরও সহজভাবে বললে, পবিত্র কুরআন 'আমর বিল মারূফ' ও 'নেহি আনিল মুনকার', দুটি কাজকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছে। এ পর্যায়ে মানবরচিত তথা কুফর/ জাহিলিয়াত/ তাগুতভিত্তিক মতবাদের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হলেই উপরে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্র বা রাজনীতি কখনই ক্রিশ্চান ধর্মীয় বোধের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। খ্রিস্টান দলিল অনুযায়ী, জেসাস বলেছিলেন, "তাঁর রাজ্য এ জগতের বিষয় নয়।"[২০] শত শত বছর ধরে উদ্বাস্তু জীবন-যাপনকালে ইহুদিরা নীতিগতভাবে রাজনৈতিক সংশ্রব থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধরা ধর্ম ও রাজনীতিকে দার্শনিকভাবে এক সাথে ভাবতে পারে নি। তাদের ধর্মতত্ত্বে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের ধারণাই অনুপস্থিত।[২১] এখন অবশ্য অবস্থা ভিন্নতর।[২২]

কিন্তু মুসলিমদের কাছে রাষ্ট্র ও রাজনীতি গৌণ বিষয় নয়। বরং এটাই তাদের কাছে ধর্মীয় অনুসন্ধানের প্রধান ক্ষেত্র। ইসলামে নাযাত বা মোক্ষলাভের অর্থ কেবলমাত্র পাপের মোচন নয় কিংবা দুনিয়াবি কল্যাণ নয়; বরং ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা; যেখানে ব্যক্তি অধিকতর সহজভাবে তার সমগ্র সত্তার অস্তিত্ব একক সৃষ্টিকর্তার কাছে সমর্পণ করতে পারবে এবং নিজস্ব পূর্ণতা ও সার্থকতা অর্জন করতে পারবে। সুতরাং ইসলামে রাজনীতিকে দেখতে পাওয়া গেছে পরিপূর্ণ অবয়বে ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে এবং গোটা বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্রমাগত রাজনৈতিক প্রয়াস বিশ্বের নানা স্থানেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় চালানো হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে ইসলামের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ইউরোপীয় আগ্রাসন সর্বক্ষেত্রে এক রকম ছিল না। তবে সে আক্রমণ ছিল পরিপূর্ণ ও কার্যকর। উপমহাদেশের উদাহরণে দেখা যায় যে, ইসলামী জগতের ওপর ইউরোপীয় আগ্রাসনের সূচনা হয়েছিল মুঘল ভারতে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ব্রিটিশরা উপমহাদেশে শেকড় গাড়ে এবং সেই সময় 'বাংলার লুণ্ঠন প্রক্রিয়া' নামে পরিচিত।[২৩] কেননা, এর ফলে স্থানীয় শিল্পক্ষেত্রগুলো স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর কৃষিখাতকে এমনভাবে বদলে দেওয়া হয় যে, বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের মানুষ নিজেদের জন্য উৎপাদন করতে পারে নি; তারা হয়ে ওঠেছিল পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির কাঁচামালের সরবরাহকারক। বাংলার তথা উপমহাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে উপনিবেশিক দখলদাররা ১৭৯৩ সালে খ্রিস্টান মিশনারিদের রাষ্ট্র ও সমাজের সমর্থনে মাঠে নামায়। চলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এরই ধারাবাহিকতায় উপনিবেশিক দখলদারগণ রাজনৈতিক প্রাধান্যের সূচনা করে। ১৭৯৮ এবং ১৮১৮ সময়কালে চুক্তি বা সামরিক বিজয়ের

www.pathagar.com

মাধ্যমে সিন্ধু উপত্যকাসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ দখলদারিত্ব কায়েম হয়। উল্লেখ্য, আকবরের আমল থেকে মুঘল সাম্রাজ্যে একটি অবক্ষয়ের সূচনা হয়, যার ছিদ্রপথেই হিন্দু-মারাঠা শক্তির বিকাশ ঘটে এবং উপনিবেশিক শক্তির হস্তক্ষেপের পথ সুগম হয়। আওরঙ্গজেব সর্বশক্তি দিয়ে এসব আগ্রাসীদের প্রতিহত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কোনো মুঘল রাজন্যই সেই ধস থামাতে সফল হননি।[২৪]

অপরপক্ষে, ইউরোপের আরেক শক্তিশালী ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তিও বসে না থেকে তৎকালের মুসলিম জগতের নানা স্থানে হানা দিতে থাকে। ১৭৯৮ সালে ফরাসি নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সুয়েজে একটি ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিসর দখল করে নেয়। দখলকৃত মিসর থেকে নেপোলিয়ন মুসলিম পণ্ডিতদের একটি দল, আধুনিক সাহিত্যসমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি, একটি অতি-অগ্রসর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, আরবি হরফসহ একখানা মুদ্রণযন্ত্র প্যারিসে নিয়ে আসেন। মুসলিমদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ ইউরোপের উন্নয়নে ও আধুনিকায়নে কাজে লাগানো হয়। পরবর্তীতে মিসর ও সিরিয়া আক্রমণ শেষে ফরাসিরা নেপোলিয়নের নেতৃত্বে রাশিয়ার সঙ্গে একজোট হয়ে ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্য ও উপসারগীয় অঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ মুসলিম জনপদসমূহে ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব বাড়াতে থাকে। এভাবেই ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিগুলো একের পর এক ইসলামী দেশকে উপনিবেশিকে পরিণত করে। ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া দখল করে ফ্রান্স। ১৮৩৯ সালে এডেনসহ ইয়ামেনের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে ব্রিটেন। ১৮৮১ সালে অধিকৃত হয় তিউনিসিয়া। ১৮৮২ সালে সম্পূর্ণ মিশর। ১৮৮৯ সালে সুদান। ১৯১২ সালে লিবিয়া ও মরোক্কো। ১৯১৫ সালে স্বাক্ষরিত সাইকস-পিকো চুক্তি অনুযায়ী ক্ষয়িষ্ণু ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিশাল ইসলামী জগৎকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ভাগাভাগি করে নেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স যথারীতি সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ইরাক, উত্তর এবং পশ্চিম আফ্রিকা, জর্ডান, মধ্যপ্রাচ্য আর পারস্য অঞ্চল দখল করে সেখানে 'প্রটেক্টরেট' এবং 'ম্যান্ডেট' স্থাপন করে এবং শুরু হয় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ।

ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিসমূহের দ্বারা ইসলামী জগৎকে তছনছ করা এবং হালুয়া-রুটির মতো ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে ইতিহাস দেখেছে 'চরম বিদ্বেষমূলক কার্যক্রম' রূপে। কেননা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কূটনৈতিক ধূর্ততায় ইউরোপীয় শক্তিগুলো ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের আরব প্রদেশগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতি তো তারা রাখেই নি, বরং ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল তুরস্ককে পর্যন্ত গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল। ওসমানিয়াদের মূলভূতি তুরস্কে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক [১৮৮১-১৯৩৮] ইসলামের সঙ্গে বৈরী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইউরোপের-অনুগত একটি রাষ্ট্র গঠন করে। অপর ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি রাশিয়া ওসমানিয়া শাসনাধীন বলকান এলাকা তথা বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি এবং মধ্য এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ যেমন সমরকন্দ, বোখারা, তাজাকিস্তান, কাজাকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান দখল করে নেয়।

উল্লেখ্য, খিলাফাতে রাশেদা, বানু উমাইয়া ও বানুল আব্বাস খিলাফাতের পর ওসমানিয়া খিলাফাতই ছিল দুনিয়ার মুসলিমদের শক্তির কেন্দ্র। ইউরোপের বস্তুবাদী চিন্তাধারার অনুসারী

www.pathagar.com

মোস্তাফা কামাল পাশা খিলাফাত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করেই ক্ষান্ত হননি, তুর্কির ভূখণ্ডে ইসলামের কবর রচনা করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, সবই তিনি করেন। তুর্কিকে একটি সেক্যুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সম্রাজ্যবাদের প্রচার প্রসারের পথ উন্মুক্ত করে দেন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তুলে দেন। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেন। পর্দা প্রথার বিলোপ সাধন করেন। ইসলামী আইনের স্থলে 'সুইস কোড'[২৫] প্রবর্তন করেন। ইসলামী সংস্কৃতির বিলোপ সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। উপনিবেশিক-সাম্রাজ্যবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সহযোগী হয়ে এই সময় কেবল তুর্কিতেই নয়, অন্যান্য মুসলিম দেশেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজবাদে বিশ্বাসী বহু লোক গড়ে ওঠে। এমনকি, এই উপমহাদেশের মুসলিমদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ইসলাম বিদ্বেষী লোক বের হতে থাকে। এই সময় 'নিগার' নামক একটি মাসিক পত্রিকা জোরে সোরে নাস্তিকতাবাদ প্রচার করতে থাকে।[২৬]

আধুনিক কালে ইউরোপীয় উপনিবেশের দখলভুক্ত দেশের কোনো কোনটিকে পরে স্বাধীনতা দেওয়া হলেও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিকসহ সর্বাত্মক প্রভাব সেসব দেশের রাষ্ট্রকাঠামো, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, আইন, শিক্ষা ও জনগণের ওপর বজায় রেখেছে।[২৭] তেল, জাতীয় সম্পদ, সুয়েজ খাল ইত্যাদি ভোগ-দখল অব্যাহত রেখেছিল। ইউরোপীয়-উপনিবেশিক উত্তরাধিকার প্রায়-সর্বক্ষেত্রেই অধিকৃত দেশসমূহে গভীর সঙ্কট, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তিক্ত-বিরোধ রেখে গেছে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা উপমহাদেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় রেখে যায় তাদের বশংবদ শ্রেণি, কাশ্মীর সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি। ১৯৪৮ সালে ইউরোপীয় উপনিবেশিক জোটের কারণেই আদিবাসী আরবরা জায়নবাদী ইহুদিদের কাছে তাদের আবাসভূমি হারিয়ে বসে। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি পরে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহায়তায় জোরপূর্বক ইহুদি-সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা করে। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হাতে মুসলিম বিশ্বের অব্যাহতভাবে অপমানিত, নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার এমন আরও বহু জ্বলন্ত প্রমাণ বিদ্যমান এবং যা হয়েছে মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে সেক্যুলার নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে।

আধুনিককালে ইসলামী জগৎকে গ্রাস করা বা উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে দখল-লুণ্ঠন করার বিষয়ে মুসলিম সমাজেই একদল বশংবদের দেখা পাওয়া যায়। এটা ঠিক যে, ভেতর থেকে দালাল-সহযোগী না পেলে মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বিশাল ইসলামী দুনিয়াকে কব্জা করা ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তিসমূহের পক্ষে খুব সহজ হতো না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইরানি শিয়া বুদ্ধিজীবী মুলকুম খান [১৮৩৩-১৯০৮] এবং আকা খান কিরমানি [১৮৫৩-৯৬] ইরানিদের প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি গ্রহণ এবং সেক্যুলার রীতিনীতি বেছে নিয়ে ইসলামী শরীয়াহ বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবং এই পাশ্চাত্য-অনুসরণকেই প্রগতি ও উন্নয়নের একমাত্র পথ বলে বিবেচনা করে ছিলেন। মিসরের রিফাহ আল তাহতাওয়ি [১৮০১-৭৩] ইউরোপীয় অনুকরণে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। প্যারিসের সব কিছুকেই পছন্দ করতেন তিনি। মিসরকে সাহসের সঙ্গে ইউরোপের অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন তিনি। ভারতের সৈয়দ আহমদ খান [১৮১৭-৯৮] ইসলামকে আধুনিক পশ্চিমা উদার নৈতিকতাবাদের

www.pathagar.com

সমান্তরালে পরিচালনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তিনি মুসলিম সমাজের সঙ্গে পশ্চিমের মৈত্রী গড়তে চেয়েছিলেন।

নিজ নিজ এলাকায় উপনিবেশিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই কোনো কোনো নাম-মাত্র মুসলিম শাসক স্বেচ্ছায় ইউরোপের অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। স্পেনের দুর্বল শাসকদের কথা বাদ দিলেও এক্ষেত্রে ওসমানিয়া সালতানাতের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ ১৮২৬ সালে ইসলামী সাম্রাজ্যের শক্তিস্তম্ভ 'জানেসারি'[২৮] সেনাবাহিনীকে বিলুপ্ত করে ইউরোপীয় ধাঁচের পেশাদার সৈন্যদল গড়তে প্রয়াসী হন। ইসলামিক-আদর্শিক জানিসারিদের বদলে নতুন সৈন্যদল বেতনভুক কর্মচারিতে রূপান্তরিত হয়। ইসলামী সালতানাতের স্বার্থে জীবনবাজি রেখে লড়তেও ব্যর্থ হয়। ফলে পরবর্তীতে তুরস্কের ওসমানিয়া সালতানাতের সেনাবাহিনী যুদ্ধে মার খেতে থাকে। এবং সুবিশাল ওসমানিয়া সাম্রাজ্য পাশ্চাত্যে অন্ধ অনুকরণের জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মিসরের পাশা মোহাম্মদ আলী [১৭৬৯-১৮৪৯] ওসমানিয়া সাম্রাজ্য থেকে নিজে বিযুক্ত করে পশ্চিমের সঙ্গে মিশে যেতে সচেষ্ট হয়। দেশকে সেক্যুলার করার জন্য তিনি ধর্মীয় প্রয়োজনে প্রদত্ত জমি-জমা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং পরিকল্পিতভাবে ওলামা ও ইসলামী স্কলারদের ক্ষমতাহীন করে তোলেন। মুহাম্মদ আলীর পৌত্র ইসমায়েল পাশা [১৮০৩-৯৫] পশ্চিমের ধাঁচে নগর-বন্দর গঠন, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ নির্মাণ ও ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির নানা দিক বাস্তবায়নের নামে হাজার হাজার বছরে পুরাতন মিসরীয় সভ্যতার মধ্যে ভাঙন ডেকে আনেন। তার অতি উচ্চাভিলাষী ও জনবিচ্ছিন্ন কর্মসূচি মিসরকে দেউলিয়া করে দেয়; দেশ বৈদেশিক ঋণের চাপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এমনই অবস্থায় ইউরোপীয় শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার নামে ১৮৮২ সালে মিসরে সামরিক দখলদারি প্রতিষ্ঠা করে ব্রিটেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী দুনিয়ার যারা অন্ধভাবে পশ্চিমা রীতি, নীতি, পদ্ধতি ও দর্শনকে অনুসরণ করে তথাকথিত আধুনিক হতে চেয়েছিল, তারা পরিণামে নিজের দেশ ও জনগণকে উপনিবেশের দাসে পরিণত হওয়ার পথই রচনা করে দিয়েছিলেন। সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে ইরানের শাহ বা সাদ্দাম হোসেন ইসলাম থেকে নিজেদের বিযুক্ত করে পশ্চিমের আধুনিকতা থেকে শক্তি নিয়ে পশ্চিমের সঙ্গে মিত্রতা ও লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়ে ছিলেন। এবং অবশেষে পশ্চিমের কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়ে সকরুণ পরিণতি ভোগ করেছেন।

৭.

মানবরচিত মতবাদের বিরুদ্ধে ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক চিন্তার ভিত্তিতে সমাজের ঐতিহ্য ও বুনিয়াদকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর ও বিকশিত করার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনীতির চর্চাও এ পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্ধ পশ্চিমানুসরণ, সামরিক প্রযুক্তি, বাহ্যিক চাকচিক্য এবং পশ্চিমের মতবাদ ও আদর্শকে নিয়ে উন্নয়নের বদলে উপনিবেশিক ফাঁস এসে হাজির হওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণকারীদের অন্যতম হলেন ইরানি রাজনৈতিক কর্মী জামালউদ্দিন [১৮৩৯-৯৭], যিনি নিজেকে আল-আফগানি বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্ভবত তার ধারণা ছিল ইরানি শিয়ার চেয়ে বরং আফগান সুন্নি হিসেবে মুসলিম বিশ্বে অনেক বেশি শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন তিনি। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ

www.pathagar.com

উপনিবেশিক দখলদারদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহের সময় তিনি ভারতে অবস্থান করেছিলেন। আরব, মিসর, তুরস্ক, রাশিয়া কিংবা ইউরোপের যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি পশ্চিমের সর্বব্যাপী ক্ষমতার আঁচ পেয়েছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে, অচিরেই তা মুসলিম বিশ্বের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং ব্যাপক ধ্বংস ডেকে আনবে। মুসলিস জগতে পাশ্চাত্য ধারার জীবনাদর্শের অগভীর বিষয়বস্তুকে অনুসরণের বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি এবং ইসলামী বিশ্বের জনগণের প্রতি ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে একাত্ম হওয়ার আহ্বানও জানিয়ে ছিলেন। তিনি মনে করেন, মুসলিমদের অবশ্যই নিজের বিশ্বাস ও আদর্শের আঙিকে নতুন বিশ্বের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিগত সংস্কৃতির সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে। তার মতে, নতুন দিনের সন্ধানে মুসলিমদের অবশ্যই বিশ্বাসী বিবেক ও স্বাধীন যুক্তির ব্যবহার করতে হবে, যেমনটি পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ [সা] নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, পবিত্র কুরআনের প্রতিশ্রুতি হলো, আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণকারী কোনো সমাজ ব্যর্থ হতে পারে না। ইসলামের ইতিহাসেও এর সত্যতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। বারবার, যখনই বিপদ নেমে এসেছে, ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছে। ধর্মকে নতুন ও বিরূপ পরিস্থিতিতে বাঙময় করে তুলেছে এবং উম্মাহ[২৯] সে সময় কেবল পুনরুজ্জীবিত হয়েই ওঠেনি বরং সাধারণভাবে আরও ব্যাপক সাঁফল্য ও সম্ভাবনার পথে অগ্রসর হয়েছে। আর এভাবেই সেক্যুলার, ঈশ্বরহীন নাস্তিক্যবাদ ও পাশ্চাত্যের প্রাধান্য ইসলামী জগতে আঘাতপ্রাপ্ত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে স্থায়ী আসন লাভে অক্ষম হয়েছে।

আল আফগানির বন্ধু ও সহকর্মী মিসরীয় পণ্ডিত মুহাম্মাদ আবদু [১৮৪৯-১৯০৫] ছিলেন অধিকতর গভীর এবং পরিমিতি বোধসম্পন্ন চিন্তাবিদ। তার বিশ্বাস ছিল, 'বিপ্লবের আগে শিক্ষাই প্রকৃত সমাধান।' স্বদেশ মিশরে ব্রিটিশ দখলদারিত্বে চরম আঘাত পেয়েছিলেন তিনি; তারপরেও পশ্চিমা বিজ্ঞান ও দর্শনের ওপর প্রচুর পড়াশোনা করেছেন তিনি। স্বীয় প্রজ্ঞা থেকে তিনি মনে করতেন যে, পশ্চিমের রাজনৈতিক, আইনসংক্রান্ত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মিসরের মতো গভীরভাবে ধর্মভিত্তিক দেশে পাইকারি হারে রোপণ করা সম্ভব হবে না। এ কারণে তিনি চাইতেন যে, আধুনিক আইনগত এবং সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহকে সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত ইসলামী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে এমনভাবে সংশ্লিষ্ট করা আবশ্যক, যেন লোকে পার্থক্যটি বুঝতে পারে এবং শ্রেষ্ঠতম বিকল্প হিসেবে ইসলামের অনুসরণ অব্যাহত রাখে। মুহাম্মাদ আবদুর মতে, যে সমাজের মানুষ আইন বুঝতে পারে না, কার্যত সেটা আইনবিহীন দেশে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ, শুরাহ [পরামর্শ]-এর ইসলামী নীতি মুসলিমদের গণতন্ত্র বুঝতে ও চর্চা করতে সাহায্য করতে পারে। এ কারণে তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান পাঠ করতে বলেছেন, যাতে তারা ইসলামী প্রেক্ষিতে মুসলিমদের আধুনিক বিশ্বে প্রবেশে সাহায্য করতে পারে; এবং পুরো বিষয়টিকেই নিজেদের কাছে অর্থবহ করতে পারে। এ কারণে তিনি বিদ্যমান শরীয়াহকে হালনাগাদ করে তুলতে চেয়েছেন।

মুহাম্মদ আবদু এবং তার কনিষ্ঠ সহযোগী সাংবাদিক রশিদ রিদা [১৮৬৫-১৯৩৫] জানতেন, পুরো কাজটিই দীর্ঘ এবং প্রক্রিয়াটি জটিল। একই সঙ্গে রিদা মুসলিম পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমবর্ধমান হারে সেক্যুলারিজমে দাখিল করায় শঙ্কিত বোধ করেছিলেন। রিদা মনে করেন, এর

www.pathagar.com

ফলে উম্মাহ আরও দুর্বল হয়ে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। মিসরের 'সালাফিয়া'[৩০] আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রিদাই হচ্ছেন আধুনিক কালের অন্যতম প্রধান মুসলিম পণ্ডিত, যিনি সম্পূর্ণ আধুনিক অথচ বিশুদ্ধ শরীয়াহভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলেছেন। তিনি এমন একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যেখানে ছাত্ররা ফিকহ[৩১] শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন, সমাজবিজ্ঞান, বিশ্ব ইতিহাস, ধর্মের বিজ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা এবং আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠতে পারবে। এর ফলে প্রকৃত আধুনিক প্রেক্ষিতে ইসলামী জুরসপ্রুডেন্স বা আইনশাস্ত্র উন্নতি লাভ করবে, যা পূর্ব ও পশ্চিমের ঐতিহ্যকে একসূত্রে গাঁথবে আর কৃষিভিত্তিক আইন ও ইসলামী শরীয়াহকে পাশ্চাত্যে বিকশিত নতুন ধরনের সমাজের ওপর শ্রেষ্ঠতররূপে স্থাপন করবে।

লক্ষ্যণীয় যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষেত্রের মতোই পশ্চিমের উপনিবেশিক শক্তিসমূহ ধর্মক্ষেত্রেও মুসলিমদের এজেন্ডা ঠিক করে দিচ্ছিল। ফলে ইসলামের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় উপনিবেশিকতাবাদীদের সমালোচনার উত্তর দেওয়ার দরকার ছিল। এই অবস্থায় অবিভক্ত ভারতের কবি-দার্শনিক মুহাম্মাদ ইকবাল [১৮৭৬-১৯৩৮] যিনি নিজে আধুনিক শিক্ষিত হলেও পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় ইসলামের দার্শনিক শক্তিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন, তিনি তার একাধিক রচনায় বলেন:

"ইসলাম যে কোনো পশ্চিমা ব্যবস্থার মতোই যুক্তিভিত্তিক। প্রকৃতপক্ষে, এটা প্রচলিত অন্যসব কনফেশনাল ধর্মবিশ্বাসের মাঝে সবচেয়ে যৌক্তিক ও প্রাগ্রসর। ইসলামের কঠোর একেশ্বরবাদীতা মানবজাতিকে কিংবদন্তী হতে মুক্তি দিয়েছে আর কুরআন মুসলিমদের তাগিদ দিয়েছে গভীরভাবে প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য; পর্যবেক্ষণের ফল নিয়ে চিন্তা করতে বলেছে আর কর্মকাণ্ডকে অব্যাহত পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করতে বলেছে।

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিকতার জন্মদানকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক চেতনা আসলে ইসলাম থেকেই উদ্ভূত। ইকবালের মতে:

"পশ্চিমের সেক্যুলার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিত্বের ধারণাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বহু ঈশ্বরবাদী হয়ে আশঙ্কাজনকভাবে অশুভ রূপ লাভ করে। পরিণামে পাশ্চাত্য শেষ পর্যন্ত আপন ধ্বংসকেই ডেকে আনবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোকে এ কথা উপলব্ধি করা কঠিন কিছু নয়, যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বজাত যুদ্ধসমূহকে 'ইউরোপের সম্মিলিত আত্মহত্যা' হিসেবে দেখা হয়।"[৩২]

সুতরাং মুমিন-মুসলিমদের[৩৩] জগৎ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন-ধ্যানে মগ্ন হয়ে নয়, বরং মানবজীবনে ও সমাজে শরীয়ার বাস্তব ও বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদী আদর্শসমূহকে বাস্তবায়িত করতে পারবে, এমন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে জীবনের ঐশ্বরিক মাত্রা ও কল্যাণ অর্জন করার এক গুরুত্বপূর্ণ মিশন রয়েছে। আর এই বাস্তবতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র ও রাজনীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য। যা বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায় থেকে অ্যাক্টিভিস্ট বা অংশগ্রহণকারী স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। চিন্তার জায়গা থেকে কর্মের জগৎ পর্যন্ত প্রসারিত।

মিসরের তরুণ স্কুল শিক্ষক হাসান আল বান্না [১৯০৬-৪৯] সমকালীন আধুনিক আরব বিশ্বে ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনকে বাস্তবায়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, যা ইসলামের আধুনিক রাজনৈতিক ধারণাকে যুক্তিনিষ্ঠভাবে

www.pathagar.com

জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। 'দ্য সোসাইটি অব মুসলিম ব্রাদার্স' গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এক গণআন্দোলনের রূপ নেয় এবং ইসলামের ভিত্তিতে সেটাই ছিল সে অঞ্চলে একমাত্র আদর্শবাদ, যা সেই সময় আরব সমাজের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ইসলামিক বিকল্পরূপে আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল। আল বান্না জানতেন, মুসলিমদের জন্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে। এবং সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও যুগোপযোগীভাবে সংস্কার করতে হবে। তিনি মনে করতেন, ইসলামের যে কোনো সংস্কার কাঠামোগত ও আধ্যাত্মিক– উভয় ক্ষেত্রেই হতে হবে এবং সেটা হতে হবে অবশ্যই ও একমাত্রই কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে। আল বান্না জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইসলাম সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থা বা ধর্মকে ব্যক্তি পর্যায়ে সীমিত রাখা যাবে না; ধর্মনিরপেক্ষ করা যাবে না এবং পাশ্চাত্য ধর্মকে সীমিত রাখার যে চেষ্টা করেছে খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপারে, ইসলামে তেমনটি করার কোনো সুযোগ নেই। বান্নার সোসাইটি নতুন যুগের চেতনার উপযোগী বিশ্লেষণে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে; চেষ্টা করেছে ইসলামী জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার এবং সামগ্রিক মানব মর্যাদা ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের। তারা সামাজিক ন্যায়বিচারের বিকাশ, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং মুসলিমদের জমি বিদেশি আধিপত্যের কবল থেকে উদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের মতে, উপনিবেশবাদীদের অধীনে মুসলিমরা হয়ে পড়েছিল উন্মূল। যতদিন তারা অন্যকে অনুসরণ করে চলবে, ততদিন পর্যন্তই তারা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিকসহ কোনো ক্ষেত্রেই প্রকৃত স্বাধীনতা পাবে না। ব্রাদার ও সিস্টারদের আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা আর কুরআন অনুযায়ী জীবন-যাপনের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি আল বান্না স্কুল নির্মাণ করেছেন; আধুনিক-ইসলামিক স্কাউট আন্দোলনের জন্ম দিয়েছেন; শ্রমিকদের জন্য নৈশ স্কুল আর মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য টিউটোরিয়াল কোচিং-এর ব্যবস্থা করে সরকারি-বেসরকারি স্তরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিয়ে মুসলিম সমাজকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। দ্য ব্রাদার গ্রামাঞ্চলে ক্লিনিক এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে; কারখানা নির্মাণ করেছে, যেখানে মুসলিমরা সরকারি খাতের তুলনায় বেশি হারে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা, স্বাস্থ্য বীমা এবং ছুটি পেতো। তারা মুসলিমদের অধিকার রক্ষায় সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে আধুনিক শ্রম আইন শিক্ষা দিয়েছে।

একই রকম চিন্তাসূত্র লক্ষ্য করা যায় মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী চিন্তক মিসরের সাইয়েদ কুতুবের [১৯০৬-৬৬] মধ্যে। ধর্মনিরপেক্ষক-জাতীয়তাবাদী জামাল আব্দুল নাসেরের কারাগারে বন্দি হয়ে নির্যাতিত ও ফাঁসিতে শহীদ হওয়ার সময়ও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলে যান যে, ধার্মিক ব্যক্তির পক্ষে সেক্যুলার সমাজে নীরবে বসবাস করা সম্ভব নয়। ইসলামী জনতার ওপর প্রবল নিপীড়ন ও ধর্মকে প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দেওয়ার লক্ষ্যে পরিচালিত নাসেরের অপকর্ম পর্যবেক্ষণ করে তিনি এর মাঝে জাহিলিয়াহর সকল বৈশিষ্ট শনাক্ত করেন; যাকে তিনি ধর্ম-বিশ্বাসের চিরন্তন-প্রতিপক্ষ ও বর্বরতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, এর বিরোধিতায় পয়গম্বর মুহাম্মাদ [সা]-এর অনুসরণে মুসলিমদের আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।[৩৪] উল্লেখ্য, মিসরের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ইসলামীপন্থিরা ভোটে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসে মোহাম্মাদ মুরসির নেতৃত্বে। কিন্তু এক বছরও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। মিসরে যা হয়েছে, তুরস্ক, আলজেরিয়ায় বা অন্যান্য মুসলিম দেশেও তা-ই হয়েছে। কিছু ইসলামী আইন

www.pathagar.com

ও নীতি বাস্তবায়িত করতে গেলে মুরসির সরকার ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পশ্চিমা জগৎ মুরসি বিরোধিতায় যোগ দেয় এবং সেনাবাহিনীকে উস্কে ক্ষমতা দখল করে। গণতন্ত্রের নামধারীরা এভাবেই মুসলিম বিশ্বে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুৎ করতে পিছ পা হয় না। অতএব এদের গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থে শুধু তাদের জন্য, মুসলমানদের জন্য নয়।[৩৫] অতএব, ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মানবরচিত নানা মতবাদ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় সর্বক্ষণ লিপ্ত থেকে মুসলমানদেরকেও সার্বক্ষণিক সতর্কতা ও প্রচেষ্টাশীল থাকা অতীব আবশ্যক।

আরব বিশ্বের মতো পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশেও ইসলাম একটি সম্ভাবনাময় আদর্শ এবং জনসংখ্যার দিক থেকেও বিপুল। এখানেও ইসলাম পৌত্তলিকতা, উপনিবেশবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদসহ নানা মানবরচিত মতাদর্শ তথা কুফর/ জাহিলিয়াত/ তাগুতের বিরোধিতার সম্মুখীন। ইসলাম অগ্রসরমান হলেই নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব অপবাদের সম্মুখীন ও আক্রমণের শিকার হন।[৩৬] ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে[৩৭], উপমহাদেশে ইসলামী নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব দারুল উলুম দেওবন্দকে কেন্দ্র করে ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ে গভীর চিন্তা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার নিরিখে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন।[৩৮] কিন্তু ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় মূল নেতৃত্ব হিন্দু সেক্যুলার [গান্ধী/কংগ্রেস] এবং মুসলিম সেক্যুলার [জিন্না/মুসলিম লীগ] রাজনৈতিক গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। পরবর্তীতে পাকিস্তান আমলে সেক্যুলার গোষ্ঠী সামরিক শক্তি ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্রমে ক্রমে ইসলাম থেকে সরে যেতে থাকে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। পাশ্চাত্য ও আঞ্চলিক বিরুদ্ধবাদী শক্তিসমূহ প্রকাশ্য ও গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রমূলক কার্যক্রম করেই যাচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানরা এখন চরম কোণঠাসা। এই দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য সঠিক আত্মসমালোচনা, প্রস্তুতি ও উদ্যোগের জন্য গভীরভাবে কুরআন ও সুন্নাহর পথে প্রত্যাবর্তন ছাড়া অন্য কোনোও বিকল্প নেই।[৩৯] একজন অমুসলিম গবেষক পর্যন্ত সে কথা উপলব্ধি করেছেন। ইসলাম সম্পর্কে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক গবেষণাকারী ক্যারেন আর্মস্ট্রং[৪০]-এর ভাষায়: "পাশ্চাত্যের প্রবল শক্তি ইসলাম ধ্বংসের লক্ষ্যে শক্তি সঞ্চয় করছে। মুসলিমদের উচিত এই আধিপত্যবাদী সেক্যুলারিজমের বিরুদ্ধে অবশ্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা; যদি নিজেদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। মুসলিমরা আগেও বৈরী সমাজের মোকাবেলা করেছে, ধ্বংসলীলা দেখেছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে পাশ্চাত্যের হুমকি প্রথমবারের মতো মুসলিমদের আত্মরক্ষার পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। তাই সব সেক্যুলারিস্ট নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করা জরুরি কর্তব্য। একটি ইসলামী মুক্তির ধর্মতাত্ত্বিক/থিওলজির প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, একমাত্র আল্লাহই যেহেতু সার্বভৌম[৪১], সুতরাং মানুষের কাছ থেকে নির্দেশ নিতে কেউই বাধ্য নয়। প্রকাশ্য ও গোপন ঔপনিবেশিক ও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ কেবল অধিকার বা ন্যায়সঙ্গত কাজ নয়, বরং তা অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। প্রাথমিক যুগে ইসলামকে যেমনভাবে জাহিলিয়াহ[৪২]-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল, বর্তমানে মুসলিমদেরও ঠিক সেভাবে পাশ্চাত্যের আধুনিক জাহিলিয়াহ[৪৩] তথা মানবরচিত নানা মতাদর্শকেও অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে।"[৪৪]

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১. সমকালীন বিষয়ভিত্তিক উচ্চতর সেমিনার কর্মসূচির আওতায় ৩ জানুয়ারি ২০১৪ শুক্রবার কিশোরগঞ্জ আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়ায় 'ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা/ সেক্যুলারিজম/ নাস্তিক্যবাদের মৌলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত' শীর্ষক সেমিনার প্রবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ।

২. পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করেছে। দেখুন,

পবিত্র হাদিসেও এ ব্যাপারে বহু উল্লেখ রয়েছে।

ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভি [রহ], সাইয়েদ কুতুব [রহ.], আবুল হাসান আলী নদভী [রহ] প্রমুখ বহু মনীষীও তাঁদের গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছেন।

৩. সৈয়দ আমীর আলীর 'দ্য স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থটিতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচন রয়েছে।

৪. উল্লেখ্য, মিসরে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন ইসলামিক সরকারকে ধর্মনিরপেক্ষপন্থী বা সেক্যুলারিস্টরা সামরিক বাহিনী ও বিদেশি শক্তির সাহায্যে ক্ষমতাচ্যুৎ এবং নিগৃহীত করছে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশেও ইসলামকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। ইসলামী আইন/ফতোয়া, ইসলামী রাষ্ট্রনৈতিক বিধি-ব্যবস্থাসহ ইসলাম সংক্রান্ত নীতি-আদর্শ-নিয়ম-কানুন-আচার-আচরণ দমন করার সেক্যুলারিজম ভিত্তিক সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক বিরোধিতা স্পষ্ট।

৫. বাংলাদেশের শাহবাগে ধর্মনিরপেক্ষ-নাস্তিক্যবাদীদের কার্যকলাপ যারা পযবেক্ষণ করেছেন, তারা এ কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবেন। সেখানে রাজিব হায়দার, থাবা বাবা ইত্যাকার ঘৃণ্য তরুণরা' ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যেসব অশ্লীল উক্তি ও মন্তব্য করেছে, যেগুলো প্রকাশ করাও সুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

৬. ধর্ম ত্যাগকারীকে আরবিতে 'রিদ্দাহ' বলা হয়। আর ধর্ম ত্যাগকারী ব্যক্তিকে বলা হয় 'মুরতাদ'।

৭. শানে রেসালাত ও নাস্তিক-মুরতাদের পরিণাম, মাকতাবায়ে কাসেমিয়া, চট্টগ্রাম, ২০১৩, পৃ. ৫২.

৮. ঐ।

৯. ঐ।

১০. এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ফয়জুল বারী, ফাতহুল মুলহিম, তাফসিরে ইদ্রিস কান্দলবী প্রণীত ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ।

১১. বিস্তারিত জানতে দেখুন, ফতওয়ায়ে আলমগীরি, খণ্ড ২, পৃ. ২৫৮; আল-মাউসূয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ, খণ্ড ২২, পৃ. ১৮৩।

১২. এই তালিকা অতি সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক কিছু সমস্যা তুলে ধরছে। বাস্তবে কুফরমূলক কথা ও কাজ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বত্র দেশি-বিদেশি কুচক্রের মাধ্যমে প্লাবনের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে।

১৩. দ্রষ্টব্য, আল মাউসুয়াতুল ফিক্বহিয়্যাহ এবং আল মুগনি।

১৪. ধর্মনিরপেক্ষতার বশে অনেকেই শাখা-সিঁদুর ব্যবহার করে। কপালে, গালে সূর্য, চন্দ্র, নিশানার উল্কি আঁকে। বাংলা নববর্ষে ও বিভিন্ন জাতীয় দিবসে তরুণ-তরুণীদের বাহ্যিক আচরণ ও পোষাক লক্ষ্য করলে এগুলো মুসলমান বা অন্য ধর্মের, সেটা পার্থক্য করা যায় না। অনেক ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিষয় অবশ্যই সেই ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকদের প্রিয়। কিন্তু সেটা মুসলমানদের ওপর চাপানো বা মুসলমান সমাজে চালান করার উদ্দেশ্য কী? হিন্দু পুঁজা ও উৎসবের উপকরণ মুসলমান সমাজে ব্যবহারের হেতু কী? ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশ ৯/১০ মাস বরফে ঢাকা থাকে বলে রৌদ্র পেলেই সেসব দেশের নারীরা প্রায়-নগ্ন হয়ে সংক্ষিপ্ত পোশাকে সমুদ্রস্নান করে। এটি আমাদের

www.pathagar.com

দেশের সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও আবহাওয়ার পরিপন্থী। পাশ্চাত্যের বিধর্মী নারী তার মতো অর্ধ-উলঙ্গ চলতে পারে; কিন্তু মুসলিম নারী পর্দা করলে তাকে অপমান করা হয় এবং স্বাধীনতা ও অধিকারে আঘাত করা হয়–এসবই ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।

১৫. এই বিষয়ে পৃথক আরেকটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। মাসিক সেমিনারের বাৎসরিক তালিকা দ্রষ্টব্য।

১৬. এরা শুধু ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই প্রচার করছে না; নারী স্বাধীনতার নামে পর্দা উচ্ছেদ করছে; নারী-পুরুষের বিপজ্জনক মেলামেলা ও সীমালঙ্ঘনমূলক সম্পর্ক উৎসাহিত করছে এবং সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা হলো, এরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে লোকদের খ্রিস্টান বানাচ্ছে। এই বিষয়টি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা' বিষয়ক সেমিনারে আলাদাভাবে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

১৭. টিভি ও পত্রিকার বিজ্ঞাপনে নারীকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে এবং নারীর সৌন্দর্যকে ব্যবসায়িক ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে কীরূপ নোংরা, উত্তেজক ও হীনভাবে প্রচার করা হচ্ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। এক্ষেত্রে নারী স্বাধীনতা ও সম্মান নষ্ট হয় না। কিন্তু নারী ইসলাম পালন করলেই তার স্বাধীনতা, অধিকার ও সম্মান নষ্ট হয় বলে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা চিৎকার শুরু করে।

১৮. হিন্দুরা মনে করে মানুষ চার প্রকার। ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ [পুরোহিত], হাত থেকে ক্ষত্রিয় [যোদ্ধা], পেট থেকে বৈশ [ব্যবসায়ী] এবং পা থেকে শূদ্র [নিম্নবর্ণ] তৈরি হয়েছে। তাই নিজের স্তর ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করতে পারে না।

১৯. ধর্মনিরপেক্ষবাদী রাজনীতির উত্থানে দেশে কীরূপ সংঘাতময় রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সেটা বিগত দিনের ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করলেই অনুধাবণ করা যায়।

২০. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *ইসলাম: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* [শওকত হোসেন অনূদিত], ঢাকা: সন্দেশ, ২০১০, পৃ. ১৭০.

২১. বিস্তারিত দেখুন,

ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *স্রষ্টার জন্যে লড়াই* [শওকত হোসেন অনূদিত], ঢাকা: রোদেলা প্রকাশনী, ২০১১

ওয়াহিদুদ্দিন খান, *গড অ্যারাইজেজ* [ফয়সাল বিন খালেদ অনূদিত], ঢাকা: অন্যথা পাবলিকেশন, ২০০৫

২২. হিন্দুত্ববাদের মাধ্যমে ভারত শাসিত হচ্ছে। ইহুদিবাদের মাধ্যমে শাসিত হচ্ছে ইসরায়েল। ইউরোপ-আমেরিকার প্রতিটি তথাকথিত উদার ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী বাইবেল হাতে নিয়ে একজন পাদ্রির কাছে প্রকাশ্যে শপথ নেন। আমেরিকার মুদ্রা ডলারে গড-এর কথা আছে। ব্রিটেনে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কিছু বললে ব্লাসফেমি আইনে বিচার করা হয়। কিন্তু মুসলমানরা ইসলাম, আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচারীদের শাস্তি দাবি করলে, সে বিচার করা হয় না। জঘন্য সালমান রুশদি ও তসলিমা নাসরিনদের তখন ইসলাম বিরোধী চক্র পুরস্কার ও প্রটেক্টশন দেয়। এমন কি, মুসলমানরা শরীয়তসম্মতভাবে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে নিজেদেরকে শাসন করতে চাইলে সবাই একযোগে চিৎকার করে বলে, এরা মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গিবাদী। ইসলাম নিয়ে কথা বললেই সেটা সহ্য করতে চায় না কুফর/জাহিলিয়াত/তাগুত।

২৩. ড. মাহফুজ পারভেজ, পলাশী ও সিপাহী বিপ্লবের সূত্র, বিআইসি থেকে

২৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন,

যশোবন্ত সিংহ, *জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯

২৫. উপমহাদেশে চালু করা হয়েছে 'ব্রিটিশ আইন'।

www.pathagar.com

২৬. এ.কে.এম, নাজির আহমদ, *ইসলামী আন্দোলন*, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫, পৃ. ৮

২৭. ফ্রান্সিস রবিনসনের গবেষণার আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশের উদাহরণ টেনে বলা যায়, "উপনিবেশিক ইংরেজের ক্ষমতা দখলের পর ফার্সি-ইসলামি সংস্কৃতি ক্রমশ ক্ষয় হয়ে দ্রুত ভেঙে পড়ল। এর প্রধান কারণ উদীয়মান ব্রিটিশ ক্ষমতা, যে ক্ষমতা উত্তরোত্তর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনের সংস্কৃতিই দেশজয়ের সংস্কৃতি, তারা আসা মাত্রই ভারতের বড় বড় অঞ্চল দখল ও শাসন করতে শুরু করল। বাণিজ্যের নিরাপত্তার লক্ষ্যে তারা জমির মালিকানা এবং রাজ্য জয়ের ছাড়পত্র লাভ করতে উদ্যত হলো। তবে ব্রিটিশদের ঔদ্ধত্যই কিন্তু ইসলামী শাসনের পতনের একমাত্র কারণ নয়। ব্রিটিশরা বাইরে থেকে সংস্কৃতিকে ধ্বংস করেছে; কিন্তু তৎকালীন হিন্দু এবং মুসলিমদের একটি তাঁবেদার শ্রেণি একে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিয়ে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করে।" যাদের কথা বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রেক্ষাপটে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বিস্তারিত দেখুন,

ফ্রান্সিস রবিনসন, *দি উলামা অব ফারাঙ্গি মহল অ্যান্ড ইসলামিক কালচার ইন সাউথ এশিয়া*, দিল্লি: পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০১, পৃ. ৩৫.

২৮. জিহাদি চেতনাসম্পন্ন এই মুসলিম সৈন্যদল পূর্ব ইউরোপ, বলকানসহ জার্মানের অর্ধাংশ পর্যন্ত সালতানাতের অধীনস্থ করেছিল। যে কারণে সেখানে বসনিয়া, আলবেনিয়া নামক মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্র আছে এবং সাবেক উসমানিয়া সালতানাতের দেশগুলোতে প্রচুর মুসলিম রয়েছে। সেখানকার ভবনসমূহ গম্বুজাকৃতির, যা মুসলিম স্থাপত্যকলার নিদর্শন বহন করছে।

২৯. মুসলিম সমাজ।

৩০. সালফে সালেহিনের অনুসারী। সৌদী আরবের সালাফিদের সঙ্গে এদের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে এবং সুন্নীদের বিভিন্ন মাযহাবের ব্যাপারে এরা বিরূপ নয়।

৩১. ইসলামী আইনশাস্ত্র।

৩২. *ঐ*

৩৩. পবিত্র কুরআনে মুমিনের কাজ ও গুণাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। সকলের কর্তব্য সে অনুযায়ী আমলে সচেষ্ট হওয়া। দ্রষ্টব্য, সুরা আল বাকারা, আয়াত ৩-৫ ও ২০৬, আলে ইমরান, আয়াত ২৮, আর রা'দ, আয়াত ১৯-২৪, আল হাজ্জ, আয়াত ৩৪-৩৫, আল মোমেনূন, আয়াত ১-১১ এবং ৫৭-৬১, আল ফোরকান, আয়াত ৬৩-৭৬, কাসাস ৫৩-৫৫ এবং অন্যান্য বহু আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে।

৩৪. বিস্তারিত জানতে দেখুন, জয়নব আল গাজালি, *কারাগারের রাতদিন* [মোহাম্মদ নূরুল হুদা অনূদিত], ঢাকা: প্রফেসর'র বুক কর্ণার, ২০০৮

৩৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য যে,

ড. মাহফুজ পারভেজ, *ইসলাম ও বিশ্বায়ন*, ঢাকা: আল আবরার প্রকাশনী, ২০১০.

৩৬. ইসলাম, আলেম-ওলামা-মুসলমানদের মৌলবাদী, জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি অপবাদ দেওয়া এখন একটি স্টাইলে পরিণত হয়েছে। ইসলামকে কিছু বলতে পারলেই এবং ইসলামী বিষয়াবলিকে অবজ্ঞা ও আক্রমণ করতে পারলেই যেন আধুনিক, উদার ও ধর্মনিরপেক্ষতার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এখন চলছে এমনই এক পরিবেশ-পরিস্থিতি।

৩৭. এ প্রসঙ্গে দেওবন্দের ইতিহাস এবং উপমহাদেশের আলেম সমাজের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকার ওপর একাধিক মৌলিক গ্রন্থে রচিত হয়েছে। স্থানাভাবে সে তালিকা দেওয়া হলো না। তবে, সর্বশেষ প্রকাশিত 'হায়াতে আতহার' গ্রন্থে মাওলানা শফীকুর রহমান জালালাবাদী [দা.বা.]

www.pathagar.com

আগে ও পরের বহু আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলি প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করেছেন এবং শায়খুল ইসলাম আতহার আলী [রহ]-এর জীবনী গ্রন্থ পরিগঠনের মাধ্যমে এ বিষয়ে চিন্তার যথেষ্ট খোরাক রেখেছেন।

৩৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী এবং তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন তথা জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন,

অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদ রচিত 'মওলানা মওদুদী' এবং 'জামায়াতে ইসলামী' নামক গ্রন্থসমূহ।

৩৯. এ লক্ষ্যে দেওবন্দ আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার বা রাজনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক সহিহ দ্বীনী শিক্ষার ওপর। বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তারের কারণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদসহ বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদ এখানে দৃঢ় হতে পারে না। এজন্য আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক-স্থানীয় ইসলাম-বিরোধী অপশক্তি এবং ধর্মনিরপেক্ষবাদী গোষ্ঠী মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে সর্বদাই সরব। আলেম-ওলামা ও ইসলামের বিরুদ্ধচারণের সঙ্গে সঙ্গে তারা ইসলামী শিক্ষার তীব্র বিরোধিতা করে। যে কারণে, এই অপশক্তিসমূহ সম্মিলিতভাবে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্য-গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। হেফাজতে ইসলামের অরাজনৈতিক ১৩ দফা মূলত ইসলামী আদর্শের নানা স্বার্থেরই প্রতিধ্বনিত্ব করেছে। কিন্তু যারা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নিয়ে কাজ করছেন, তারাও হত্যা-নির্যাতন-হামলা-মামলা-অপবাদ-আক্রমণের শিকার।

৪০. এই লেখিকা ১৯৬৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবিতে ডিগ্রি লাভ করেন। পশ্চিমা জগতে ধর্মের অন্যতম ভাষ্যকার-পণ্ডিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীসহ ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদিবাদের ওপর প্রচুর গবেষণা করেছেন।

৪১. দ্রষ্টব্য, আল কুরআন, সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২৬, আন নেসা, আয়াত ৫৩, আল মায়েদা, আয়াত ১৭ ও ৭৬, আন নাহল, আয়াত ৭৩, বনী ইসরাঈল, আয়াত ১১১, আল মোমেনূন, আয়াত ৮৮, সাবা, আয়াত ২২, আল ফাতেহ, আয়াত ১৩, আয যুমার, আয়াত ৪৩, আয যুখরুফ, আয়াত ৮৬, আল ফাতহ, আয়াত ১১ ও ১৪.

৪২. ইসলাম-পূর্ব কালের অজ্ঞতা, বর্বরতা, স্বেচ্ছাচার।

৪৩. বর্তমান সময়ে যেসব মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্র-মতবাদ ইসলামের সঙ্গে আদর্শিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত, সেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গ্রহণ জরুরি। পাশাপাশি ইসলামের সঙ্গে এসবের তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে সেসবের অপূর্ণাঙ্গতা প্রচার ও প্রকাশ করাও কর্তব্য।

৪৪. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, *ইসলাম: সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* [শওকত হোসেন অনূদিত], ঢাকা: সন্দেশ, ২০১০, পৃ. ১৮০.

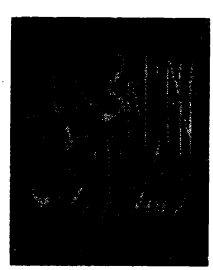

www.pathagar.com

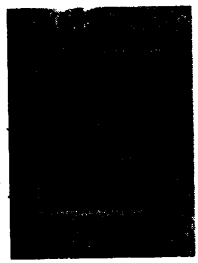

জাবালে নূরে দাঁড়িয়ে ॥ মাহবুবুল হক

হ্যাঁ, কবিদের মতোই আজ আমার সুতীব্র অনুভূতি
আর সেই অনুভূতির লকলকে মিনার থেকে
আমি মহাকালের মহা আবেগের প্রতিনিধি
নীলাভ্র আকাশে চোখ ফেরাতে ফেরাতে
কখন, কোন্ ক্ষণে এসে থির হয়েছি
জাবালে নূরের এই সম্মোহিত পাদ-পল্লীতে

আকাশ এখানে এতো নীল কেন?
বাতাস এখানে এতো ভারী কেন?
একি বেদনার্তের নীল নভোযান?
একি দীর্ঘশ্বাসের ভারী খেয়াযান?
আমার দৃষ্টি ও অনুভব এক মোহনায় একাকার
শুধু দু'টি পা
দেড় হাজার বছর আগের চলিষ্ণু-চঞ্চল
শুভ্র-কোমল দু'টি পা।

হায় কী প্রেমে, কী বিভায়
কী অভিজ্ঞায়, আর
কী মিলন টানে
পা দু'টি তর তর করে উঠে যেতো!

আমি আমার সেলুলয়েডে

www.pathagar.com

অকুণ্ঠিত পায়ের তাল ও লয় দেখি
ভাবি দুর্গম এ পর্বতে উঠতে গিয়ে যদি–
ভাবতেই, তায়েফের রক্ত ঝরা পা আর
উহুদের রক্তাক্ত মুখের ছবি ভেসে ওঠে
কষ্ট হয়। খুব কষ্ট।

বুকের গভীর থেকে কষ্টের শ্বাস উঠে আসে
মনে হয় সমস্ত মানবতা আতঙ্কে মুখ ঢাকে
মাতম ওঠে জমিনে জমিনে
আকাশ থেকে আকাশে
অনুভবে ভেসে ওঠে–
পবিত্র পদ-চিহ্নের ওপর আচ্ছাদিত হবে
আরো কারো পদচিহ্ন?
হায় ! এমনটি যদি না হতো!

এ পর্বতের পবিত্র শরীরে আর কেউ যদি
নতুনভাবে পা না রাখতো!
অক্ষত থাকতো এই নূরের পাহাড়
শুধু চার চারটি পায়ের রেখা চিহ্ন নিয়ে!

www.pathagar.com

শুধু তাঁর জন্য ॥ আবদুল হালীম খাঁ

স্রষ্টা অনেক যত্ন করে
অনন্ত অসীম বিশ্ব গড়ে
সাজালেন দিয়ে উপকরণ
যেখানে যা প্রয়োজন।
কী তাঁর অসীম কুদরত
শূন্যের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রে গড়লেন সৌর জগৎ।
ধন্য হে স্রষ্টা ধন্য
এ সকল কার জন্য!

দিন উজ্জ্বল করার জন্য আকাশে সূর্য করলেন স্থাপন
রাত সুন্দর করার জন্য তৈরি করলেন চন্দ্রতারা অগণন।
ভূপৃষ্ঠ করলেন উঁচু-নিচু সমতল
নদী ঝরনা ধারায় দিলেন মিঠাজল
সাগর তলে লুকিয়ে রাখলেন মুক্তোমণি
জমিন করলেন সব সম্পদের খনি।
ধন্য হে স্রষ্টা ধন্য
এতো আয়োজন কার জন্য!

গড়লেন পাহাড় পর্বত মরুদ্যান মরুভূমি
ঋতুতে ঋতুতে আনলেন ফুল-ফসলের মত্তসুমী
বৃক্ষে বৃক্ষে পৃথিবী করলেন বিশাল বাগান
পাখির কণ্ঠে দিলেন সুমধুর গান
মেঘে মেঘে উড়ালেন জল
বিলেঝিলে ফোটালেন শাপলা কমল।
নানা রঙের ফুলে দিলেন নানান সুবাস
সৃষ্টি করলেন আলো আঁধার আগুন পানি বাতাস
ফলে ফলে দিলেন নানা রকম স্বাদ
কিছুই রাখলেন না বাদ।

www.pathagar.com

নানা বর্ণ মানুষের মুখে দিলেন নানা রকম ভাষা
সবার বুক ভরে দিলেন শত স্বপ্ন সাধ আশা।
ধন্য হে স্রষ্টা ধন্য
এতো আয়োজন কার জন্য!

এতো আয়োজনে এতো সুন্দর করে
বিশ্ব গড়ে
স্রষ্টা তৃপ্তি পেলেন না মিটলো না তাঁর সাধ
ভাবলেন কোথায় যেনো কী পড়ে গেছে বাদ
অভাবে যার
অপূর্ণ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ সৃষ্টিটা তাঁর।
আঠারো হাজার মাকলুকাত সব ত্রুটিহীন সুন্দর
হয়েছে তো ঠিকঠাক অতি মনোহর
সারাজাহান এক অপরূপ প্রসাদ
এর মধ্যে কোথায় কি পড়ে গেল বাদ!
হ্যাঁ, বাদ পড়ে গেছে। সৃষ্টিকূলের সহদ
নাম তাঁর 'মুহাম্মাদ'।
অতঃপর সৃষ্টি করলেন 'মুহাম্মাদ' এবং তাঁকে করলেন রাসূল
বিশ্ব কাননের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ফুল
অনন্ত অতুল
সকল সৃষ্টির মূল।
তখন প্রতিটি সৃষ্টি পরশে তাঁর
হেসে উঠলো আনন্দে অপার
হলো আরো সুন্দর আরো উজ্জ্বলতর
অতি মনোহর।

আঠারো হাজার আলম শুনে তাঁর নাম
জানালো সালাম
আনন্দে গেয়ে উঠলো সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম।
সৃষ্টি হলো ধন্য
শুধু তাঁর জন্য।

www.pathagar.com

আমার রসূল ॥ ফজলুল হক তুহিন

শুধু বিস্ময়ের কুয়াশায় ভেসে যাই
কীভাবে অহির ভার করেছো বহন
শুধু অবাক হয়েছি জুলুমের চাকা
তোমার ওপর দিয়ে চলে গেছে
দেখো এখনও সেই চাকা নদীর কল্লোল হয়ে
স্বদেশে উল্লাসে বহমান
মক্কায়, তায়েফে, বদরে, উহুদে, মদিনায়
তুমি কীভাবে আলিফ হয়ে বুক টান করে খাড়া
হিমালয় হয়ে আকাশের সাথে
সমান উঁচুতে মহীয়ান
আরো বিস্মিত হই তোমার স্নেহের ঝর্ণা দেখে
প্রেমের আনন্দ যায় ছড়িয়ে সূর্যের মতো বিশ্বময়
দৃঢ়তার বটবৃক্ষ তুমি সবার হৃদয়ে
আস্থার অসীম নীলিমায় তুমি ধ্রুপদী নক্ষত্র
মেঠোপথে জনপদে রাজপথে তুমিই সম্বল
নিশানার চিহ্ন এঁকে দিয়েছো যে পথে
দেখে যাও আমরা সবাই আজ
সেই ঝাণ্ডা হাতে রক্ত দিতে দিতে
শহীদী মিছিলে পদাতিক।

www.pathagar.com

রাসূল আমার প্রিয় রাসূল [সা] ॥ আলতাফ হোসাইন রানা

রাসূল আমার প্রাণের রাসূল
সবার শিরোমণি
মরুর বুকে ফুটলে যখন
জাগলো খুশীর ধ্বনি।

তুমি যেনো আঁধার মাঝে
আলোক জ্যোতির ফুল
তোমার নামে তাস্‌বিহ জপে
বিশ্ব মানবকুল।

তুমি দেখাও সত্য পথের
আলোর দিশারী
দ্বীন-কায়েমের জন্য করো
খোদার বিধান জারি।

তুমিতো নও যেমন তেমন
সর্বশ্রেষ্ঠ ঠিক
তোমার বাণী সবার মুখে
বিশ্বের চারিদিক ॥

www.pathagar.com

আমাদের মহানবী ॥ মানসুর মুজাম্মিল

আমাদের মহানবী
আমাদের পথ
তার পথে সবে নেই
দীপ্ত শপথ।

তার পথে চলে যারা
সকাল-সাঁঝে
ওরা থাকে নবীজির
বুকের মাঝে।

কথা আর কাজে যারা
সমানে সমান
নবীজির কাছে তারা
মহা মূল্যবান।

আমাদের মহানবী
ভোরে জাগা পাখি
নবীজির নিয়মেই
আল্লাহকে ডাকি।

কালে কালে যারা তাকে
প্রাণভরে ডাকে
কঠিন দিনেই তারা
তার সাথে থাকে।

আমাদের মহানবী
আমাদের পথ–
তার পথে সবে নেই
দীপ্ত শপথ।

www.pathagar.com

বিশ্বনবী [সা] ॥ নজরুল ইসলাম শান্ত

ইয়া রাসূলুল্লাহ প্রিয় নবী
মোমিন বান্দার জানের জান
হাল ধরেছি তোমার পথে
আমরা কোটি মুসলমান।

তোমার নামে ধরা ধামে
জুড়ায় আঁখি স্মৃতির খামে
তোমার প্রেমে মগ্ন সবে
সাগর নদী নীল আসমান।

দ্বীন কায়েমের জন্য তুমি
পর করে দাও মাতৃভূমি
মক্কা থেকে মদিনাতে
হিজরতের দাও আহ্বান।

তোমার প্রেমে বিশ্ব দোলে
শিশু হাসে মায়ের কোলে
আকাশ বাতাস মুখরিত
পাখির কণ্ঠে মধুর গান ॥

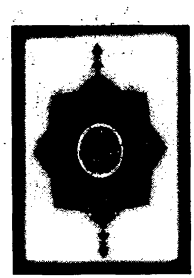

www.pathagar.com

রাসূলের শানে ॥ শাহীন আল মামুন

রাসূল নামে এলেন তিনি
মক্কা-মনোয়ারায়
আকাশের ঐ পুণ্য চাঁদ
এলোরে দুনিয়ায়।

গায়েতে খোদার নূরানী
গলাতে মধুর বাণী
হৃদয়ে অগাধ মহিমায়।

যার সুখেতে সুখি খোদাতালায়
যার উপর কোরান নাজিল হয়
যার দুঃখেতে বনী-আদম
কাঁদে সারা দুনিয়াময়।

রাসূল নামে এলেন তিনি
তারই নাম হয় যে ধ্বনি
খোদার-ই-আরস মহল্লায়।

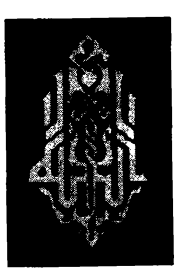

www.pathagar.com

জাঝাউল ইহসান ॥ জয়নাব সিদ্দিকী

সুদূর মদীনার মরু পথে
বোঝা মাথায় কেঁপে কেঁপে
এক থুড়থুড়ে বুড়ী যায়।

পথে দেখা প্রিয় নবীজীর [সা] সাথে
বুড়ীমা যাচ্ছ কোথায়?
নবীজী সুধায়।

বলে বুড়ী যেতে যেতে
ধর্ম ছাড়তে বলায়
মোহাম্মদের ভয়ে পালাই।

বুড়ীর বোঝা নিয়ে নিজ হাতে
পথ পার করে দেয়
বুড়ী তাই খুশি হয়।

যাচ্ছ কোথায় মদীনা হতে?
নিয়ে মোর বোঝা আপন কাঁধে!
কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?

আমিই 'মোহাম্মদ' মদীনা হতে
যাচ্ছি বুড়ীমা তোমার সাথে
বোঝার কষ্ট কমিয়ে দিতে।

বুড়ীর চোখে অবাক বিস্ময়!
তুমিই যদি মোহাম্মদ হও,
তবে কলেমার সুশীতল ছায়ায়,
আমাকে আশ্রয় দাও।

www.pathagar.com

রাসূলকে ভালোবাসি ॥ আমিনুল ইসলাম

রাসূলকে ভালোবাসি তাই
হতাশার লেশ মোটে নাই।

বদরের প্রান্তর
চোখ বুজে দেখি
উহুদের নজরানা
মনে দেয় উঁকি,
তায়েফের শিক্ষা
হৃদয়ে জড়াই।

জাহল আর লাহাবের
কথা মনে পড়ে
দিকে দিকে মুমিনের
আজো খুন ঝরে,
ওমরের মতো হই
বুকে ভয় নাই।

যতো বাঁধা হোক না তা'
হোক হিমালয়
আমাদের এ জীবনে
নাই পরাজয়,
ধ্যানে-জ্ঞানে মহানবী
তাঁর গান গাই।

www.pathagar.com

শান্তির দূত ॥ মাহমুদ শরীফ

বিশ্ব নবীর আগমনে
চাঁদ-সূর্য ফিকে
খুশির জোয়ার বিশ্বজুড়ে
জাগলো দিকে দিকে।

দয়াল নবী-শান্তির দূত
এলেন সবার শেষে
জাহিলিয়ার আঁধার কেটে
ফুল ফুটলো হেসে।

মিথ্যা-জুলুম-অন্যায় আর
দুঃখ হলো দূর
আকাশ বাতাস উঠলো গেয়ে
সুমধুর এক সুর।

কে এলোরে কে এলোরে
হাসি মাখা মুখ
তাঁরই নামে দুরূদ পড়ে
পাই যে মনে সুখ।

www.pathagar.com

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁকে শুধু চিনি ॥ সোহেল মল্লিক

তাঁর শুভ আগমনে পৃথিবীর সব
ফুল-পাখি, গ্রহ-তারা, করে কলরব
দূর হয় মানুষের মনে থাকা ভূত
খুশি হন আল্লাহু-আল্লাহ্‌র দূত।

তাঁর শুভ আগমনে বয়ে যায় সুখ
রঙধনু রঙে রাঙে মানুষের মুখ
পৃথিবীতে যায় ভেসে হাসিখুশি রেশ
পথহারা মানুষেরা পায় এডড্রেস।

গোলগাল চাঁদ আর আকাশের ফুল
তাঁর শুভ আগমনে হয় মশগুল
জোছনার আলো তাঁকে দেয় গালে চুম
উম দিয়ে খুশি হয় ডিমের কুসুম।

তাঁর উছিলায় আসে আজানের সুর
সেই সুর প্রাণে লাগে কতো যে মধুর
তাঁর কাছ থেকে পাই আমাদের দ্বীন
তাঁর নামে দুরূদ হয়, আমীন আমীন।

আল্লাহ্‌র রহমত ও নিয়ামত তিনি
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁকে শুধু চিনি।

www.pathagar.com

ভাসতে হবে রক্ত জলে ॥ মোস্তফা হায়দার

আমার দেশে আমি সেরা
ভাঙতে হবে সকল বেড়া।
জাতবিজাতে পাই না সাড়া
তাদের আমি করবো তাড়া ।

লোহার শিকল আনলো যারা
ভাঙতে হবে তাদের কড়া।
ফুলের মালা পরতে হলে
ভাসতে হবে রক্ত জলে ।

রাতের সাথে রাখলে সোহাগ
জোনাকিরা জ্বালবে হেজাক।
আমার আমি সেরা জাতি
ভয়ের কাছে নয়তো খ্যাতি ।

সাধন পুরের সাধন আমি
হতে চাই না নামিদামি ।

www.pathagar.com

প্রশংসিত প্রিয় নবী ॥ সোনিয়া সাইমুম বন্যা

তখনো হয়নি ধূলি ধূসরিত মরুতে সবুজ চাষ,
অনাগত কাল রেখেছিলো বুকে গোলাপের অভিলাষ।
মনিব ভৃত্যের অধিকার ছিলো যোজন যোজন দূর,
নিরালায় একা কেঁদে ফিরে যেত মানবতা ব্যথাতুর।
তখনো ছিলো জাহিলিয়াতের তমসায় ঢাকা-চাঁদ,
মেয়ে শিশু যেনো সবচেয়ে বড় জন্মের অপরাধ।
বাবার স্নেহ-মায়া, মমতা মিশে যেতো লজ্জায়,
ফুল না ফুটেই কুড়িদের হতো মাটির বুকেতে ঠাঁই।
বছরের পর বছর চলতো রক্তের প্রতিশোধ,
ছিলো না আদল, ইহসান, ন্যায়-নীতি সাম্যের বোধ।
মানুষে-পশুতে ছিলো না অক্ষাৎ হিংসা-ক্রোধের আগুন,
বিজন মরুর প্রান্তর জুড়ে ছড়াতো রক্ত ফাগুন।
তখনই হঠাৎ ঝাপটায় যেনো মরু ঈগলের ডানা,
তামাম জাহান মশগুল হলো পেয়ে সেই নজরানা।
জান্নাতী সেই নুরের পরশে আলোকিত দশদিক,
তৃষিত মরুর বুকে যেনো আবহায়াতের ঝিকমিক।
হৃদয় থেকে হৃদয়ে ওঠে বিনা তারে সারগাম,
আকাশ-বাতাস ধ্বনিত-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।
অবারিত সেই শান্তির ধারা ঝরে পড়ে পৃথিবীতে,
বিমুগ্ধতার সৌরভ সব হৃদয়ের আরশিতে।
তার দরদে ধুয়ে যায় যতো অন্যায়-অহমিকা,
মনে ও মননে জ্বলে স্নিগ্ধ সাম্যের প্রীতি শিখা।
তিনি প্রিয় নবী প্রশংসিত রহমত পৃথিবীর।
তারই নুরের রোশনীতে আজ আলোকিত সব নীড়।

www.pathagar.com

মনের আয়নায় রাসূলের ছবি ॥ তমসুর হোসেন

প্রিয় রাসূলকে প্রত্যক্ষ করি তাঁর জ্যোতির্ময় স্বরূপে
অনেক নিশীথে নিশাচর বিহঙ্গের কলরবের মতো
তাঁর মনোমুগ্ধকর আহ্বানে জেগে উঠি,
তরঙ্গিত সাগরে দুলে ওঠা জাহাজের পাটাতনে বিম্বিত হয়
তাঁর বিচিত্র রূপের ছায়া।
এক রহস্যময় মৃগশিশু হয়ে শাল-গেওরার ম্যানগ্রোভে ছুটে বেড়ায় সে অবিরত।

মৃত্যুজড় নিদ্রার বিচূর্ণ অলস অন্ধকারে
রাত যখন বিষাক্ত দংশনে কেড়ে নেয় হৃদয়ের উল্লাস
তখন সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে তিক্ত মনোদৈন্যে জেগে ওঠে
যে নাম স্বস্তির প্রাণময় তরঙ্গে হৃদয়ে সুর তোলে
তার রঙ ভেসে ওঠে দূরের গ্রহলোকে
সবকিছু শুদ্ধ করে মনের আকাশে রাসূল নাম জোছনা হয়ে হাসে।

সেই আরাধ্য রাসূলকে রাতের স্বপ্নে দেখব বলে
সফেদ পুষ্পে কক্ষ সাজিয়ে রাখি,
শিয়রের কাছে সযত্নে জ্বালিয়ে দেই দুষ্প্রাপ্য সুগন্ধি লোবান
ঝিমানো চাঁদের নিথর আলোয় সরব জিকিরে কাঁপিয়ে তুলি রাতের বাতাস।
মোবারক চরণে জান্নাতের ধূলি মেখে খুব সন্তর্পণে
তারার চপ্পল পায়ে ছন্দময় পদক্ষেপে হেঁটে আসে আমার রাসূল।
নিদ্রিত নয়নে অফুরন্ত বরকত ছড়িয়ে নিমিষে হারিয়ে যায়
ভোরের আযানে জেগে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠি,
রাতের প্রসন্ন ঘুমে স্বপ্ন হয়ে রাসূল আমার আসেনি বলে।

www.pathagar.com

মরু সাহারার বুকে ॥ খালীদ শাহাদাৎ হোসেন

মরু সাহারার বুকে ছোট জীর্ণ কুঁড়ে ঘর। বাতি জ্বালানোর
তেল নেই শিশিতে।
মা আমেনা, মা হতে চলেছেন, স্বামী আবদুল্লাহ সেতো
বেঁচে নেই পৃথিবীতে।
অসহায় বিধবা প্রসূতি, নতুন মেহমান আসবেন আজ তাঁর কোলজুড়ে।
পেশাদার ধাত্রীগণ দুয়ারে এসে ফিরে যায় ইনাম না পাবার শঙ্কাতে।
বড় চিন্তিত আমেনা, তাহলে আজ তার কী উপায় হবে!
দিনের আলো নিভে যায়। পুব আকাশে উঁকি দেয়
জ্যোৎস্নামাখা পূর্ণিমার চাঁদ।
তেলশূন্য বাতির খোঁজে ঘরে এসে শিহরিত হয়ে যান মা আমিনা।
তাঁর ঘরে নীল, সবুজ আর জ্যোৎস্না মেশানো আলোকসজ্জার
রকমারি ছড়াছড়ি।
অপূর্ব সুরভিতে ভরপুর তাঁর গৃহ, গুলবাহার আর কস্তুরি মিশানো সুবাসে।
আর ঘরের ঐ কোণে, স্নিগ্ধ ঝলমল পোশাকে সজ্জিত জায়নামাজের আসনে
তসবীহ এবং দুরূদ পাঠরত অচেনা অপূর্ব সুন্দরী এক অচেনা রমণী।
ভয় পেয়ে সাহস বেড়ে যায় মা আমিনার। পায়ে পায়ে কাছে এসে তাঁর
ক্ষীণ মোলায়েম কণ্ঠে বলেন, মা কে তুমি? কেন তোমার আগমন?
আমি আছিয়া। আগন্তুক পরম স্নেহে মিষ্টি সুরে বলেন, মেহেরবান খোদা–
এ রাতের জন্য আপনার খেদমতে আমাকে পাঠিয়েছেন বিশেষ প্রয়োজনে।
ক্রমে রাত বাড়ে, অগণিত কায়াহীন সত্তায় অবতরণ অনুভব করেন
প্রসূতি নিজ অন্দরে। মা আমিনার চোখে কেন যেন ঘুম নেমে আসে।
পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখেন এক অপূর্ব আলোক রশ্মি,
যা দিয়ে তিনি সিরিয়া বসরার প্রাসাদ দেখতে থাকেন দুই চোখ ভরে।
হঠাৎ ঘুমের মধ্যে তাঁর কানের কাছে শুনেন কার অসংখ্য প্রশংসার বাণী।
পরস্পরে সওয়াল জবাব। দেখ, দেখ, কি ভাগ্যবর্তী রত্নগর্ভা মা।
দোজাহানের বাদশাহ মেহমান হয়ে এসেছেন তাঁর জীর্ণ কুটির
আলোকিত করে।

www.pathagar.com

নবজাতকের ঘরে কান্নার শব্দ নেই, কাতারবন্দি ফেরেশতারা খুশিমনে
দুরূদ পড়ে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইয়ানবী সালামু আলাইকা।
কুল মাখলুকাত ধ্বনি তোলে মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ।
মধুর কলরব শুনে মা আমিনার ঘুম ভাঙে। চেয়ে দেখেন তাঁর পাশে যেন
আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ শুয়ে আছে। মুখে তাঁর কালেমার বাণী–
সুব্হানাল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ-আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
আগন্তুক মহিলা আস্তে ধীরে মা আমিনার শিয়রের কাছে এসে বলেন–
আপনার মতো এমন ভাগ্যবতী মা আর কেউ হবে না এই পৃথিবীতে।
আপনার শিশুর মতো এতো মর্যাদা নিয়ে আর কোনো শিশু তাশরিফ
আনবে না এই ধরণীতে।
আপনার গৃহের মতো আর কোনো গৃহের মরতবা হবে না কখনো।
এই শহরের মতো আর কোনো শহরের এতো ইজ্জত হবে না
কেয়ামতের আগে।
আজকের রাতের মতো আর কোনো বরকতময় রাত যোগ হবে না
মহাকালে।
আমার আমলনামা ধন্য আজ আপনার ছেলের ধাত্রী হবার সুবাদে।
মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসূলাল্লাহ মারহাবা ইয়া হাবিবাল্লাহ
দুরূদ পড়তে পড়তে তিনি নিমিষে মিশে গেলেন সুবহে সাদিকের
নির্মল আকাশে।
দরিয়ার বুকে ঢেউ নাচে হাসে রবি-তারা আসমান-জমিন
গাহে গান আহ্লান সাহ্লান ইয়া রহমাতাল্লিল আলামিন।

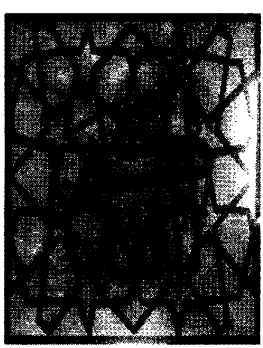

www.pathagar.com

আছো শুধু তুমি ॥ আবু সুফিয়ান সরদার

আমার-ই-মনের মাঝে
আছো শুধু তুমি
তোমাকে ছাড়া কিছুই
বুঝি না তো আমি।

আল্লাহর পিয়ারা দোস্ত
গোলাপে মদীনা
তোমাকে ছাড়া আমি
কিছুতো বুঝি না।

স্বপনে এসো তুমি
বুকে দেব ঠাঁই
মরণের আগে যেন
তোমার দেখা পাই।

গড়েছেন আল্লাহ্ আমায়
তুমি দেখিয়েছ পথ
তাই লাখোকোটি পড়ি
তোমার-ই-দুরূদ।

তোমার-ই-শাফায়াত পাবো
আশা করি আমি
আমার-ই-মনের মাঝে
আছো শুধু তুমি।

www.pathagar.com

হযরত মোহাম্মদ [সা] ॥ নূর মোহাম্মদ

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
মোদের নবী
সবার নবী
শ্রেষ্ঠ নবী
বিশ্ব নবী
সব নবীদের শেষ নবী।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রূপের জ্যোতি
হিরার জ্যোতি
হৃদার জ্যোতি
খোদার জ্যোতি
এই পৃথিবীর হেরার মোতি।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
প্রীতির সেরা
স্মৃতির সেরা
রীতির সেরা
নীতির সেরা
হৃদয় তাঁর কুরআন ঘেরা
তাই তো তিনি সবার সেরা।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ফুলের হাসি
ঊষার হাসি
মরুর হাসি
ধরার হাসি
পেয়েছে সে খোদার হাসি
তাই তো তাঁকে ভালোবাসি।

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
কামলী ওয়ালা
কাওসার ওয়ালা
জান্নাত ওয়ালা
প্রভুর প্রিয় হাবিব ওয়ালা
তাই তো পড়ি দুরূদ মালা।

www.pathagar.com

তোমাকে পেতে চাই ॥ মুহাম্মদ ইসমাঈল

তোমাকে পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা আমার
ওগো প্রিয়তমো রাসূল।
তোমাকে দেখার প্রবল ইচ্ছা আমার
ওগো প্রিয়তমো রাসূল।
কিন্তু কীভাবে পাবো

বিশ্ব আশেকে রাসূল [সা] সম্মেলন করে
পেতে চাই না
জস্নে জুলুস করে পেতে চাই না।
বহুত ফায়দা হবে এভাবেও
পেতে চাই না।
গরু ছাগলের হাট বসেও পেতে চাই না

আমি পেতে চাই শেখ শাদীর মতো
আমি পেতে চাই ইমাম বুসরীর মতো
আমি পেতে চাই মাইকেল এইচ হার্টের মতো
আমি পেতে চাই সুফি ফতেহ আলীর মতো।
আমি পেতে চাই ড. মুরিস বুকাইলির মতো
আমি পেতে চাই ড. শিব শক্তির মতো।

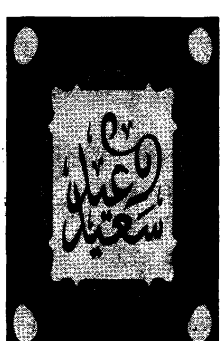

www.pathagar.com

একজন অনন্য মানুষ ॥ নাজমা ফেরদৌসী

"সুরম্য অট্টালিকা সুনিপুণ সুন্দরের কোথায় যে ছন্দপতন
সব আছে তবু কোথায় কি নেই?
সব আছে নেই শুধু একটিমাত্র ইট
সেটির অভাবে অপূর্ণ ছিল নির্মাণ
একটিমাত্র ইটের বাঁধনে পূর্ণতা পেল সভ্য মানবের ইতিহাস
কালের প্রাসাদ সভ্যতার নির্মাণে সেই সর্বশেষ একমাত্র ইট তিনি;"
উপমাটি তাঁরই দেয়া,
মুহাম্মাদ [সা] তাঁর নাম, অগণিত সালাম তাঁর সমীপে
পাঠাই রাত্রিদিন; সিরাতে নয় শুধু, প্রতিটি দিন
তাঁর নামই কেবল কালের ইতিহাসে রবে অমলিন।

মাউস কী বোর্ড এর ক্লিক আর নৈঃশব্দের ভেতরে
ডিজিটাল সময় এগিয়ে চলেছে
মানবতার খুন নিয়ে হোলিওয়ালাদের খেলাও চলছে ডিজিটালভাবেই।

ঘড়ির টিক টিক, কলমের খস্ খস্ অথবা কম্পিউটার
এইসব প্রযুক্তির কোনোটি ছিল কি তাঁর?
তাহলে কীভাবে একজন নিরক্ষর মানুষ
এভাবে তাঁর মতো জ্ঞানকে ধারণ করেন
মানবতার রুগ্নতা সারাতে যাঁর জ্ঞান
অনন্য সাহসিকতায় আচ্ছন্ন করেছিল সময়কে।
কতোটা ডিজিটাল হলে
কতোটা মাইক্রো হলে
তাঁর প্রসেসর এমনই অপারেটিং সিস্টেম ধারণ করেছে
যে সিস্টেম মানুষকে মানুষের শৃঙ্খল থেকে শুধু মুক্তই করেনি,
দিয়েছে সম্মান, অধিকার আর জীবিকার নিশ্চয়তা
আজ মানুষের অন্তহীন সমস্যার সমাধানে মানুষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে
খুঁজছে যে দিশা, যে নমুনা, যে জীবনাদর্শ,
তার নাম 'উসওয়াতুন হাসানা'– খুঁজে নাও কুরআন থেকে।

www.pathagar.com

তুমি গুলবাগের ফুল ॥ মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ

তুমি আল্লাহর আল আমিন আমাদের আশীর্বাদ
পৃথিবীর পথে পথে তোমার পরিচ্ছন্ন পরিভ্রমণ-জিন্দাবাদ।
তুমি জিন্দাবাদ।
তুমি জগতের জ্যোতির্ময় তুমি আকর্ষিত ফুল
তুমি গুলবাগের ফুল।
হে রাসূল তুমি আমার প্রিয় রাসূল !
গুল বদনেতে তোমার স্নিগ্ধ হাসিতে-হাসছে জোছনা কুল।
হে রাসূল তুমি আমার প্রিয় রাসূল।
তুমি অপরূপ-তুমি উজ্জ্বল-আলোকিত ভূমি।
সাথে তোমার প্রসান্ত্বনার প্রশস্ত স্বর্গ।
সুশান্ত সুখ সফলতায় জাগে
রক্তাক্ত ত্যাগে-ফুটছে ফুল গুলবাগে।
গোলাপ গন্ধে বসুন্ধরা
উৎফুল্ল উল্লাসে মাতোয়ারা।
তুমি গুলবাগের ফুল। হে রাসূল
তুমি আমার প্রিয় রাসূল। আমার প্রিয় রাসূল।

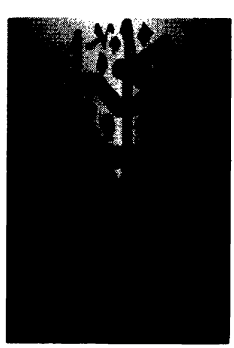

www.pathagar.com

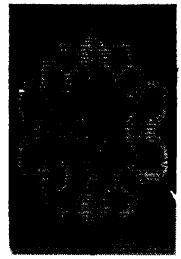

ইসলামী চলচ্চিত্র ও নাটক প্রসঙ্গে

শেখ আবুল কাসেম মিঠুন

পৃথিবীতে একটা বিষয় চলে আসছে, তা সবার কাছে পরিচিত এবং গ্রহণীয় হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন এই একই বিষয় চর্চা করে তখন তা হয়ে যায় প্রথাগত। তা হয়ে দাঁড়ায় একটা মডেল। সবাই তাকে অনুসরণ করেই চর্চা করে থাকে। চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি তেমনি একটা প্রথাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই প্রথা ভাঙ্গার জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলচ্চিত্র এবং নাট্য আন্দোলন হয়েছে। আন্দোলনকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সফল। কিন্তু ইসলামী বিশ্বে চলচ্চিত্র বা নাটক নিয়ে আন্দোলন তো দূরের কথা উল্লেখযোগ্য কোনো চর্চাই হয়নি। আর তাই চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরির ক্ষেত্রে ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সামনে কোনো মডেল নেই। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো থাকে, তারই পরশে পরশে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে ইসলামী পরিবার এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। ইসলাম আগমনের পর থেকে ৩০ বছর ধরে ইসলামের সেই সুস্থ সুন্দর ও কল্যাণকর রূপ পৃথিবীর মানুষ দেখেছে। আজকের পৃথিবীতে যেখানে যতো কল্যাণময় রূপ আমরা দেখি তা সবই ইসলামের অবদান। কিন্তু ক্ষমতাধর মানুষরা তাদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিজেরা আইন রচনা করে আল্লাহর জারিকৃত আইনব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়ে তাকে বিকৃত করেছে, আবার কখনো বাতিল করেছে। আজ অবধি সেই ভাঙা-গড়ার খেলা চলছে। তাই বর্তমানে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা কোনো সমাজ ব্যবস্থায় দেখতে পাবো না।

অথচ চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্পের উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করা হয় সমাজের ভেতর থেকে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, লেন-দেন, আচার-আচরণ এবং এসব বিষয়বস্তু নিয়ে যে দ্বন্দ্ব তাই-ই হচ্ছে চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্পের মূল উপাদান ও উপকরণ। এই যে দ্বন্দ্ব, এর যে উৎসমুখ, সেই উৎসমুখের ভিত্তি সম্পর্কে আমরা যদি চিন্তা করি তবে দেখবো যে, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক যে আইন-কানুন প্রবর্তিত এবং প্রচলিত, তা আমাদের প্রতিটি লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে যেমন পরিচালনা করছে তেমনি নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের সকল কার্যক্রমকে। আমাদের সমাজের মানুষ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন ব্যবস্থাকে এমনভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছে যে তাকে আর বলে দিতে হয় না কোন কাজ করা উচিত আর কোন কাজ করা উচিত নয়। বেশিরভাগ মানুষ জানে অপরাধমূলক কোনো কাজ করলে তার কী ধরনের শাস্তি

www.pathagar.com

হতে পারে। রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় মানুষ অভ্যস্ত বলেই সে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কাজ করে যায়। দ্বন্দ্ব সংঘাতও করে স্বাধীন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে। রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থা শুধু মানুষের জীবন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে না, তার মানসিক অবস্থাকেও আমূল পরিবর্তন করে ফেলে। এর ফলে মানুষ যে জীবন ব্যবস্থায় পরিচালিত হয় এবং একে অপরের মধ্যে যে সম্পর্ক, বন্ধুত্ব বা দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে তাই নিয়েই তৈরি হয় চলচ্চিত্র ও নাটকের কাহিনী। অতএব দেখা যাচ্ছে চিন্তার মূল ভিত্তি হচ্ছে দুটি, এক. আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং সেই ভিত্তির উৎসমুখ হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইন-ব্যবস্থা। দুই. ক্ষমতাধরদের প্রতি ঈমান এবং সেই ভিত্তির উৎসমুখ হচ্ছে তাদের তৈরি করা আইন-ব্যবস্থা। দুটি রাস্তা–হয় এটা নয় ওটা।

সারা পৃথিবীতে যে চলচ্চিত্র ও নাটক হচ্ছে তা এই শোষাক্ত বিপরীত ব্যবস্থার ভিত্তিতে। অতএব ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদের সামনে কোনো মডেল থাকার কথা নয়। তবে আদর্শ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণী কৌশল ও সৃজনশীলতার ধারালো শক্তিমত্তা দিয়ে আধুনিক এই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। রাসূল আকরাম [সা] বলেছেন, 'জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে মুমিনের হারানো বস্তু, অমুসলিমদের কাছে পেলেও তা অর্জন করো।'

এখানে মনে রাখা দরকার, চলচ্চিত্র বা নাটক নিজে কোনো সংস্কৃতির সৃষ্টি করে না। বরং যে সমাজ মানুষ নির্মাণ করে, সেই সমাজের সংস্কৃতিই চলচ্চিত্র এবং নাটক ধারণ করে এবং সাংগঠনিক আকারে তাই-ই ভূমিষ্ট করে। তাই চলচ্চিত্রকে বলা যেতে পারে সকল সংস্কৃতির জননী।

চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্প সাহিত্য ভিত্তিক হতে পারে। বলা যেতে পারে বিশ্বের স্মরণীয় চলচ্চিত্রের অধিকাংশই সাহিত্যভিত্তিক। উন্নত সাহিত্য, উন্নত চলচ্চিত্র বা নাটক সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু আমাদের যারা গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য রচনা করেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের লেখনীর মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার অনুপস্থিত। ইসলাম ও ইসলাম বহির্ভূত জীবন ব্যবস্থার যে পার্থক্য তা নির্ণয় করা পাঠকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। বেশিরভাগ লেখকের সামনে মডেল হিসেবে উপস্থিত থাকে আধুনিক অনৈসলামিক সাহিত্যিকদের রচনা। কিছু কিছু লেখক ইসলামী আদর্শকে সামনে রেখে গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেও তার মধ্যে চলচ্চিত্রিক এবং নাটকীয় টেকনিক্যাল গুণগুলো থাকে না। যে কারণে সেসব গল্প ও উপন্যাস নিয়ে উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র বা নাটক তৈরি করা সম্ভব হয় না। সমাজের ব্যক্তি ও সামষ্টিক সমস্যা, তার উৎপত্তি এবং সমাধানের এক ধরনের পন্থা অনৈসলামিক লেখকরা তাদের রচনায় দেখিয়ে থাকেন, যাতে থাকে নিজস্ব মনগড়া নীতি-নিয়ম ও আইনব্যবস্থা, আদর্শিক লেখকরাও যদি তাদের পন্থা অবলম্বন করেন তবে তা আর আদর্শিক থাকে না। কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠায় আন্তন চেখভ, টলস্টয় বা গোর্কীর মতো বিপ্লবী লেখক অথবা কিউবার চলচ্চিত্র পরিচালক আলভারেজ, সোলাস, রাশিয়ার আইজেনস্টাইন, সের্গেই বন্দারচুক, মেক্সিকোর রেমনডো গ্লেসার, চিলির প্যাট্রিসিয়ো গুজম্যান প্রমুখ তাদের দর্শন, তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত নীতি-নিয়ম এবং মানব রচিত আইনি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যে মেধা, পরিশ্রম ও সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে যেমন হয়েছে নন্দিত তেমনি অনুকরণীয় হয়ে আছে। এই আধুনিক সাংস্কৃতিক হাতিয়ার ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের জন্য আমাদের সাহিত্যিক নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকারীদের জনগণের চিন্তা-চেতনার ভিত্তি, মনস্তাত্বিকতা, সমাজ বিশ্লেষণ এবং তার উৎসমুখকে চর্চা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষাপূর্বক এগিয়ে আসা অতীব প্রয়োজন। আমাদের বিত্তবানদেরও প্রেরণা এবং

www.pathagar.com

উৎসাহের হাত বাড়ানো উচিত। বলা হয়ে থাকে, রাজনীতিবিদরা কবি-সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের চিন্তা থেকে আইডিয়া সংগ্রহ করে থাকেন। আর তাই-ই পরবর্তীকালে আন্দোলন অথবা রাষ্ট্রীয় নীতির মর্যাদা পেয়ে থাকে।

মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর চলচ্চিত্রও আমাদের আদর্শ হতে পারে না। যেসব দেশ চলচ্চিত্র তৈরি করে যেমন মিসর, লেবানন, কাতার, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশগুলোর শাসকশ্রেণি মূলত মুসলিম নামধারী হলেও তাদের আইন ব্যবস্থা নিজেদের তৈরি এবং পাশ্চাত্য থেকে ধার করা বস্তুবাদী আইন ব্যবস্থা। বেশিরভাগ মানুষের মন-মস্তিষ্ক এবং জীবন পরিচালিত হয় সেই আইন ব্যবস্থার অধীনে। তাই ঐসব দেশের মানুষের দ্বন্দ্ব এবং বস্তুবাদী দেশের মানুষের দ্বন্দ্বের স্বরূপ আর তাদের চলচ্চিত্র ও নাটকের গল্পের চরিত্র, ঘটনা বিন্যাস এবং মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রবাহের স্বরূপ প্রায় একই। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র ও নাটক তা থেকে পৃথক নয়। 'আল মিল্লাতুন জাহিলিয়াত ওয়াহিদা।' সকল জাহেলিয়াতই এক।

তবে এক্ষেত্রে ইরান আমাদের জন্য একটি সাবধানী ও সতর্ক মডেল হতে পারে। একটা ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চলচ্চিত্র ও নাটকে মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সংযত প্রয়োগরীতির জন্য ইরান প্রশংসার দাবিদার। কিন্তু যেহেতু আমরা মুসলিম নামধারী অনৈসলামিক শাসকদের অধীনে ইসলাম বিরোধী শাসন ব্যবস্থায় জীবন-যাপন করি সেহেতু ইরানী চলচ্চিত্র ও নাটকের যে উপাদান উপকরণ তা যদি আমরা অনুসরণ করি তবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভোগবাদী শাসন ব্যবস্থার অধীনে সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার বা নাট্যকারদের মানসিক দুর্বলতায় অশ্লীলতা এবং প্রকট শির্‌কের জন্ম দিতে পারে। ইরানেও সেই অবস্থা হয়েছিল। তাই আমরা ইরানের চলচ্চিত্র ও নাটকের সূচনালগ্নের পটভূমিকে সামনে রাখতে পারি। ১৬শতকে মহররম এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি প্রেমের সংঘাত, ধনী-গরিবের দ্বন্দ্ব এবং পারিবারিক ঝগড়া-ঝাটি নিয়ে ইরানে নাটক মঞ্চস্থ হতো, এসব বিষয়বস্তুই পরবর্তীতে তাদেরকে পাশ্চাত্যমুখী করে দেয়। ১৯শতকে ইরানে আধুনিক নাটকের পথ চলা শুরু। যা একেবারেই পাশ্চাত্য রঙে রাঙানো। ইউরোপ থেকে জনপ্রিয় নাটক এনে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করে তারা মঞ্চস্থ করতো। ১৮৫১ সালে যখন পাশ্চাত্য কালচার ইরানে মজবুত শিকড় গেড়েছে তখন মীর্জা ফতেহ আলি আখুন্দজাদা নাটকের মাধ্যমে সংস্কারে ব্রতী হন। তার সঙ্গে যোগ দেন মীর্জা আকা তাবরীজি, মীর্জা মালকম খান, নাজেম আল দৌলা প্রমুখ। তাদের নাটকের বিষয়বস্তু ছিল সরকারি দুর্নীতি এবং সামাজিক অনাচার। তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু তাদের উত্তরসূরীরা থেমে থাকেনি। ১৯১১ সালে তেহরানে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হয়। সেখানেও তাদের উত্তরসূরীরা সরকারি দুর্নীতি এবং সামাজিক অনাচার নিয়ে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। ১৯২০ সালে রেজা শাহ্ ক্ষমতায় এসেই নাটকের ওপর কড়া সেন্সর আরোপ করেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক আদর্শ একবার গতি পেলে তাকে থামানো সম্ভব নয় বরং গতিবেগ দ্বিগুণ শক্তিশালী এবং গতিশীল হয়। আজকের ইরানের চলচ্চিত্র ও নাটক সেই আন্দোলনের ফসল।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের শাসক ও গ্রামীণ বিচারক ছিলেন ইসলাম অনুরক্ত আলেমশ্রেণি আর দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অভিভাবক ছিলেন ইসলাম অনুরক্ত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষীবৃন্দ। সমাজ শাসিত হতো তাদের দ্বারা। তাই তখনকার চলচ্চিত্র ছিল অনেকটা সংযমী। কারণ সমাজের লোকজনের আচার-আচরণও ছিলো অনেকটা সংযমী। আর সমাজের চিত্রটা উঠে আসে চলচ্চিত্র ও নাটকে। অভিনয় শিল্পীদেরকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতো

www.pathagar.com

সমাজ। কিন্তু অভিনয় শিল্পীরা তাদের চলচ্চিত্রিক ভদ্রজনিত ইমেজ দিয়ে একটা সম্মানিত পজিশন তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের পরে ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালিত হওয়ার কারণে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অবক্ষয় নেমে আসে। পরিকল্পিত উপায়ে শক্তির দাপটে আলেমশ্রেণিকে সরানো হয় মর্যাদার আসন থেকে, ইসলামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক বিষয় সম্বলিত রচনাদি বাদ দেয়া হয় পাঠ্য–পুস্তক থেকে, তাদেরকে দেশের পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়া একঘরে করে দেয় অথবা তাদের চরিত্রকে মৌলবাদী বলে কলুষিত করা হয়। মহানবী [সা] এবং সাহাবা কেরামদের [রা] শ্রেষ্ঠতম বাণীর স্থান দখল করে নেয় পরকাল অস্বীকারকারী ভোগবাদি, বস্তুবাদী কবি দার্শনিকদের বাণী। তাই চলচ্চিত্র ও নাটকে ঢুকে পড়ে অশ্লীলতা অরাজকতা এবং অমানবিকতার জয়গান, যা ভোগবাদীর চূড়ান্ত। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সেজে এসব অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। তাদের দ্বারাই এখন পর্যন্ত এসে তা আরো শক্তিশালী হয়েছে।

এ অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে এমন সব চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি উদ্ভাবন করা দরকার যা প্রথাগত নয়, যা ইসলামের সৌন্দর্যকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তুলে ধরবে, পাশাপাশি অনৈসলামিক আইন-বিধানের অযৌক্তিক, অমানবিক এবং অকল্যাণকর প্রত্যেকটা বিষয়কে বিশ্লেষণ করে মানুষের সামনে যৌক্তিভাবে প্রকাশ করবে। শুধু তাই নয়, ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধানকে পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিচিত করা, তার কল্যাণকর ব্যবহার এবং মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলার জন্য চলচ্চিত্র এবং নাটকের কোনো বিকল্প নেই। আর সেই চলচ্চিত্র আর নাটক হবে অন্যান্য দেশের জন্য মডেল। এই মডেল তৈরি করতে হবে নিজস্ব সৃজনশীলতা দিয়ে, অন্য কাউকে মডেল করে নয়। মনে রাখা দরকার, ইসলাম স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ইসলামই সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণকে পার্থক্য করে দেখিয়েছে। শুধু অ আ ক খ এবং নাম সই করতে পারাটাই শিক্ষিত সমাজ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয় বরং ইসলামী শিক্ষাই হলো মানবতার আসল এবং মূল শিক্ষা। আর আদর্শিক চলচ্চিত্র ও নাটক জনগণকে সংস্কৃতিপ্রবণ করে তুলবে। ইসলামী মৌলিক শিক্ষাকে তাদের অন্তর্রাজ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দান করবে। প্রসঙ্গক্রমে আরো একটি কথা মনে দরকার– মুমিন ব্যক্তির আনন্দ এবং অমুমিন ব্যক্তির আনন্দ একই বিষয়বস্তু থেকে আসে না।

আল্লাহ তায়ালা একটি লিস্ট দিয়ে মানুষকে এই বাজারে পাঠিয়েছেন। লিস্ট মোতাবেক বাজার করে আসল ঘরে ফিরে যাবার জন্য। মূল উদ্দেশ্য হলো সেই আসল ঘরের প্রয়োজন মেটানো। মুসলমানদের পরিচালিত বাজার [রাষ্ট্রে] ব্যবস্থায় মানুষ যদি সেই লিস্ট অনুযায়ী কেনাকাটা করতো তবে সমাজ বা রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অন্যায়-অবিচার, হানাহানি, শোষণ-বঞ্চনা এসবের প্রকোপ কমে যেতো।

একজন অমুসলিম অশ্লীলতা, নিষ্ঠুরতা এবং অবৈধ বিভিন্ন পন্থা সম্বলিত দৃশ্য দেখতে উৎসাহী হতে পারে, তাতেই তাদের আনন্দ কিন্তু একজন মুমিনের কাছে ওসবে যন্ত্রণা। মুমিনের আনন্দ আল্লাহর নির্দেশ পালনে এবং আল্লাহর স্মরণে [জিকিরে]। কারণ একজন অমুসলিমের চিন্তার উৎস এমন এক মানসিক ভিত্তি থেকে যা ভোগ-বিলাস, প্রভুত্ব করা এবং স্বার্থবাদিতা থেকে গঠিত। ফলে তার আনন্দ প্রাপ্তি হয় অশ্লীলতা, অত্যাচার, ভোগবিলাসের সামগ্রী ও সেসবে বিকারগ্রস্ত লোকজনের জীবনাচরণ দেখে এবং তার স্বপ্ন দেখে। তিনি কখনো বিশ্বাস করেন না ইহকাল থেকে পরকাল সুন্দর এবং চিরস্থায়ী। অন্যদিকে একজন মুমিনের চিন্তার উৎস এমন

www.pathagar.com

এক মানসিক ভিত্তি থেকে যে ভিত্তিটা মানুষের কল্যাণের জন্য ত্যাগ, সহনশীলতা এবং নিজের প্রিয় স্বার্থগুলো ত্যাগ করে মানুষ ও মানবগোষ্ঠীর জন্য কাজ করার এক নির্ভেজাল ঐশ্বরিক গুণাবলীতে গঠন হয়েছে। তাই সে আনন্দিত হয় শ্লীলতা দেখে, সুবিচার দেখে, ন্যায়পরাতো দেখে এবং ভোগবিলাস ত্যাগ করে মানুষ ও মানবগোষ্ঠীর সুখ-সমৃদ্ধশালী জীবন-যাপনে ভূমিকা রেখে। এসবের উৎস পবিত্র সৎচিন্তা থেকে। এই সৎচিন্তার উদ্ভব ইহকাল থেকে পরকাল সুন্দর ও চিরস্থায়ী এই বিশ্বাস থেকে।

অতএব আমাদের সমাজে যারা মুমিন তারা এমনসব বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরি করবেন যার উপাদান ও উপকরণ হবে– ইসলাম যে মানুষ ও মানবতার কল্যাণে এসেছে–প্রতিটি চরিত্র, সংলাপ এবং ঘটনা বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় তা বিশ্লেষণ করে যৌক্তিকভাবে পরিবেশন করা। যার প্রতিটি স্তরে স্তরে থাকবে আল্লাহর দেয়া আইন-বিধানের কল্যাণকারিতার যৌক্তিক বিশ্লেষণ। পাশাপাশি মানুষের তৈরি আইন-বিধানের স্বার্থন্মুখ কদার্য্যতা তুলে ধরা। কিন্তু তা কোনোক্রমেই যুক্তির সীমা ছাড়াবে না।

চলচ্চিত্র ও নাটক তৈরির ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা দরকার, **এক.** গল্প ও উপন্যাস লেখকদেরকে কাউকে অনুসরণ বা মডেল না করে শুধুমাত্র আদর্শকে ভিত্তি করে নিখাঁদ মৌলিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করা। **দুই.** চলচ্চিত্র ও নাটক যারা তৈরি করবেন তারা যেন প্রথমেই উক্ত বিষয়ে টেকনিক্যাল জ্ঞান অর্জন করে নেন। এই দু'টি মৌলিক বিষয় আয়ত্তের ওপর নির্ভর করে বৃহত্তর মিডিয়াতে আদর্শকে বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার যোগ্যতা।

উপসংহার

কোনো বিষয়ে ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে চর্চা করলে সেই বিষয়টি যখন সাংস্কৃতিক বিষয় হয় তখন তা বিকৃত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আপোষ করা চলবে না। জাতে ওঠার নামে জাহিলিয়া চাকচিক্যতায় কোনোভাবেই নিজের চোখ ঝলসানো উচিত নয়। অথবা জাহিলিয়াতের কোনো নামকরা লোককে কাছে এনে নিজেকে সম্মানিত করে তোলার মিথ্যা ভণ্ডামিতেও যেন নিজেকে নিমগ্ন না করি। রাসূল [সা] বলেছেন, ''যে ব্যক্তি কোনো বিদায়াতপন্থি ব্যক্তিকে কোনো সম্মান ও মর্যাদা দান করে সে আসলে ইসলামেরই প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া দেয়ার কাজে সাহায্য করে।'' তাই জাহিলিয়াতের সিঁড়িতে পা রেখে নিজেকে ভাগ্যবানের বদলে গোনাহগার যে ভাবতে পারে সেইতো ইসলামের প্রাসাদ সুদৃঢ় করে। তাবুক যুদ্ধে হযরত কা'ব ইবনে মালিকের [রা] মতো। গাসসান বাদশা রেশমী কাপড়ে মোড়া চিঠিতে লিখেছিল, ''তোমাদের মনিব তোমার ওপর জুলুম করছে, আমার কাছে চলে এসো, তোমাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবো।'' কা'ব [রা] চিঠিখানি আগুনে পুড়িয়ে সাজদায় পড়ে গেলেন। ''ইয়া আল্লাহ আমি কতবড় গোনাহগার, এ কতবড় মসিবত যে আজ কাফেররা আমাকে সম্মান দেখানোর জন্য ডাকছে।''

আমরা জানি সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমরা ছায়াকে অনুসরণ করি। কিন্তু বিষষটা যদি এমন দৃষ্টিতে আমরা দেখি যে, আমরা ছায়াকে ধরতে চাচ্ছি কিন্তু সে পালিয়ে পালিয়ে আমাদেরকে তার পেছনে ছুটতে বাধ্য করছে। জহিলিয়াতও তেমনি, একজন মুমিনের কাছে সে ছায়া

www.pathagar.com

সমতুল্য। জীবনপাত হয়ে যাবে, ছায়ার পেছনে দৌড়াবার নেশা ফুরাবে না। তাই খাঁটি মুমিন জাহিলিয়াত নামক ছায়ার পেছনে দৌড়ায় না।

মরণের পরে যেনো 'নাম' থাকে মানুষের অন্তরে
বুদ্ধি আর শ্রমের যতো ঘাম সেদিকেই ছুটে মরে
জাহিলি জীবনের এই অন্ধকার
কুল নেই তীর নেই যেনো সীমাহীন চরাচর
প্রতিযোগিতায় মত্ত এতেই
দুনিয়ার ইনসানে—
জাহিলি জীবনে।

সূর্যের তেজে আমাদের চোখ জ্বলবে, গা পুড়বে; তবুও আমাদের সাহসী বীরের মতো শক্তভাবে সূর্যের দিকে অর্থাৎ সত্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, তখন ছায়া অর্থাৎ জাহিলিয়াত আমাদেরকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সাংস্কৃতিক কর্মীদেরকে চলচ্চিত্র, নাটক, উপন্যাস, গল্প, মিডিয়া যে দিকেই তার পদচারণা হোকনা কেন তা যেন সত্যের দিকে হয়। ইসলামের দিকে হয়। জাহিলিয়াত নামক ছায়ার পেছনে বোকার মতো সে যেন না দৌড়ায়। যেন ছায়া তাকে অনুসরণ করে। ■

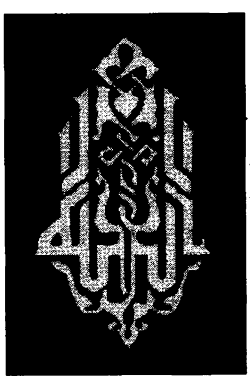

www.pathagar.com

বিশ্ব নবী [সা]-এর দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা

মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ

আরব দেশ, মরুভূমির দেশ। এখানে বসবাসের অনুকূল পরিবেশ না থাকায় নাগরিক জীবন ছিল যাযাবর। তারা যাযাবর হলেও মস্তিষ্ক ছিল কবিতা রসে ভরপুর। কেননা মানবজীবনে কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাই প্রতিটি মানুষ কিছু না কিছু কবিতা রচনা করত। নবী [সা]-এর সাহাবীগণ কবিতা রচনা ও আবৃত্তিতে খুবই পারদর্শী ছিল। তিনি [সা] কবিতাকে খুবই ভালোবাসতেন, নিজে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কারে ভূষিত করতেন।

বিশ্ব নবী [সা]-এর যুগে আরবী কবিতার ব্যাপক চর্চা হতো। অনেক সাহাবী কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করত। তিনি ছিলেন কবিতার প্রতি চরম অনুগ্রাহী ব্যক্তি। কবিতার সাথে নবী [সা] সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সু-মধুর। আজকে 'বিশ্ব নবী [সা]-এর দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা' প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে চাচ্ছি। কবিতা প্রসঙ্গে নবী [সা] বলেছেন-'নিশ্চয়ই কোনো কোনো কবিতায় জ্ঞানের কথা রয়েছে'। সত্যভাষী কবিদেরকে তিনি সব সময় প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। বিশ্ব নবী [সা]-এর মুখ নিসৃত বাণী প্রমাণ করে যে, কবিরা কবিতার মাধ্যমে জ্ঞান ভরা সুন্দর কথা উল্লেখ করে থাকেন। কবিতা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– 'এবং কবিদের সম্পর্কে বলা যায়, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে চাও না, তারা উপত্যকায় উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়, তদুপরি তারা মুখে যা বলে কাজে তা করে না। তবে যারা ইমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, এবং আল্লাহর স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য নয়'। এ আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, যারা ইমান এনেছে তারা কবিতার মাধ্যমেও আল্লাহর জিকির করে থাকে। হৃদয় মাঝে জমানো ভয় ভীতিকে কবিরা কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকেন। আরববাসীদের ভাষা ছিল আরবী। তাই তারা বিশুদ্ধ ভাষায় আরবী কবিতা লিখতো। রাসূল [সা] আরবী ভাষায় কথা বলতেন। আরবী ভাষার ব্যাপারে বিশ্ব নবী [সা] বলেছেন, 'তোমরা আরবদের তিন কারণে ভালোবাসবে, যেহেতু আমি আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী এবং জান্নাতবাসীদের ভাষাও আরবী'।

আরব জাতির বিশ্বাস ছিল যে, কবিরা বিশেষ বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী। ইসলামের পূর্বে জাহিলি বা অন্ধকার যুগে কবিরা গোত্রের মুখপাত্র, শান্তির পথপ্রদর্শক ও মন্ত্রণাদাতা এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে শৌর্য-বীর্যের 'প্রতীক' হিসেবে থাকতো। কারণ সে সময়ে শাসন ব্যবস্থা ছিল

www.pathagar.com

গোত্রভিত্তিক। গোত্রে গোত্রে মারামারি, যুদ্ধ ও লড়াই চলতো। মক্কায় বনু হাশিম এবং বনু উমায়্যা গোত্রের সমর্থকদের মাঝে তর্ক-বিতর্ক হতো। তর্ক-বিতর্কের সময় দু'দলের কবিরা নিজ নিজ গোত্রের প্রশংসা এবং অপর গোত্রের নিন্দা করে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করতো। কবিতা লড়াইয়ের পরে তাদের মাঝে শুরু হতো তরবারির লড়াই।

আরব দেশ, কবিতার দেশ। অধিকাংশ মানুষ কবিতা চর্চা করতো। তবে সে সময় কবিতা লিখে রাখাটা ছিল খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাই বিনোদনের জন্য প্রতি বছর সাহিত্য মেলা বসত। সমাজপতিরা মেলায় শ্রেষ্ঠ কবি কে পুরস্কৃত করতো। আরবী কবিতায় শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে প্রতি বছরেই কবি ইমরুল কায়েস পুরস্কৃত হতো। তার কবিতায় 'ভাষার প্রানঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা, উপমা, উৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, ছন্দের পরিপাট্য আর সর্বোপরি জীবন বোধের এক অপূর্ব দ্যোতনা বিদ্যমান'। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তদানীন্তন সময়ে কবিরা অশ্লীল ও প্রতিহিংসা মূলক কবিতা লিখতো বেশি। এসব কবির কবিতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনের আয়াত নাজিল করেছেন। আয়াত নাজিলের পর বিশ্ব নবী [সা]-এর কাছে বড় বড় কবিরা ছুটে আসেন। বড় বড় কবিদের মধ্যে-আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা [রা], কাব ইবনে মালিক [রা], হাসসান ইবনে সাবিত [রা]। তারা অশ্রুস্বজল চোখে বললেন, 'আমরা কবি, এখন আমাদের কী উপায় হবে'। তাদের মলিন মুখে নিরাশার কথা শোনে' বিশ্ব নবী [সা] বলেন, 'তোমরা সম্পূর্ণ সূরাটি পড়, ইমানদার ও নেককারদেরকে উদ্দেশ করে এ কথা বলা হয়নি'। বিশ্ব নবীর কথা শুনে, তখন কবিরা খুশি হয়ে ফিরে আসেন নিজ নিজ কাজে।

বিশ্ব নবী [সা]-এর শাসনামলে তাঁকে কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহর মনোনীত রাসূল [সা] হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। তাই তারা বিশ্ব নবী [সা]-কে কবি আখ্যা দিয়ে অমান্য করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহা নবী [সা] কবি ছিলেন না। তিনি জাহেলি যুগের কবিতা পছন্দ করতেন না। এ ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেন– 'আমি তাকে কবিতা রচনা করা শেখাইনি এবং তা তার মর্যাদার উপযুক্ত নয়'। পবিত্র কুরআনের বাণী প্রমাণ করে, তিনি কবি নন। তার কাজ কবিতা লেখা নয়। তবে কবিদের মর্যাদার চেয়ে বিশ্ব নবী [সা]-এর পদ মর্যাদা অনেক বেশি।

বিশ্ব নবী [সা] কবিতার প্রতি কৌতূহলী ছিলেন। পৌত্তলিক কবিদের নিন্দা, অপপ্রচার, ব্যঙ্গ এবং বিদ্রুপের জবাব দানের জন্য মদীনার সর্ব শ্রেষ্ঠ তিনজন কবি তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। তারা হলেন–হযরত কাব বিন মালিক [রা] ও হাসসান বিন ছাবিত [রা] এবং আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। হাস্‌সান ইবন সাবিত ও কাব ইবন যুহাইর [রা] কবিতা লিখে প্রতিপক্ষ কবিদের জবাব দিতেন। এ দু'জন কবি সর্বদা সভাকবি হিসেবে তাঁর পাশে উপস্থিত থাকতেন।

একদা হযরত কাব ইবন যুহাইর [রা] আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ [সা] আল্লাহপাক তো কবিতা পাঠের নিন্দা করেছেন। রাসূল [সা] বললেন, মুমিন তরবারির দ্বারাও জিহাদ করেন, আবার [মুখ] কবিতা দ্বারাও জিহাদ করেন। আর এই মৌখিক জিহাদই এমন, যেন তুমি তীর নিক্ষেপ করছো'। বিশ্ব নবীর এ কথা শুনে বুক টান করে এগিয়ে এলেন তিনজন মহান কবি। তারা হলেন হযরত হাসসান বিন সাবিত [রা], কাব ইবন মালিক [রা] এবং হযরত আব্দুল্লাহ

www.pathagar.com

ইবন রাওয়াহা [রা]। তাঁরা কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা শুরু করেন। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিহাদের শর্ত পূরণ করে কবিতা পাঠ করলেও জিহাদের কাজ হয়ে যায়।

ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে সেই সময়ের বিশ্বাসী কবিদের কবিতায় নব জীবন ফিরে আসে। তাঁরা কবিতার মাধ্যমে ইসলামী অনুপ্রেরণা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি হয় নতুন ঝর্ণাধারা। এভাবে সাহাবীদের কাছে থেকে কবিতা আবৃত্তি শুনে বিশ্ব নবী [সা] হয়ে উঠেন কবিতাপ্রেমী এক মহামানব। তিনি কবিতা রচনা ও কবিতা আবৃত্তি শুনে শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কারে ভূষিত করেন। আব্বাস ইবনে মিরদাস [রা] যখন হযরত রাসূল [সা]-এর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করেন, তখন তিনি [সা] তাকে কাপড় উপহার প্রদান করেন। এ দিকে হযরত কাব ইবন যুহাইর [রা] ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে ইসলামকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেন। সে কবিতা শুনে হযরত রাসূল [সা] তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। অবশেষে আশ্রয়হীন হয়ে মদীনায় চলে যান। হযরত আবু বকর [রা]-এর মাধ্যমে দরবারে নবীতে উপস্থিত হন এবং রাসূলে উদ্দেশ্যে তার বিখ্যাত 'বানত্ সু'আদু' রচিত কবিতাটি পাঠ করেন। রাসূল [সা] তাঁর কবিতা শুনে খুশি হন এবং নিজের গায়ের চাদর তাঁকে উপহার দেন। পরবর্তীতে সেই চাদরটি আমিরে মুয়াবিয়া [রা] বিশ হাজার, কেউ বলেন ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে কিনে নেন। শুধু কি তাই! হযরত কাব ইবন যুহাইর [রা] ছিলেন-'বানাত সুয়াদ' কবিতার জন্য রাসূল [সা]-এর পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত একজন কবি।

মহানবী [সা]-এর সাহাবীগণের মধ্যে অনেক সাহাবী ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা লিখে প্রতিপক্ষ ঘায়েল করতেন। মহানবী [সা]-এর সভাকবি হাসসান বিন সাবিত [রা] ছিলেন মক্কা, মদীনা এবং তায়েফের শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর ছেলে হযরত আব্দুর রহমান ও নাতি হযরত সাইদও কবি ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা আরবের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতা রাসূল [সা] নিজে পাঠ করতেন। তোরফা জাহিলি যুগের কবি হলেও তার বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার কবিতা রাসূল [সা] নিজে পাঠ করতেন। জগদ্বিখ্যাত আরবী সাহিত্য 'সাবায়ে মুয়াল্লাকার' ২য় 'মুয়াল্লাকা' তাঁর রচিত কবিতা। নাবিগা ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি জাহিলি ও ইসলামী দু'টি যুগেই পেয়েছেন। হযরত লবিদ [রা] একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কবিতা লেখা পরিত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে লবিদ [রা] মন্তব্য করেন, 'কবিতার পরিবর্তে আল্লাহ আমাকে বিরাট সম্পদ [ইসলাম] দান করেছেন। তার ব্যাপারে 'হযরত আবু হুরাইরা [রা] থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী [সা] বলেন, কবিদের মধ্যে লবিদ সবচেয়ে সত্য কথা বলেছেন। সে বলেছেন, মহান আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই ধ্বংসশীল'। বিশ্ব নবী [সা] খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটির অর্থ হলো– 'আল্লাহর নামে শুরু করি কাজ, যার অসিলায় পেলাম পথের দিশা, করি যদি কেউ অন্যের ইবাদত,...।

বিশ্ব নবী [সা]-এর অনেক সাহাবী শ্রেষ্ঠ কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক [রা], হযরত উমর [রা], হযরত উসমান [রা], হযরত আলী [রা], আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা [রা], কাব ইবনে মালিক [রা], হাসসান ইবনে সাবিত [রা] হযরত কাব ইবন যুহাইর

www.pathagar.com

[রা], হযরত লবিদ, হযরত নাবিগা [রা], হযরত আবু আইয়ুব আল হুযলী [রা], আমর ইবনে মদী করিব [রা], হযরত হামযা [রা], হযরত আলীর [রা] পুত্র হাসান [রা] কবিতা রচনা করতেন। হযরত আব্বাস [রা]সহ অনেক সাহাবী কবিতা রচনা করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস [রা] কবিতার সমঝদার ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর [রা] কবি ও কবিতা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। তাছাড়া তিনি নিজেও কিছু কবিতা রচনা করেছেন। হযরত ওসমান [রা] কিছু কবিতা লিখেছেন। হযরত আলীর [রা] 'দীওয়ানে-ই আলী' ছিল বিখ্যাত একটি কবিতা গ্রন্থ। বিশ্ব নবী [সা]-এর কনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতিমা [রা] ছিলেন একজন কবি। বিশ্ব নবী [সা]-এর ওফাতের পর তিনি [রা] একটি শোক গাঁথা কবিতা লিখেন। কবিতাটির অনুবাদ হচ্ছে– "বৃষ্টি ব্যতীত মাটির যে অবস্থা হয়, তোমাকে হারিয়ে আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। তুমি গিয়েছো এবং অহি আসাও বন্ধ হয়েছে"। তিনি আরো লিখেছেন– "আহ তোমার তিরোধানের পূর্বে যদি আমার মৃত্যু হতো, তাহলে তুমি দুঃখ করতে এবং তোমার ও আমার মধ্যে মাটির স্তূপে ব্যবধানের সৃষ্টি করতো"। হযরত ফাতিমার [রা] পিতা হারা বেদনায় হৃদয় ছিল ভারাক্রান্ত। এছাড়া অন্যান্য মুসলিম কবিদের মধ্যে–হযরত হাফসা [রা], হযরত খানসা [রা]-এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিশ্ব নবী [সা] কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন, "কবিতা সুসামঞ্জস্য কথামালা, যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ সে কবিতাই সুন্দর। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে সে কবিতায় মঙ্গল নেই। কবিতা কথার মতোই। ভালো কথা যেমন সুন্দর, ভালো কবিতাও তেমনি সুন্দর এবং মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতোই মন্দ"। রাসূলের [সা] এই উচ্চারণই হোক আমাদের সাহিত্যের মৌলিক আদর্শ।

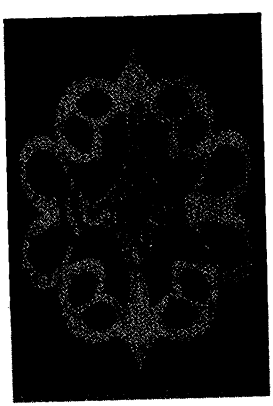

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ এক সাহাবী-কবি

মুস্তাফা মনজুর

সাহাবী-কবি হাস্‌সান বিন সাবিত [রা]। রাসূলের [সা] যুগের এক শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবি-খ্যাতি ছিল গোটা আরবজুড়ে। সবার মুখে মুখে উচ্চারিত হতো তাঁর কবিতার পংক্তি। তিনি রাসূলকে [সা] পেয়েছিলেন অনেক কাছে। রাসূলের [সা] ভালোবাসাও পেয়েছিলেন অনেক বেশি। রাসূলের [সা] প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসায় অভিষিক্ত ছিলেন তিনি। সব মিলিয়ে এক সৌভাগ্যবান কবি ছিলেন হাস্‌সান বিন সাবিত। রাসূলকে [সা] তিনি ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। তাঁর সেই ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না। 'তোমার তারিফ' কবিতায় রাসূলের [সা] প্রতি তাঁর সেই ভালোবাসার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। যেমন–

"তোমার চোখের মতো ভালো চোখ পৃথিবীতে নেই,
এবং কোনো মাতা এমন সুন্দর পুত্র আর
প্রসব করেনি জানি বিশ্বে কোথাও।

তোমার সৃজন সে তো একেবারে দোষমুক্ত করে
এবং তুমিও তাই চেয়েছিলে আপন ইচ্ছায়;
তোমার তারিফ এই পৃথিবীতে বেড়েই চলেছে
যেমন কস্তুরী ঘ্রাণ বাতাসে কেবলি ছুটে চলে।

তোমার সৌভাগ্য, যার নেই কোনো সীমা-পরিসীমা
সমুদ্র পানির মতো তোমার হাতের দয়ারাশি
এবং তোমার দান নদীর মতোন বেগে চলে।
আল্লাহ সহায় হোন হে রাসূল তোমার উপরে
কেননা শত্রুরা জ্বলে সর্বক্ষণ তোমার ঈর্ষায়।
তোমার প্রশংসা করি আমার তেমন ভাষা নেই
আমি তো নগণ্য কবি অন্তত ভাষার দিকে থেকে
প্রশংসা পায় না নবী নিছক আমার এ ভাষায়
নবীর ছোঁয়াচ পেয়ে এ কবিতা অমরত্ব পাবে।"

কবি হাস্‌সান বিন সাবিত হিজরতের প্রায় ঘাট বছর পূর্বে ৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়াছরিবে [মদীনা] জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নির্মিত মসজিদে নববীর পশ্চিম প্রান্তে বাবে রহমতের বিপরীত দিকে অবস্থিত ফারে কিল্লাটি ছিল তাঁদের পৈত্রিক আবাসস্থল। কবি হাস্‌সানের কবিতায় এর

www.pathagar.com

একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি শৈশব থেকে কবি হিসেবে বেড়ে ওঠেন এবং কবিতাকে জীবিকার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। এটা একটি দৃষ্টান্তমূলক বিষয়ও বটে।

প্রাচীন আরবের জিল্লাক ও হীরার রাজপ্রাসাদে কবির যাতায়াত ছিল। তবে গাস্সানীয় সম্রাটদের প্রতি একটু বেশি দুর্বল ছিলেন তিনি। কবি হাস্সানের সাথে তাঁদের একটা গভীর হৃদ্যতার সম্পর্কও গড়ে ওঠে। তিনি তাঁদের প্রশংসায় বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। তার কিছু অংশ সাহিত্য সমালোচকগণ হাস্সানের শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে গণ্য করেছেন। সম্রাটগণও সেসব কবিতার প্রতিদানে তাঁর প্রতি যথেষ্ট বদান্যতাও তাঁরা প্রদর্শন করেন। তাঁদের এ সম্পর্ক ইসলামের পরেও বিদ্যমান ছিল।

কবি হাস্সান বিন সাবিত যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর জীবনে বার্ধক্য এসে গিয়েছিল। মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে তিনি মুসলমান হন। রাসূলুল্লাহর [সা] মদীনায় হিজরতের সময় হাস্সানের বয়স ছিল ষাট বছর।

রাসূলুল্লাহর [সা] আর্বিভাব বিষয়ে কবি হাস্সান বলেন : আমি তখন সাত/আট বছরের এক চালাক-চতুর বালক মাত্র। যা কিছু শুনতাম তাই বুঝতাম। একদিন এক ইহুদিকে ইয়াছরিবের একটি কিল্লার ওপর উঠে চিৎকার করে মানুষকে ডাকতে শুনলাম। মানুষ জড় হলে সে বলতে লাগলো :

"আজ রাতে আমাদের নক্ষত্র উদিত হয়েছে। আহমাদকে আজ নবী করে দুনিয়ায় পাঠানো হবে।"

কবি হাস্সান বিন সাবিত ছিলেন একজন বাগ্মী ও বীর যোদ্ধা। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। একবার ইবন আব্বাসকে বলা হলো হাস্সান আল লাঈন [অভিশপ্ত হাস্সান] এসেছে। কবি হাস্সান বিন সাবিত বললেন :

"হাস্সান অভিশপ্ত নন। তিনি জীবন ও জিহ্বা দিয়ে রাসূলুল্লাহর [সা] সাথে জিহাদ করেছেন।"

খন্দক মতান্তরে উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল [সা] মুসলিম মহিলাদেরকে কবি হাস্সানের ফারে দুর্গে নিরাপত্তার জন্য রেখে যান। তাদের সাথে কবি হাস্সানও ছিলেন। এই মহিলাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহর [সা] ফুফু সাফিয়্যা বিনত আবদুল মুত্তালিবও ছিলেন। একদিন এক ইহুদিকে তিনি কিল্লার চতুর্দিকে ঘুর ঘুর করতে দেখলেন। তিনি চিন্তিত হলেন, যদি মহিলাদের অবস্থান জেনে যায় তাহলে ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কারণ রাসূল [সা] তাঁর বাহিনী নিয়ে তখন প্রত্যক্ষ জিহাদে লিপ্ত। তিনি হাস্সানকে বললেন, এই ইহুদিদেরকে জানিয়ে দেবে। হাস্সান বললেন, আপনার জানা আছে আমার নিকট এর কোনো প্রতিকার নেই। আমার মধ্যে যদি সেই সাহসই থাকতো তাহলে আমি রাসূলুল্লাহর [সা] সাথেই থাকতাম। সাফিয়্যা তখন নিজেই তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে নিয়ে ইহুদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করেন।

সাফিয়্যা লোকটিকে হত্যার পর মাথাটি কেটে এনে হাস্সানকে বলেন, ধর এটা দুর্গের নিচে ইহুদিদের মধ্যে ফেলে এসো। তিনি বললেন : এ আমার কাজ নয়। অতঃপর সাফিয়্যা নিজেই মাথাটি ইহুদিদের মধ্যে ছুড়ে মারেন। ভয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

হাস্সান [রা] জিহ্বা দিয়েও রাসূলে কারীমের সাথে জিহাদ করেছেন। বানূ নাদীরের যুদ্ধে রাসূল [সা] যখন তাদেরকে অবরুদ্ধ করেন তখন তাদের গাছপালা জ্বালিয়ে দেন তার সমর্থনে হাস্সান কবিতা রচনা করেন। বানূ নাদীর ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য ও সহযোগিতা চুক্তি ছিল। তাই তিনি কবিতায় কুরাইশদের নিন্দা করে বলেন, মুসলমানরা বানূ নাদীরের বাগ-

www.pathagar.com

বাগিচা জ্বালিয়ে দিল, তোমরা তো তাদের কোনো উপকারে আসোনি। তাঁর সেই কবিতার কিছু অংশ এরকম :

"যারা কুরাইশদের সাহায্য করেছিল তারা পরস্পর পরস্পরকে হারালো।
তাদের নিজের শহরেই তাদের কোনো সাহায্যকারী ছিল না।
তারা সেই সব লোক যাদেরকে কিতাব [গ্রন্থ] দান করা হয়েছিল।
কিন্তু তারা তা বিনষ্ট করে ফেলেছে।
তারা এখন তাওরাত থেকে অন্ধ হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে।"
"তোমরা আল-কুরআন অস্বীকার করেছো।
অথচ সতর্ককারী যা বলেছিলেন তার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলে।
অতএব, বানূ লুআয়-এর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের জন্যে [ইয়াছরীবের]
আল-বুওয়ায়রা' স্থানটি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে।"

এ কবিতা মক্কায় পৌঁছালে কুরাইশ কবি আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ বলেন : আল্লাহ সর্বদা তোমাদের এমন কর্মশক্তি দান করুন, যাতে আশপাশের আগুনে খোদ মদীনা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর আমরা দূরে বসে তামাশা দেখবো। আবু সুফিয়ানের সেই কবিতাটির তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হলো :

"আল্লাহ এমন কাজ চিরস্থায়ী করুন এবং
প্রজ্বলিত আগুনে তার চারিপাশকে জ্বালিয়ে দিন।
আমাদের মধ্য থেকে কে সেখান থেকে দূরে থাকবে,
তুমি খুব শিগগির তা জানতে পারবে।
তুমি আরো জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কাদের ভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
সেই খেজুর বাগানে যদি যাত্রীদল বা কাফিলা অবস্থান করতো
তাহলে তারা বলতো,
এখানে তোমাদেরকে অবস্থান করতে দেয়া হবে না।
তোমরা চলে যাও।"

পৌত্তলিক কবিদের নিন্দা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও অপপ্রচারের জবাব দানের জন্য তৎকালীন আরবের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি মদীনায় রাসূলুল্লাহর [সা] পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা হলেন হাস্‌সান ইবন ছাবিত, কাব ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। হাস্‌সান ও কাব প্রতিপক্ষ কবিদের জবাব দিতেন তাদেরই মত বিভিন্ন ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহের জয়-পরাজয়, কীর্তি ও গৌরব তুলে ধরে, আর আবদুল্লাহ তাদের কুফরী ও দেব-দেবীর পূজার কথা উল্লেখ করে ধিক্কার দিতেন।

হাস্‌সান [রা] আল্লাহ ও রাসূলের [সা] প্রতি কুরাইশদের অবাধ্যতা ও তাদের মূর্তিপূজার উল্লেখ করে নিন্দা করতেন না। কারণ তাতে তেমন ফল না হওয়ারই কথা। তারা তো রাসূলকে [সা] বিশ্বাসই করেনি। আর মূর্তি পূজাকেই তারা সত্য বলে বিশ্বাস করতো। তাই তিনি তাদের বংশগত দোষ-ত্রুটি, নৈতিকতার স্খলন, যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে তাদেরকে চরমভাবে আহত করতেন। আর একাজে আবূ বকর [রা] তাঁকে জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন।

প্রাচীন আরবী কবিতার যতগুলো বিষয় বৈচিত্র্য আছে তার সবগুলোতে কবি হাস্‌সানের [রা] পদচারণা পাওয়া যায়। এখানে সংক্ষেপে তাঁর কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

www.pathagar.com

একথা সত্য যে প্রাচীন আরবী কবিতা কোনো উন্নত সভ্যতার মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। তবে একথাও অস্বীকার করা যাবে না, বড় সভ্যতা দ্বারা তা অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছে। আরব সভ্যতার সত্যিকার সূচনা হয়েছে পবিত্র কুরআনের অবতরণ ও রাসূলুল্লাহর [সা] আবির্ভাবের সময় থেকে। কুরআন আরবী বাচনভঙ্গি ও বাক্যালঙ্কারের সবচেয়ে বড় বাস্তব মুজিযা। এই কুরআন অনেক বড় বড় বাগ্মীকে হতবাক করে দিয়েছে। একারণে সে সময়ের যে কবি ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁর মধ্যে বাকপটুতা ও বাক্যালঙ্কারের এক নতুন শক্তির সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণির কবিদের মধ্যে হাস্‌সান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শক্তি তাঁর মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কিরামের গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–সিজদার চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে স্পষ্ট বিদ্যমান। হাস্‌সান উক্ত আয়াতকে উসমানের [রা] প্রশংসায় রূপক হিসেবে ব্যবহার করে হত্যাকারীদের ধিক্কার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> "তারা এই কাঁচা-পাকা কেশধারী, ললাটে সিজদার চিহ্ন বিশিষ্ট লোকটিকে
> জবাই করে দিল,
> যিনি তাসবীহ পাঠ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে
> রাত অতিবাহিত করতেন।"

এই শ্লোকে কবি উসমানের চেহারাকে সিজদার চিহ্নধারী বলেছেন। তৎকালীন আরবী কবিতায় এ জাতীয় রূপকের প্রয়োগ সম্পূর্ণ নতুন।

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রে তাতবী বা তাজাওয়ায নামে একপ্রকার প্রতীকের নাম দেখা যায়। তার অর্থ হলো কবি কোনো বিষয়ের আলোচনা করতে যাচ্ছেন। কিন্তু অকস্মাৎ অতি সচেতনভাবে তা ছেড়ে দিয়ে এমন এক বিষয়ের বর্ণনা করেন যাতে তাঁর পূর্বের বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। কবি হাস্‌সানের কবিতায় এ জাতীয় প্রতীক বা ইঙ্গিতও পাওয়া যায়।

আরবে অসংখ্য গোত্র দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে বসবাস করতো। তারা ছিল যাযাবর। যেখানে পানি ও পশুর খাদ্য শেষ হলে নতুন কোনো স্থানের দিকে যাত্রা করতো। এভাবে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতো। আরব কবিরা তাদের কাব্যে এ জীবনকে নানাভাবে ধরে রেখেছেন। তবে কবি হাস্‌সান বিষয়টি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে বেশ অভিনবত্ব আছে। তিনি বলেছেন :

> "জাফনার সন্তানরা তাদের পিতা ইবন মারিয়্যার
> কবরের পাশেই থাকে, / যিনি খুবই উদার ও দানশীল।"

প্রশংসিত ব্যক্তি যেহেতু আরব বংশোদ্ভূত। এ কারণে তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করে বলে দিলেন, এরা আরব হলেও যাযাবর নন, বরং রাজন্যবর্গ। কোনো রকম ভীতি ও শঙ্কা ছাড়াই তাঁরা তাঁদের পিতার কবরের আশপাশেই বসবাস করেন। তাঁদের বাসস্থান সবুজ-শ্যামল। একারণে তাঁদের স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে বেড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না।

আরব কবিরা কিছু কথা রূপক অর্থে এবং পরোক্ষভাবে বর্ণনা করতেন। যেমন :

যদি উদ্দেশ্য হয় একথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অতি মর্যাদাবান ও দানশীল, তাহলে তাঁরা বলতেন, এই গুণগুলো তার পরিচ্ছেদের মধ্যেই আছে। কবি হাস্‌সানের [রা] কবিতায় রূপকের অভিনবত্ব দেখা যায়। যেমন একটি শ্লোকে তিনি বলতে চান–

www.pathagar.com

"আমরা খুবই কুলিন ও সম্ভ্রান্ত।"
কিন্তু কথাটি তিনি বলেছেন এভাবে :
"সম্মান ও মর্যাদা আমাদের আঙ্গিনায় ঘর বেঁধেছে এবং
তার খুঁটি এত মজবুত করে গেড়েছে যে,
মানুষ তা নাড়াতে চাইলেও নাড়াতে পারে না।"

এই শ্লোকে সম্মান ও মর্যাদার ঘর বাঁধা, সুদৃঢ় পিলার স্থাপন করা এবং তা টলাতে মানুষের অক্ষম হওয়া এ সবই আরবী কাব্যে নতুন বর্ণনারীতি।

ছন্দ, অন্ত্যমিল ও স্বর সাদৃশ্যের আশ্চর্য রকমের এক সৌন্দর্য তাঁর কবিতায় দেখা যায়। শব্দের গাঁথুনি ও বাক্যের গঠন খুবই শক্ত, গতিশীল ও সাবলীল। প্রথম শ্লোকের প্রথম অংশের শেষ পদের শেষ বর্ণটি তাঁর বহু কাসীদার প্রতিটি শ্লোকের শেষ পদের শেষ বর্ণ দেখা যায়। আরবী ছন্দ শাস্ত্রে যাকে কাফিয়া বলা হয়। আরবী বাক্যের এ ধরনের শিল্পকারিতা এর আগে কেবল ইমরুল কায়সের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তবে তাঁর পরে বহু আরব কবি নানা রকম শিল্পকারিতার সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। আব্বাসী আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি আবুল আলা মা আরবীর একটি বিখ্যাত কাব্যের নাম 'লুযূমু মালা ইয়ালযাম'। কবিতা রচনায় এমন কিছু বিষয় তিনি অপরিহার্যরূপে অনুসরণ করেন, যা আদৌ কবিতার জন্য প্রয়োজন নয়। তার এ কাব্যগ্রন্থটি এ ধরনের কবিতার সমষ্টি। এটা তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

কবি হাস্‌সানের কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি প্রায়ই এমন সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা ব্যাপক অর্থবোধক। তিনি হয়তো একটি ভাব স্পষ্ট করতে চেয়েছেন এবং সেজন্য এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করেছেন যাতে উদ্দিষ্ট বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় সুন্দরভাবে এসে গেছে। কবি হাস্‌সানের ইসলামী কবিতা যাবতীয় অতিরঞ্জন ও অতিকথন থেকে মুক্ত বলা চলে। একথা সত্য যে কল্পনা ও অতিরঞ্জন ছাড়া কবিতা হয় না। তিনি নিজেই বলতেন, মিথ্যা বলতে ইসলাম নিষেধ করেছে। এ কারণে অতিরঞ্জন ও অতিকথন, যা মূলত মিথ্যারই নামান্তর–আমি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি।

শুধু তাই নয়, তাঁর জাহিলি আমলে লেখা কবিতায়ও এ উপাদান খুব কম ছিল। আর এ কারণে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ কবি আন-নাবিগা কবি হাস্‌সানের একটি শ্লোকের অবমূল্যায়ন করলে দুই জনের মধ্যে ঝগড়া হয়।

কবি হাস্‌সানের ইসলামী কবিতার মূল বিষয় ছিল কাফিরদের প্রতিরোধ ও নিন্দা করা। কাফিরদের হিজা ও নিন্দা করে তিনি বহু কবিতা রচনা করেছেন। তবে তাঁর সেই কবিতাকে অশ্লীলতা স্পর্শ করতে পারেনি। তৎকালীন আরব কবিরা হিজা বলতে নিজ গোত্রের প্রশংসা এবং বিরোধী গোত্রের নিন্দা বুঝাতো। এই নিন্দা হতো খুবই তীর্যক ও আক্রমণাত্মক। এ কারণে কবিরা তাদের কবিতায় সঠিক ঘটনাবলি প্রাসঙ্গিক ও মনোরম ভঙ্গিতে তুলে ধরতো। জাহিলি কবি যুহায়র ইবন আবু-সুলমার হিজা বা নিন্দার একটি স্টাইল আমরা তার দুটি শ্লোকে লক্ষ্য করি। তিনি হিসন গোত্রের নিন্দায় বলেছেন :

"আমি জানিনে।
তবে মনে হয় খুব শিগ্‌গির জেনে যাব।
হিসন গোত্রের লোকেরা পুরুষ না নারী?

www.pathagar.com

যদি পর্দানশীল নারী হয় তাহলে তাদের
প্রত্যেক কুমারীর প্রাপ্য হচ্ছে উপহার।"

যুহায়রের এ শ্লোকটি ছিল আরবী কবিতার সবচেয়ে কঠোর নিন্দাসূচক। এ কারণে শ্লোকটি উক্ত গোত্রের লোকদের দারুণ পীড়া দিয়েছিল। হাস্‌সানের নিন্দাবাদের মধ্যে শুধু গালিই থাকতো না, তাতে থাকতো প্রতিরোধ ও প্রতিউত্তর। তাঁর স্টাইলটি ছিল অতি চমৎকার। কুরাইশদের নিন্দায় রচিত তাঁর একটি কবিতার শেষের শ্লোকটি সেকালে এতখানি জনপ্রিয়তা পায় যে তা প্রবাদে পরিণত হয়। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

"আমি জানি যে তোমার আত্মীয়তা কুরাইশদের সাথে আছে।
তবে তা এ রকম যেমন উট শাবকের সাথে উট পাখির ছানার সাদৃশ্য হয়ে থাকে।"

পরবর্তীকালে কবি ইবনুল মুফারিগ উল্লিখিত শ্লোকটির ১ম পংক্তিটি আমীর মুআবিয়ার [রা] নিন্দায় প্রয়োগ করেছেন। আল হারেছ ইবন আউফ আল-মুররীর গোত্রের বসতি এলাকায় রাসূলুল্লাহ [সা] প্রেরিত একজন মুবাল্লিগ নিহত হলে কবি হাস্‌সান তার নিন্দায় একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি বলেন :

"যদি তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাক
তাহলে তা এমন কিছু নয়।
কারণ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তোমাদের স্বভাব।
আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মূল থেকেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ অঙ্কুরিত হয়।"

কবি হাস্‌সানের এই বিদ্রূপাত্মক কবিতা শুনে আল-হারেছের দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন নেমে আসে। তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] দরবারে ছুটে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং হাস্‌সানকে বিরত রাখার আবেদন জানান।

কবি হাস্‌সান [রা] চমৎকার মাদাহ বা প্রশংসা গীতি রচনা করেছেন। আলে ইনানের প্রশংসায় তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেছেন তার দু'টি শ্লোক এ রকম :

"যারা তাদের নিকট যায় তাদেরকে
তারা বারীস নদীর পানি স্বচ্ছ শরাবের সাথে
মিশিয়ে পান করায়।"

এই শ্লোকটিরই কাছাকাছি একটি শ্লোক রচনা করেছেন কবি ইবন কায়স, মুসআব ইবন যুবায়রের প্রশংসায়। কিন্তু যে বিষয়টি হাস্‌সানের শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে তা ইবন কায়সের শ্লোকে অনুপস্থিত। অন্য একটি শ্লোকে তিনি গাসসানীয় রাজন্যবর্গের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন চমৎকার ভঙ্গিতে। যেমন :

"তাঁদের গৃহে সব সময় অতিথিদের এত ভিড় থাকে যে
তাঁদের কুকুরগুলোও তা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
এখন আর তারা অন্ধকার রাতে
নতুন আগন্তুককে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।"

একবার কবি কাব ইবন যুহায়র একটি শ্লোকে গর্ব করে বলেন: কাবের মৃত্যুর পর কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিলের কী দশা হবে?

শ্লোকটি শোনার সাথে সাথে তৎকালীন আরবের বিখ্যাত কবি সাম্মাখের ভাই তোমরূয বলে উঠলেন : আপনি অবশ্যই সাবিতের ছেলে তীক্ষ্ণধী হাস্‌সানের মতো কবি নন।

www.pathagar.com

কবি হাস্‌সানের [রা] সকল কবিতা বহুদিন যাবত মানুষের মুখে মুখে ও অন্তরে সংরক্ষিত ছিল। পরে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। তাঁর কবিতার একটি দিওয়ান আছে যা ইবন হাবীব বর্ণনা করেছেন। তবে এতে সংকলিত বহু কবিতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ইমাম আল-আসমাঈ একবার বললেন : হাস্‌সান একজন খুব বড় কবি। একথা শুনে আবু হাতেম বললেন : কিন্তু তাঁর অনেক কবিতা খুব দুর্বল। আল-আসমাঈ বললেন : তাঁর প্রতি আরোপিত অনেক কবিতাই তাঁর নয়। ইবন সাল্লাম আল জুমাহী বলেন : হাস্‌সানের মানসম্পন্ন কবিতা অনেক। যেহেতু তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে প্রচুর কবিতা লিখেছেন, এ কারণে পরবর্তীকালে বহু নিম্নমানের কবিতা তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। মূলত তিনি সেসব কবিতার রচয়িতা নন।

কবি হাস্‌সান রাসূলকে [সা] অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসূলের [সা] প্রতিটি বিষয়ে তিনি খেয়াল রাখতেন এবং রাসূলকে [সা] অনুসরণ করতেন। রাসূলের [সা] কাছ থেকেই তিনি কবিতার প্রেরণা ও প্রণোদনা পেতেন। তাঁর 'রাহবার' কবিতাটি সামনে রাখলে আমরা এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা করতে পারবো। যেমন :

"নবীজী আমার
দয়াময়ের দেখান পথ।
যারা করে তাঁর অনুসরণ
জাহান্নামের ভয়াবহতা থেকে তাদের দেন মুক্তি,
দেখান তাদের সঠিক পথ।
সবারই ইমাম তিনি,
সত্যের পথে হিদায়াত করেন কঠোর শ্রমে।
সত্যের শিক্ষক তিনি।

হে আমার কওম, শোন–
তাঁর অনুসরণেই খোলে সৌভাগ্যের দরোজা :
তাঁর আদর্শের উপস্থিতিতেই
পৃথিবী অভিষিক্ত হয় আল্লাহর নিয়ামতে।
সুষমাময় পথের তিনিই রাহবার।
এমন বিপদ আসে যদি
তাদের পক্ষে বহন করা যা দুঃসাধ্য
তখন তাঁর কাছেই থাকে সকল কঠিনের সহজ সমাধান।
হিদায়াত থেকে বিচ্যুত হওয়া উম্মতের জন্য
তিনি বড় কষ্ট পান।
তিনি তো কেবলই কামনা করেন
তাঁর উম্মতরা থাকবে সতত সরল পথে;
থাকবে তারা হিদায়াতের প্রশস্ত রাজপথে অটল, অনড়।"

মূলত কবি হাস্‌সান ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী–কবি। যার কবিতা আজও গোটা মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। তাঁর কবিতা আমাদের প্রেরণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাঁর কবিতা আমাদেরকে উজ্জীবিত করে চলেছে। বোধ করি এই ধারা অব্যাহত থাকবে কাল থেকে কালান্তরে।

www.pathagar.com

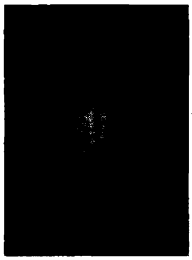

সত্যের সাম্পান

আবুল খাইয়ের আইউব

রাতের পরই আসে দিন।

আঁধারের পরই আসে আলো।

যখন উদিত হয় সূর্য তখন চারদিক কী ফকফকা!

তেমনি একটি জীবন– আলোকিত জীবন।

নাম হযরত উবাই [রা]।

হযরত উবাই বদর থেকে নিয়ে তায়িফ অভিযান পর্যন্ত রাসূলুল্লাহর [সা] জীবদ্দশায় যত যুদ্ধ হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে যোগদান করেন সাহসের সাথে।

কুরাইশরা বদরে পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে প্রতিশোধ নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করে দেয়।

উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কায় অবস্থানকারী রাসূলুল্লাহর [সা] চাচা হযরত আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তাবিল গোপনে বনী গিফার গোত্রের এক লোকের মাধ্যমে একটি পত্র রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট পাঠান। সেই পত্রে তিনি কুরাইশদের সকল গতিবিধি রাসূলকে [সা] অবহিত করেন।

লোকটি মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় পত্রখানি রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট হস্তান্তর করেন।

রাসূল [সা] পত্রখানা সেখানে উবাই ইবন কাবের দ্বারা পাঠ করিয়ে শোনেন এবং পত্রের বিষয় গোপন রাখার নির্দেশ দেন।

এই উহুদ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তিনি আহত হন।

হযরত রাসূল [সা] তাঁর চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক পাঠান।

চিকিৎসক তাঁর রগ কেটে স্থানে সেঁক দেয়।

উহুদ যুদ্ধের শেষে হযরত রাসূলে কারীম [সা] আহত-নিহতদের খোঁজ-খবর নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন :

তোমাদের কেউ একজন সাদ ইবন রাবীর খোঁজ নাও তো।

একজন আনসারী সাহাবী তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় শহীদদের লাশের স্তূপ থেকে খুঁজে বের করেন তাকে। এই আনসারী সাহাবী হলেন উবাই ইবন কাব।

www.pathagar.com

খন্দকযুদ্ধের প্রাক্কালে মক্কার কুরাইশ নেতা আবু সুফাইয়ান, আবু উসামা আল-জাশামীর মারফত একটি চিঠি রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট পাঠান। সেই চিঠিও রাসূল [সা] উবাইয়ের দ্বারা পাঠ করান।

তেমনিভাবে হিজরী ২য় সনের রজব মাসে রাসূল [সা] আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আল-আসাদীর নেতৃত্বে একটি বাহিনী নাখলা অভিমুখে পাঠান।

যাত্রাকালে তিনি আবদুল্লাহর হাতে একটি সিলকৃত চিঠি দিয়ে বলেন : দুই রাত একাধারে চলার পর চিঠিটি খুলে পাঠ করবে এবং এর নির্দেশ মতো কাজ করবে।

রাসূল [সা] এই চিঠিটি উবাইয়েরর দ্বারা লেখান।

হিজরি ৯ম সনে যাকাত ফরজ হলে রাসূল [সা] আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন।

তিনি উবাইকে বালী, আজরা এবং বনী সাদ গোত্রে যাকাত আদায়কারী হিসেবে পাঠান।

তিনি অত্যন্ত দ্বীনদারী ও সততার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন।

একবার এক জনবসতিতে গেলেন যাকাত আদায় করতে। নিয়ম অনুযায়ী এক ব্যক্তি তার সকল গবাদিপশু উবাইয়ের সামনে হাজির করে, যাতে তিনি যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারেন।

উবাই উটের পাল থেকে দুই বছরের একটি বাচ্চা গ্রহণ করেন।

যাকাত দানকারী বললেন :

এতটুকু বাচ্চা নিয়ে কী হবে? এতো দুধও দেয় না, আরোহণেরও উপযোগী নয়। আপনি যদি নিতে চান এই মোটা তাজা উটনীটি নিন।

উবাই বললেন : আমার দ্বারা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহর [সা] নির্দেশের বিপরীত আমি কিছুই করতে পারি না। মদীনা তো এখান থেকে খুব বেশি দূর না, তুমি আমার সাথে চলো, বিষয়টি আমরা রাসূলকে [সা] জানাই। তিনি যা বলবেন, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবো।

লোকটি রাজি হলো। সে তার উটনী নিয়ে উবাইয়ের সাথে মদীনায় উপস্থিত হলো।

তাদের কথা শুনে রাসূল [সা] বললেন : এই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহলে উটনী দাও, গ্রহণ করা হবে। আল্লাহ তোমাকে এর প্রতিদান দেবেন।

লোকটি সন্তুষ্টচিত্তে উটনীটি দান করে বাড়ি ফিরে গেল।

হযরত রাসূলে কারীমের [সা] ইন্তিকালের পর হযরত আবুবকর [রা] খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু হয়।

সাহাবা-ই-কিরামের যে দলটির ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়, উবাই ছিলেন তাঁদের নেতা। তিনি কুরআনের শব্দাবলি উচ্চারণ করতেন, আর অন্যরা লিখতেন।

এই দলটির সকলেই ছিলেন উঁচু স্তরের আলিম। এই কারণে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো আয়াত সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হতো।

যখন সূরা আত-তাওবার ১২৭ নম্বর আয়াতটি লেখা হয় তখন দলের অন্য সদস্যরা বললেন, এই আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে।

হযরত উবাই বললেন : না। রাসূল [সা] এর পরে আরও দু'টি আয়াত আমাকে শিখিয়েছিলেন। সূরা আত-তাওবার ১২৮ নম্বর আয়াতটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে।

হযরত আবু বকরের [রা] ইন্তিকালের পর হযরত উমার [রা] তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

তিনি তাঁর খিলাফতকালে অসংখ্য জনকল্যাণ ও সংস্কারমূলক কাজের প্রবর্তন করেন।

www.pathagar.com

মজলিসে শূরা তার মধ্যে একটি।
বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে এই মজলিস গঠিত হয়। খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে উবাই এই মজলিসে সদস্য ছিলেন।
হযরত উমারের খিলাফতকালের গোটা সময়টা তিনি মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে কাটান। বেশিরভাগ সময় অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে ব্যয় করেন।
যখন মজলিসে শূরার অধিবেশন বসতো বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো খলিফা উমার [রা] তাঁর যুক্তি ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন।
হযরত উমারের [রা] খিলাফতকালের পুরো সময়টা তিনি ইফতার পদে আসীন ছিলেন। এছাড়া অন্য কোনো পদ তিনি লাভ করেননি।
একবার উমারকে [রা] জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাকে কোনো এক স্থানের ওয়ালি নিযুক্ত করেন না কেন?
উমার [রা] বললেন : আমি আপনার দ্বীনকে দুনিয়ার দ্বারা কলুষিত হতে দেখতে চাই না।
হযরত উমার [রা] যখন তারাবিহর নামাজ জামায়াতের সাথে আদায়ের প্রচলন করেন তখন উবাইকে ইমাম মনোনীত করেন।
উমার যেমন তাঁকে সম্মান করতেন তেমনি ভয়ও করতেন। তাঁর কাছে ফাতওয়া চাইতেন।
খলিফা উমারের [রা] বাইতুল মাকদাস সফরে উবাই তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।
খলিফার ঐতিহাসিক জাবিয়া ভাষণের সময় উপস্থিত ছিলেন।
বাইতুল মাকদাসের অধিবাসীর সাথে হযরত উমার [রা] যে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন তার লেখক ছিলেন হযরত উবাই।
উমারের পর হযরত উসমানের [রা] সময় খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআন মজিদের তিলাওয়াত ও উচ্চারণে বিভিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে। খলিফা উসমান [রা] শঙ্কিত হয়ে পড়লেন।
তিনি এই বিভিন্নতা দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।
তিনি শ্রেষ্ঠ ক্বারীদের ডেকে পৃথকভাবে তাঁদের তিলাওয়াত শুনলেন।
উবাই ইবন কাব আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস এবং মুয়াজ ইবন জাবাল– প্রত্যেকেরই উচ্চারণে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সকল মুসলমানকে একই উচ্চারণের কুরআনের ওপর ঐক্যবদ্ধ করতে চাই।
সেই সময় কুরাইশ ও আনসারদের মধ্যে ১২ ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআনে দক্ষ ছিলেন। খলিফা উসমান এই ১২ জনের ওপর এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। আর এই পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব দান করেন উবাই ইবন কাবকে।
তিনি শব্দাবলি উচ্চারণ করতেন, যায়িদ ইবন সাবিত লিখতেন।
আজ পৃথিবীতে যে কুরআন বিদ্যমান তা মূলত হযরত উবাইয়ের পাঠের অনুলিপি।
হযরত উবাইয়ের মৃত্যু সন নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে হযরত উসমানের [রা] খিলাফতকালে হিজরি ৩৯ সনের এক জুমার দিনে ইন্তিকাল করেন।
হযরত উসমান তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান এবং মদীনায় মারা যান।
আর ওয়াকিদী, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ প্রমুখের মতে তাঁর মৃত্যু হয় হিজরী ৩৯ সনে।
তার সন্তানদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে যে সকল সন্তানদের নাম জানা যায় তারা হলেন : ১. তুফাইল, ২. মুহাম্মাদ, ৩. রাবী, ৪. উম্মু উমার।

www.pathagar.com

প্রথমোক্ত দুইজন হযরত রাসূলে কারীমের [সা] জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর স্ত্রীর ডাকনাম উম্মু তুফাইল। তিনি সাহাবিয়্যা ছিলেন। হাদিস বর্ণনাকারী মহিলা সাহাবীদের নামের তালিকায় তাঁর নামটিও দেখা যায়।
হযরত উবাইয়ের দৈহিক গঠন ছিল মধ্যম আকৃতির হালকা -পাতলা ধরনের। গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল গৌর বর্ণের।
বার্ধক্যে মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু খিযাব লাগাতেন না।
স্বভাব ছিল একটু সৌখিন প্রকৃতির।
বাড়িতে গদির ওপর বসতেন।
ঘরের দেয়ালে আয়না লাগিয়েছিলেন এবং সেদিকে মুখ করে নিয়মিত চিরুনি করতেন।
সাধারণত স্বভাববিরোধী কোনো কথা শুনলেই রেগে যেতেন।
হযরত উবাই ছিলেন একটু স্বাধীনচেতা ও আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন।
একবার হযরত ইবন আব্বাস [রা] মদীনার একটি গলি দিয়ে কুরআনের একটি আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে যাচ্ছেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, পিছন থেকে কেউ যেন তাঁকে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন, উমার।
কাছে এসে ইবন আব্বাসকে বললেন: তুমি আমার দাসকে সঙ্গে নিয়ে উবাই ইবন কাবের নিকট যাবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, তিনি কি অমুক আয়াতটি এভাবে পড়েছেন?
ইবন আব্বাস উবাইয়ের গৃহে পৌছুলেন এবং পরপরই উমারও সেখানে হাজির হলেন। অনুমতি নিয়ে তাঁরা ভেতরে প্রবেশ করলেন।
উবাই তখন দেওয়ালের দিকে মুখ করে মাথার চুল ঠিক করছিলেন।
উমারকে গদীর ওপর বসানো হলো।
উবাইয়ের পিঠ ছিল উমারের দিকে এবং সেই অবস্থায়ই বসে থাকলেন, পেছনে তাকালেন না।
কিছুক্ষণ পর বললেন: আমীরুল মুমিনীন, স্বাগত! আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে না অন্য কোনো প্রয়োজনে এসেছেন ?
উমার বললেন : একটি কাজে এসেছি।
অতঃপর একটি আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন– এর উচ্চারণ তো খুব কঠিন।
উবাই বললেন : আমি কুরআন তাঁর নিকট থেকেই শিখেছি, যিনি জিবরীলের নিকট থেকে শিখেছিলেন। এ তো খুব সহজ ও কোমল।
হযরত উবাই ইবন কাবের পবিত্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জ্ঞানচর্চার জন্য নিবেদিত ছিল।
মদীনার আনসার-মুহাজিরগণ যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকতো, হযরত উবাই তখন মসজিদে নববীতে কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পঠন-পাঠনে সময় অতিবাহিত করতেন।
আনসারদের মধ্যে তাঁর চেয়ে বড় কোনো আলিম কেউ ছিলেন না। আর কুরআন বুঝার দক্ষতা এবং হিফজ ও কিরআতে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সর্বজন স্বীকৃত।
খোদ রাসূলে কারীম [সা] মাঝে মাঝে তাঁর নিকট থেকে কুরআন তিলওয়াত শুনতেন।
হযরত উবাই [রা]! তিনি ছিলেন সত্যের ধারক। ছিলেন সত্য পথের অবিরাম যাত্রী। তার ছিল অনুকরণীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যা অনুকরণ করলে আমরাও স্পর্শ করতে পারি সত্যের সাম্পান।

www.pathagar.com

তুমুল জোয়ার

মালিক ইমতিয়াজ

হযরত আবু কাতাদাহ ! সেই এক দুর্দান্ত সাহসী যুবক!
৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে জিকারাদ বা গাবা অভিযান পরিচালিত হয়। সেই অভিযানে তিনি দারুণ দুঃসাহসের পরিচয় দান করেন।
হযরত রাসূলে কারীমের [সা] উটগুলো জিকারাদ নামক একটি পল্লীতে চরতো।
রাসূলুল্লাহর [সা] দাস রাবাহ ছিলেন সেই উটগুলোর দায়িত্বে। গাতফান গোত্রের কিছু লোক রাখালদের হত্যা করে উটগুলো লুট করে নিয়ে যায়। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালামা ইবন আকওয়া এ সংবাদ পেয়ে আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মদীনার দিকে মুখ করে শত্রুর আক্রমণের সতর্ক ধ্বনি ইয়া সাবাহাহ্! বলে তিনবার চিৎকার দেন। অন্য দিকে রাবাহকে দ্রুত রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গাতফানী লুটেরাদের পেছনে ধাওয়া করেন।
হযরত রাসূলে কারীম [সা] তাঁকে সাহায্যের জন্য দ্রুত তিনজন অশ্বারোহীকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁদের পেছনে তিনি নিজেও বেরিয়ে পড়েন।
সালামা ইবন আকওয়া মদীনার সাহায্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, আবু কাতাদাহ আল-আনসারী, আল-আখরাম, আল-আসাদী এবং তাঁদের পেছনে মিকদাদ আল-কিন্দি বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছেন।
এই অশ্বারোহীদের দেখে গাতফানীরা উট ফেলে পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আল-আখরাম, আল-আসাদির মধ্যে তখন শাহাদাতের তীব্র বাসনা কাজ করছে।
তিনি সালামার নিষেধ অমান্য করে গাতফানীদের পিছে ধাওয়া করেন।
এক পর্যায়ে আবদুর রহমান আল-আখরামের ঘোড়াটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এমন সময় আবু কাতাদাহ এসে উপস্থিত হন, তিনি বর্শার এক খোঁচায় আবদুর রহমানকে হত্যা করেন।
কেউ বলেন, এই জিকারাদ যুদ্ধে আবু কাতাদাহ যাকে হত্যা করেন তার নাম হাবিব ইবন উয়াইনা ইবন হিসন।
তিনি হাবিবকে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে লাশটি ঢেকে শত্রুর পেছনে আরও এগিয়ে যান।
পেছনের লোকেরা যখন দেখতে পেল, আবু কাতাদাহর চাদর দিয়ে একটি লাশ ঢাকা তখন তারা মনে করলো, নিশ্চয়ই এ আবু কাতাদাহর লাশ। সাথে সাথে তারা ইন্নালিল্লাহ উচ্চারণ করলো। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো– আবু কাতাদাহ নিহত হয়েছে।
এ কথা শুনে রাসূল [সা] বললেন : আবু কাতাদাহ্ নয়; বরং আবু কাতাদাহর হাতে নিহত ব্যক্তির লাশ। সে একে হত্যা করে নিজের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে, যাতে তোমরা বুঝতে পার, এর ঘাতক সেই।

www.pathagar.com

আবু কাতাদাহ বলেন, জিকারাদের দিন অভিযান শেষে রাসূলুল্লাহর [সা] সাথে আমার দেখা হলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দু'আ করেন : হে আল্লাহ! তুমি তার কেশ ও ত্বকে বরকত দাও। তার চেহারাকে কামিয়াব কর।

আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনার চেহারাও কামিয়াব করুন!

এ দিন তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার বর্ণনা শুনে রাসূল [সা] মন্তব্য করেন : আবু কাতাদাহ আজ আমাদের সর্বোত্তম অশ্বারোহী।

হুদাইবিয়া সন্ধির সফরে রাসূলুল্লাহর [সা] সাথে আবু কাতাদাহও ছিলেন। এ সফরে ফেরার পথে একদিন রাসূলসহ [সা] সহ তাঁর সফর সঙ্গীদের ফজরের নামাজ কাজা হয়ে যায়। সে কাজা নামাজ কখন কীভাবে রাসূল [সা] আদায় করেছিলেন তার একটা বিবরণ আবু কাতাদাহ্ বর্ণিত একটি হাদিস থেকে জানা যায়।

হিজরি সপ্তম অথবা অষ্টম সনে রাসূল [সা] আবু কাতাদাহর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ইদামের দিকে পাঠান।

এই ইদাম একটি স্থান বা একটি পাহাড়ের নাম এবং মদীনা থেকে শামের রাস্তায় অবস্থিত।

তাঁরা ইদাম উপত্যকায় পৌঁছানোর পর তাঁদের পাশ দিয়ে আমের ইবন আল-আদবাত আল-আশজায়ী যাচ্ছিলেন। তিনি আবু কাতাদাহ ও তাঁর বাহিনীর সদস্যদের সালাম দিলেন। তা সত্ত্বেও পূর্ব-শত্রুতার কারণে এ বাহিনীর সদস্য মুহাল্লিম ইবন জাসসামা ইবন কায়েস তাঁকে হত্যা করেন এবং তাঁর উট ও অন্যান্য জিনিস ছিনিয়ে নেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট উপস্থিত হয়ে যখন তাঁকে এ ঘটনা অবহিত করেন তখন সূরা আন নিসার ৯৪ নং আয়াতটি নাযিল হয়– "হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নেবে। কেউ তোমাদেরকে সালাম দিলে ইহ-জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে বলো না, তুমি মুমিন নও। কারণ, আল্লাহর নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর আছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত।"

হিজরি ৮ম সনের শা'বান মাসে রাসূল [সা] নাজদের খাদরাহ্ নামক স্থানের দিকে ১৫ সদস্যের একটি বাহিনী পাঠান। আবু কাতাদাহ্ ছিলেন এই বাহিনীর আমীর।

সেখানে গাতফান গোত্রের বসতি ছিল। তারা ছিল মুসলমানদের চরম শত্রু এক লুটেরা গোত্র। তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে সারা রাত চলতেন এবং দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে হঠাৎ তাঁরা গাতফান গোত্রে পৌঁছে যান। তারাও ছিল ভীষণ সাহসী। সাথে সাথে বহুলোক উপস্থিত হয়ে গেল এবং যুদ্ধ শুরু হলো।

আবু কাতাদাহ সঙ্গীদের বললেন, যারা তোমাদের সাথে লড়বে শুধু তাদেরকেই হত্যা করবে। সবাইকে ধাওয়া করার কোনো প্রয়োজন নেই।

এমন নীতি গ্রহণের ফলে দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। মাত্র ১৫ দিন পর প্রচুর গনিমতের মাল সঙ্গে নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।

এ ঘটনার কিছু দিন পর আল্লাহর রাসূল [সা] রমজান মাসে আটজন লোকের একটি দল বাতানে আখামের দিকে পাঠান।

এঁদেরও নেতা ছিলেন আবু কাতাদাহ।

www.pathagar.com

রাসূল [সা] মক্কায় সেনা অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মানুষ যাতে এ কথা মোটেই বুঝতে না পারে এ জন্য এই দলটিকে পাঠান।
মূলত মানুষের চিন্তা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ কাজ করেন।
জি-খাশাব পৌঁছার পর এ দলটি জানতে পেল যে, রাসূল [সা] মক্কার দিকে বেরিয়ে পড়েছেন। সুতরাং তাঁরা সুকাইয়্যা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহর [সা] বাহিনীর সাথে মিলিত হন।
মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন অভিযান পরিচালিত হয়। এ অভিযানে লড়াই এত তীব্র ছিল যে, মুসলমানদের অনেক বড় বড় বীরও পিছু হঠতে বাধ্য হন।
আবু কাতাদাহ এ যুদ্ধে দারুণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন।
এক স্থানে একজন মুসলমান ও একজন মুশরিক সৈনিকের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই হচ্ছে। দ্বিতীয় একজন পেছন দিক থেকে মুসলিম সৈনিককে আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। ব্যাপারটি আবু কাতাদাহর নজরে পড়লো।
তিনি চুপিসারে এগিয়ে গিয়ে পেছন দিক থেকে লোকটির কাঁধে তরবারির ঘা বসিয়ে দিলেন।
লোকটির একটি হাত কেটে পড়ে গেল; কিন্তু অতর্কিতে সে দ্বিতীয় হাতটি দিয়ে আবু কাতাদাহকে চাপ দিল যে, তাঁর প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো।
দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলছে, এর মধ্যে লোকটির দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়ায় সে দুর্বল হয়ে পড়ে।
এই সুযোগে আবু কাতাদাহ লোকটির দেহে আরেকটি ঘা বসিয়ে দেন, লোকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।
এরপর মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দারুণ ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। তারা ময়দান থেকে যে যেদিকে পারে, পালিয়ে যাচ্ছিল।
আবু কাতাদাহও এক দিকে যাচ্ছেন। পথে এক স্থানে হযরত উমারের [রা] সাথে দেখা। আবু কাতাদাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : কী ব্যাপার?
উমার [রা] বললেন : আল্লাহর যা ইচ্ছা। এর মধ্যে মুসলমানরা দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে এবং রণক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে।
হযরত আবু কাতাদাহ [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] সার্বক্ষণিক সাহচর্য ও খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।
একবার এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] সঙ্গী ছিলেন। রাসূল [সা] সাহাবীদের বললেন, পানি কোথায় আছে; তা খুঁজে বের কর অন্যথায় সকালে ঘুম থেকে পিপাসিত অবস্থায় উঠতে হবে।
লোকেরা পানির তালাশে বেরিয়ে গেল।
কিন্তু হযরত আবু কাতাদাহ [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] সাথেই থেকে গেলেন।
রাসূল [সা] উটের ওপর সওয়ার ছিলেন।
ঘুমকাতর অবস্থায় তিনি যখন এক দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন তখন আবু কাতাদাহ এগিয়ে গিয়ে নিজের হাত দিয়ে সে দিকে ঠেস দিচ্ছিলেন।
একবার তো রাসূল [সা]-এর পড়ে যাবারই উপক্রম হলো। আবু কাতাদাহ দ্রুত হাত দিয়ে ঠেকালেন। রাসূল [সা] চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলেন : কে?
বললেন : আবু কাতাদাহ।
রাসূল [সা] আবার জিজ্ঞেস করলেন, কখন থেকে আমার সাথে আছ?

www.pathagar.com

বললেন : সন্ধ্যা থেকে।

তখন রাসূল [সা] তাঁর জন্য দু'আ করলেন এই বলে : হে আল্লাহ! আপনি আবু কাতাদাহকে হিফাজত করুন যেমন সে সারা রাত আমার হিফাজত করেছে।

একবার হযরত আবু কাতাদাহ [রা] রাসূলুল্লাহর [সা] একটি মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেন। আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহর [সা] সঙ্গে ছিলাম। এক সময় যাত্রা বিরতিকালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : আমাদের সাথে কি পানি আছে?

বললাম : হ্যাঁ। আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু পানি আছে।

বললেন : নিয়ে এসো।

আমি পানির পাত্রটি নিয়ে এলাম।

তিনি বললেন : এর থেকে কিছু পানি নিয়ে তোমরা সবাই অজু কর।

অজুর পর সেই পাত্রে এক ঢোক মতো পানি থাকলো।

রাসূল [সা] বললেন : আবু কাতাদাহ, তুমি এ পানিটুকু হিফাজতে রেখে দাও। খুব শিগ্‌গিরই এর একটি খবর হবে।

আস্তে আস্তে দুপুরের প্রচণ্ড গরম শুরু হলো।

রাসূল [সা] সঙ্গীদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারা সবাই বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিপাসায় তো আমাদের জীবন যায় যায় অবস্থা।

তিনি বললেন : না, তোমরা মরবে না।

এই বলে তিনি আবু কাতাদাহকে ডেকে পানির পাত্রটি নিয়ে আসতে বললেন।

আবু কাতাদাহ বলেন : আমি পাত্রটি নিয়ে এলাম।

রাসূল [সা] বললেন : আমার পিয়ালাটি নিয়ে এসো।

পিয়ালা আনা হলো।

তিনি পাত্র থেকে একটু করে পানি পিয়ালায় ঢেলে মানুষকে পান করাতে লাগলেন।

পানি পানের জন্য রাসূলুল্লাহর [সা] চারপাশে ভিড় জমে গেল।

আবু কাতাদাহ বলেন : একমাত্র রাসূল [সা] ও আমি ছাড়া সকলের পান শেষ হলে তিনি বললেন : আবু কাতাদাহ এবার তুমি পান কর।

আমি বললাম : আপনি আগে পান করুন।

তিনি বললেন : সম্প্রদায়ের যিনি সাকি বা পানি পান করান, তিনি সবার শেষে পান করেন।

অতঃপর আমি পান করলাম এবং সবার শেষে রাসূল [সা] পান করলেন।

সবার পান করার পরও পাত্রে ঠিক যতটুকু পানি ছিল তাই থেকে গেল।

সে দিন তিনশ' লোক ছিল। অন্য একটি বর্ণনা মতে, লোক সংখ্যা ছিল সাতশো।

আবু কাতাদাহ! যুবক তো নয়, যেন দরিয়ার এক তুমুল জোয়ার! যে জোয়ারের বেগ এবং তেজ রুখতে পারে না কেউ। তিনি রাসূলকে [সা] যেমন ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে, ঠিক তেমনি ভালোবাসতেন ইসলামকে।

আল্লাহর ভয়ে এই কোমল এবং সাহসী মানুষটি সকল সময় থাকতেন প্রকম্পিত।

আবু কাতাদাহ! তাঁর জীবন থেকে আমরা অনেক কিছুই শিক্ষা নিতে পারি। নেয়াই উচিত। কারণ আমরাও তো চাই আমাদের সফল জীবন!

www.pathagar.com

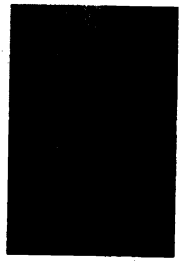

বয়স যখন আঠার

রিয়াজ পারভেজ

হযরত মুয়াজ!
মাত্র আঠার বছরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।
বয়সে যুবক। সাহসে বলীয়ান। তেজদীপ্ত!
হযরত মুয়াজের পিতা জাবাল ইবন আমর। মাতা হিন্দা বিনতু সাহল আল-জুহাইনিয়্যা।
বদরী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল জাদ্দ [রা] তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই।
মুয়াজের ছেলের নাম ছিল আবদুর রহমান। এ জন্য তাঁকে আবু আবদুর রহমান বলে ডাকা হতো।
মক্কা থেকে মদীনায় প্রেরিত রাসূলুল্লাহর [সা] দাঈই ইসলাম হযরত মুসয়াব ইবন উমাইরের [রা] হাতে নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে হযরত মুয়াজ ইসলাম গ্রহণ করেন।
আঠার বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
অর্থাৎ যুবক বয়সেই পেয়ে যান তিনি আলোর পরশ। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর পরবর্তী হজ মওসুমে মুসয়াব ইবন উমাইর মক্কায় চললেন। মদীনাবাসী নবদীক্ষিত মুসলমান ও মুশরিকদের একটি দলও হজের উদ্দেশ্যে তাঁর সঙ্গী হলো। হযরত মুয়াজও ছিলেন এই কাফেলার একজন সদস্য।
মক্কার আকাবায় তাঁরা গোপনে রাসূলুল্লাহর [সা] দিদার লাভ করে তাঁর হাতে বাইয়াত করেন। এটা ছিল আকাবার তৃতীয় বা শেষ বাইয়াত।
এই দলটি মক্কা থেকে ফিরে আসার পর মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে।
অল্প বয়স্ক মুয়াজ যখন মক্কা থেকে ফিরলেন, ঈমানী আবেগে তাঁর অন্তর তখন ভরপুর। কারো বাড়িতে মূর্তি থাকাটা তাঁর নিকট অসহনীয় ছিল।
মদীনায় ফিরে তিনি এবং তাঁর মতো আরো কিছু যুবক সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা প্রকাশ্যে বা গোপনে যেভাবেই হোক মদীনাকে প্রতিমামুক্ত করবেন।
তাঁদের এই আন্দোলনের ফলে হযরত আমর ইবনুল জামুহ প্রতিমা পূজা ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।
আমর ইবনুল জামুহ ছিলেন মদীনার বনু সালামা গোত্রের অতি সম্মানিত সরদার।

www.pathagar.com

অন্য নেতাদের মতো তাঁরও ছিল একটি অতি প্রিয় কাঠের প্রতিমা। প্রতিমাটির নাম ছিল মানাত। এই প্রতিমাটির প্রতি ছিল আমরের অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তিনি অতি যত্নসহকারে সুগন্ধি মাখিয়ে রেশমি কাপড় দিয়ে সেটি সব সময় ঢেকে রাখতেন।

মক্কা থেকে ফেরা এই তরুণরা রাতের অন্ধকারে একদিন চুপে চুপে মূর্তিটি তুলে নিয়ে বনু সালামা গোত্রের ময়লা-আবর্জনা ফেলার গর্তে ফেলে দেয়। এই উৎসাহী তরুণদের তিনজনের নাম–

মুয়াজ ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ ইবন উনাইস ও সালামা ইবন গানামা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে আমর ইবন জামুহ যথাস্থানে প্রতিমাটি না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। এক সময় ময়লা–আবর্জনার স্তূপে প্রতিমাটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে ব্যথিতকণ্ঠে বলেন : তোমাদের সর্বনাশ হোক! গত রাতে আমাদের ইলাহর সাথে কারা এমন আচরণ করলো?

তিনি প্রতিমাটি সেখান থেকে তুলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। প্রতিমাকে সম্বোধন করে বললেন : হে মানাত, আমি যদি জানতাম, কারা তোমার সাথে এমন আচরণ করেছে!

পরদিন রাতে আবার একই ঘটনা ঘটলো।

সকালে আমর খুঁজতে খুঁজতে অন্য একটি গর্ত থেকে প্রতিমাটি উদ্ধার করে ধুয়ে মুছে আগের মতো রেখে দেন।

পরের রাতে একই ঘটনা ঘটলো। তিনিও আগের মতো সেটি কুড়িয়ে এনে একই স্থানে রেখে দিলেন। এ দিন তিনি প্রতিমাটির কাঁধে একটি তরবারি ঝুলিয়ে দিয়ে বলেন :

"আল্লাহর কসম!

তোমার সাথে কে বা কারা এমন আচরণ করছে, আমি জানি না। তবে তুমি তাদের দেখেছো। হে মানাত, তোমার মধ্যে যদি কোনো ক্ষমতা থাকে তুমি তাদের থেকে আত্মরক্ষা কর। এই থাকলো তোমার সাথে তরবারি।"

রাত হলো। তরুণরা আজও এলো।

তারা প্রতিমার কাঁধ থেকে তরবারি তুলে নিয়ে একটি মৃত কুকুরের সাথে সেটি বাঁধলো। তারপর প্রতিমাসহ কুকুরটি একটি নোংরা গর্তে ফেলে চলে গেল।

আমর সকালে খুঁজতে বেরিয়ে মূর্তিটির এমন দশা দেখে তাকে লক্ষ্য করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার প্রথম লাইনটি এমন :

"আল্লাহর কসম!

তুমি যদি সত্যিই ইলাহ হতে তাহলে এমনভাবে কুকুর ও তুমি এক সাথে গর্তে পড়ে থাকতে না।"

এভাবে আমর ইবন জামুহ মূর্তিপূজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হযরত মুয়াজের ইসলাম গ্রহণের অল্পকাল পরে হযরত রাসূলে কারীম [সা] মদীনায় হিজরত করেন।

রাসূলে কারীম [সা] মুয়াজ ও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদের মধ্যে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন।

www.pathagar.com

মুয়াজ বিশ অথবা একুশ বছর বয়সে বদর যুদ্ধে যোগদান করেন। এরপর উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহর [সা] সাথে যোগ দেন।

হযরত মুয়াজ রাসূলুল্লাহর [সা] জীবদ্দশায় কুরআন মজিদ হিফজ করেন। রাসূলে কারীমের [সা] জীবনকালে যে ছয় ব্যক্তি কুরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন তিনি তাঁদের অন্যতম।

রাসূলুল্লাহর [সা] জীবদ্দশায় বনু সালামার মহল্লায় একটি মসজিদ নির্মিত হলে হযরত মুয়াজ এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হন।

একদিন তিনি এশার নামাযে সূরা বাকারাহ পাঠ করেন। পেছনে মুকতাদিদের মধ্যে ছিলেন কর্মক্লান্ত এক ক্ষেতমজুর। হযরত মুয়াজের নামাজ শেষ করার আগেই তিনি নামাজ ছেড়ে চলে যান।

নামাজ শেষে মুয়াজ বিষয়টি জানতে পেরে মন্তব্য করেন : সে একজন মুনাফিক।

লোকটি রাসূলুল্লাহর [সা] নিকট মুয়াজের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো।

রাসূলুল্লাহ [সা] মুয়াজকে ডেকে বললেন : মুয়াজ! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় ফেলতে চাও? তারপর তিনি বলেন : ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে। কারণ, তোমার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও ব্যস্ত লোকও থাকে। তাদের সবার কথা তোমার স্মরণে থাকা উচিত।

রাসূলুল্লাহ [সা] মুয়াজকে ইয়ামেনে পাঠালেন।

একদিকে তিনি ইয়ামেনের গভর্নর, অন্য দিকে সেখানকার তাবলিগ ও দ্বীনী তালিমের দায়িত্বশীলও। বিচারের দায়িত্ব ছাড়াও দ্বীনী দায়িত্বও পালন করতেন।

তিনি লোকদের কুরআন শিক্ষা দিতেন, ইসলামী বিধি-বিধানের প্রশিক্ষণ দিতেন।

তিনি ইয়ামেনে থাকাকালীন একবার হাওলান গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এলো। তার ছিল বারোটি ছেলে। তবে সবচেয়ে ছোট ছেলেটিও তখন শ্মশ্রুমণ্ডিত। এর দ্বারাই অনুমান করা যায় মহিলার বয়স কত হতে পারে।

স্বামীকে একা বাড়িতে রেখে বারোটি ছেলের সকলকে সঙ্গে করে সে এসেছে।

দুই ছেলে তার দু'টি বাহু ধরে চলতে সাহায্য করেছে।

মহিলা মুয়াজকে প্রশ্ন করলেন : আপনাকে কে পাঠিয়েছে?

রাসূলুল্লাহ [সা]।

আপনি তাহলে রাসূলুল্লাহর নির্বাচিত প্রতিনিধি? আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই। করুন।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক বা অধিকার কতটুকু?

যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় করে তার আনুগত্য করবে।

আল্লাহর কসম, আপনি একটু ঠিক ঠিক বলবেন।

আপনি এতটুকুতে সন্তুষ্ট নন?

ছেলেদের বাবা বৃদ্ধ হয়েছে, আমি তাঁর হক কীভাবে আদায় করবো?

আপনি তার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না। যদি কুষ্ঠ রোগে তার দেহ পচে ফেটে যায়, রক্ত ও পুঁজ ঝরতে থাকে, আর আপনি তাতে মুখ লাগিয়ে চুষে নেন, তবুও তার হক পুরোপুরি আদায় হবে না।

www.pathagar.com

হযরত রাসূলে কারীম [সা] গোটা ইয়ামেনকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেন;

সানয়া, কিন্দাহ, হাজারামাউত, জানাদ, খুবাইদ।

ইয়েমেনের রাজধানী ছিল জানাদ, আর এখানেই থাকতেন হযরত মুয়াজ। তিনিই জানাদের জামে মসজিদটির নির্মাতা।

অবশিষ্ট চারটি স্থানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ শাসক নিযুক্ত হন :

সানয়া– হযরত খালিদ ইবন সাঈদ, কিন্দাহ– হযরত মুহাজির ইবন আবি উমাইয়্যা, হাজারামাউত– হযরত যিয়াদ ইবন লাবিদ এবং খুবাইদ ও উপকূলীয় এলাকায়– হযরত আবু মূসা আল– আশয়ারী [রা]।

উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ এলাকায় সাদাকা, জিযিরা ইত্যাদি আদায় করে হযরত মুয়াজের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

রাজকোষের পূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন হযরত মুয়াজ।

হযরত মুয়াজ বিভিন্ন সময়ে তাঁর অধীনস্থ শাসকদের এলাকাসমূহ ঘুরে ঘুরে তাঁদের বিচার ও সিদ্ধান্তসমূহ দেখাশোনা করতেন। প্রয়োজনবোধে তিনি নিজেও মুকদ্দমার শুনানি করতেন।

একবার হযরত আবু মূসার অঞ্চলে গিয়ে মুকদ্দমার শুনানি করতেন। আর একবার হযরত আবু মূসার অঞ্চলে গিয়ে মুকদ্দমার ফায়সালা করেন।

এসব সফরে তিনি তাঁবুতে অবস্থান করতেন।

আবু মূসার এখানেও তাঁর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। তিনি ও আবু মূসা দুই জনই পাশাপাশি তাঁবুতে অবস্থান করেন।

হযরত রাসূলে কারীম [সা] যখন মুয়াজকে ইয়েমেনে পাঠান তখন তাঁকে একটি লিখিত নির্দেশনামা দান করেন।

তাতে গনিমত, খুমুস, সাদাকাত, জিযিয়াসহ বিভিন্ন বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত মুয়াজ সব সময় তাঁরই আলোকে কাজ করতেন।

একবার এক ব্যক্তি একপাল গরু নিয়ে এলো। গরুর সংখ্যা ছিল তিরিশটি।

রাসূল [সা] তাঁকে তিরিশটি গরু থেকে একটি বাছুর নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এ কারণে হযরত মুয়াজ বললেন : আমি রাসূলুল্লাহর [সা] কাছে না জেনে কিছুই গ্রহণ করবো না। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল [সা] আমাকে কিছুই বলেননি।

এ দ্বারা বোঝা যায় রাসূলুল্লাহর [সা] ওয়ালিগণ দুনিয়ার অন্য শাসকদের মতো অত্যাচারী ছিলেন না। রক্ষক ও রক্ষিতের মাঝে যে সম্পর্ক ইসলাম ঘোষণা করেছিল, তারা সব সময় তা স্মরণে রাখতেন। আর রক্ষকের ওপর শরীয়ত যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছে তারা তা কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। বিচার ও সিদ্ধান্তের সময়ও জনগণের অধিকার যাতে খর্ব না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের আদালতসমূহে সর্বদা সত্য ও সততার বিজয় ছিল।

এক ইয়াহুদি মারা গেল। একমাত্র ভাই রেখে গেল উত্তরাধিকারী। সেও ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

বিষয়টি হযরত মুয়াজের আদালতে উত্থাপিত হলো। তিনি ভাইকে উত্তরাধিকার দান করেন।

www.pathagar.com

হযরত মুয়াজ ছিলেন জীবনের প্রথম থেকে অতি বুদ্ধিমান। রাসূল [সা] মদীনায় আগমনের পর তিনি তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেন।

অল্প কিছু দিনের মধ্যে তিনি ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ মডেলের রূপ লাভ করেন এবং বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে পরিগণিত হন। হযরত রাসূলে কারীম [সা] তাঁকে এত মুহব্বত করতেন যে, অধিকাংশ সময় তাঁকে নিজের বাহনের পেছনে বসার সুযোগ দিয়ে নানা রকম ইলম ও মারেফাত শিক্ষা দিতেন।

একবার তিনি রাসূলুল্লাহর [সা] বাহনের পেছনে বসেছিলেন।

রাসূল [সা] ডাকলেন : মুয়াজ।

তিনি আবার ডাকলেন : মুয়াজ।

তিনিও অত্যন্ত আদব ও শ্রদ্ধার সাথে জবাব দিলেন।

এভাবে রাসূল [সা] তিনবার ডাকলেন, আর মুয়াজও প্রতিবার সাড়া দিলেন।

তারপর রাসূল [সা] বললেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে কালিমা-ই-তাওহিদ পাঠ করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।

মুয়াজ আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমি মানুষের কাছে এই সুসংবাদ কি পৌঁছে দেব?

তিনি বললেন : না। কারণ, মানুষ আমল ছেড়ে দেবে।

হযরত মুয়াজের প্রতি রাসূলুল্লাহর [সা] স্নেহের এত আধিক্য ছিল যে, তিনি নিজে কোনো প্রশ্ন না করলে রাসূল [সা] বলতেন, তুমি একাকী পেয়েও আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করছো না কেন?

মুয়াজ [রা] মাত্র আঠার বছরে ইসলাম গ্রহণ করে সত্যের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন আর সারাটি জীবনই কাটিয়ে দিয়েছিলেন সেই সত্যের আশ্রয়ে।

মিথ্যা তাকে কখনো গ্রাস করতে পারেনি।

পারেনি তাকে কোনো প্রকার অন্ধকার ছুঁতে।

সত্যের সৈনিকরাতো এমনই হয়! তাদের জীবন হয় আলোঝলমল তারার মেলা। যে জীবন দুনিয়া ও আখিরাতে বয়ে আনে সফলতার ঢল।

আমরাও প্রত্যাশা করি তেমনই জীবন!

চেষ্টা করি যেন সর্বদা সত্যের সাহসী সৈনিক হওয়ার জন্য।

www.pathagar.com

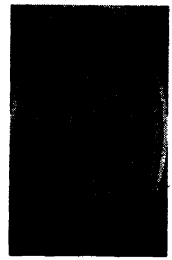

নিরাপদ জনপদ

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী

মক্কা এখন আতঙ্কের নগরী। প্রতিদিন গুম আর খুন। সাধারণ মানুষের আরাম আয়েশ সব হারাম। একটু পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেও কেউ সাহস পায় না।

শীর্ষ মুসলিম নেতারা শা'বেই আবু তালিব উপত্যকায় বন্দি। গড ফাদারদের মদদে বখাটে মাস্তান সন্ত্রাসীরা অলিগলি রাজপথে কায়েম করেছে ত্রাসের রাজত্ব। দিন-দুপুরে খুন-খারাপী ও চাঁদাবাজি।

আবু জাহিল, আবু লাহাব, উতবা, শায়বা'র মুখে উন্নয়ন ও শান্তির স্লোগান। এগিয়ে চলছে দেশ। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আমাদেরই ক্ষমতায় থাকতে হবে। একটি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীচক্র পবিত্র ধর্মকে রাজনীতিতে টেনে এনে ধমকে অপবিত্র করছে। উন্নতি ও প্রগতিকে ব্যাহত করছে। তাদের নির্মূল করতে হবে। তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। তাদের ছাত্র ও যুবশক্তি খুবই সুশৃঙ্খল ও দুঃসাহসী। সুকৌশলে তাদের দমন করতে হবে।

নেতাদের আশকারা পেয়ে কর্মীরা পৈশাচিক উল্লাসে মদমত্ত। প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে বত্রিশ দন্ত বিকশিত করে রাজপথে স্লোগান দেয়–

মুমিন ধর, জবাই কর।/ একটা দুইটা আলিম ধর
সকাল বিকাল নাস্তা কর।/ আবু লাহাবের মক্কায়
মৌলবাদের জায়গা নাই।

খানায়ে কাবার চত্বরে জমা হয় বখাটে যুবক-যুবতীরা। খাবার সাপ্লাই করে উতবা ও শায়বারা। সারাদিন খাও আর গাও। নো চিন্তা ড়ু ফূর্তী। অস্থায়ী টয়লেটও নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে সারি সারি।

কাবা ঘরের ভেতরে লাত, উজ্জা ও হোগলের মূর্তি। কাবার চত্বরে যুবক যুবতীদের নৃত্য। এটাই সনাতন ধর্ম। বাপ-দাদার ধর্মীয় ঐতিহ্যকে যারা বদলাতে চায়, তাদের কোনো অধিকার নেই মক্কায় রাজনীতি করার।

যুবতীরা স্লোগান ধরে, বখাটে যুবকরা দিগুণ-ত্রিগুণ উল্লাসে জবাব দেয়।

www.pathagar.com

শুধু জয়ের স্লোগানে জযবা পায় না যুবক-যুবতীরা। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতেই বেশি আনন্দ। বুক ফুলিয়ে, কোমর দুলিয়ে স্লোগান দেয়–

ফাঁসি ফাঁসি, ফাঁসি চাই/ আল-আমিনের ফাঁসি চাই।

সালেহিনদের চামড়া/ তুলে নেব আমরা।

শা'বই আবু তালিব উপত্যকার প্রতিটি প্রবেশমুখে পাহারা বসিয়েছে মক্কার গড ফাদাররা। যাতে কোনো খাদ্য ও পানীয়ও প্রবেশ করতে না পারে। "আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব। এক চুল নড়ব না, এক বিন্দু ছাড় দেয়া হবে না। প্রয়োজনে আরো কঠোর হব।" সদম্ভে ঘোষণা দেয় আবু জাহেল।

সমগ্র মক্কাবাসী আজ এদের হাতে জিম্মী। মজলুমের পক্ষে একটু কথা বললেও রক্ষা নেই। হামলা আর মামলা। ধইরা আন, বাইন্দা আন। মাইরা ফালা, ফাইরা ফালা। উসকানীমূলক এসব বাক্য ছাড়া কোনো স্লোগান নেই তাদের মুখে। খুন এখন নুনের চেয়েও সস্তা।

এত জুলুম-নির্যাতন, তাণ্ডব-নৈরাজ্যের পরও থেমে নেই আল আমিনের অনুসারীদের কার্যক্রম। বন্ধ হয়নি আল্লাহু আকবার স্লোগান। হঠাৎ করে জরো হয় রাজপথে সতর্কতার সাথে। ঝটিকা মিছিল করে তড়িৎ গতিতে সরে পড়ে। অনুপ্রেরণা ও পরামর্শের জন্য গোপনে সাক্ষাৎ নেতৃবৃন্দের সাথে। আবেগ ভরা মনে প্রশ্ন করেন–

- আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? আমরা তো শেষ হয়ে যাচ্ছি। কি লাভ হচ্ছে দশ বারো জন মানুষ মিলে আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে এভাবে মার খেয়ে? আমাদের হুকুম দেন, হয় মারব, না হয় মরব। ঘোষণা করুন কঠোর কর্মসূচি।

নেতৃবৃন্দের জবাব শুনে প্রশমিত হয় আবেগ।

- বেসবুর হয়ো না। তাড়াহুড়া করো না। কী এমন হয়েছে তোমাদের? কোন এলাকায় কয়জন শহীদ হয়েছে? তোমাদের আগে যারা এই পথে চলেছে, লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীরের গোশ্ত তুলে তুলে নেয়া হয়েছে। করাত দিয়ে শরীর দিখণ্ডিত করা হয়েছে। চামড়া তোলা আর সকাল বিকাল নাস্তা করার স্লোগান শুনে ঘাবড়ালে চলবে না। আল্লাহর পথে জীবন দেয়ার চেয়ে বড় কোনো সাফল্য নেই। তার জন্য প্রস্তুত হও।

- দিগুণ উৎসাহে সত্যের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে আল আমিনের অনুসারীরা। শির উঁচু করে ঘোষণা দেয়–

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ ভয় নাই ওরে ভয় নাই।

নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান/ ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আল্লাহর পথে যারা বিজয়ী হয় বা নিহত হয় সকলের জন্য মহাপুরস্কার। বিশ্বাসীদের কোনো পরাজয় নেই।

ইয়াসির, সুমাইয়া ও হুর-এর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড, বিলাল খাব্বাব, আম্মারের ওপর পৈচাশিক নির্যাতন, বাড়ি-ঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বর্বরতম তাণ্ডব, কোনো কিছুই থামাতে পারে না আল্লাহর সৈনিকদের। সর্বস্ব হারিয়েও তারা নিরাশ হয় না। আল্লাহর রহমত থেকে শুধু অবিশ্বাসীরাই নিরাশ হয়।

জালেমদের লাগানো অগ্নিশিখার ভেতর তারা দেখতে পায় রোম সাম্রাজ্যের পতন। সানা থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত নিরাপদ জনপদ।

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতি ও মুসলিম তমদ্দুন

ইব্রাহীম মণ্ডল

মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি এক নয়।

ইসলামী তমদ্দুনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, 'মুসলিম' তমদ্দুন ও ইসলামী তমদ্দুনের আসমান-জমিন প্রভেদ। মুসলমানদের তমদ্দুন হলেই তা ইসলামী তমদ্দুন নাও হতে পারে। জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য, বাদশাহী ও সামন্ততান্ত্রিক হাবভাব নানা কারণে মুসলমানদের তমদ্দুনে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু সেগুলোকে ইসলামী তমদ্দুনের অংশ বলা যায় না। আব্বাসীয়দের সময় থেকেই ইসলামী তমদ্দুনে সংকীর্ণতা ঢুকে পড়ে–একজন অত্যাচারী শাসক 'খলীফা' বা নামে 'আমীরুল মুমিনীন' হলেই যথেষ্ট, তা তিনি ইসলামের সামাজিক বিধান প্রয়োগ করুন আর না করুন। সামাজিক ঐক্য বা সংহতি নিশ্চয়ই প্রয়োজন আর এটা ইসলামেরই বিধান। কিন্তু জালিম শাসনকেও 'আল্লাহর ছায়া' শাহানশাহ্ বা বাদশাহ বলে মেনে নেওয়া কিছুতেই ইসলামের নীতি অনুগত হতে পারে না। মনে রাখা দরকার যে, তথাকথিত ধর্মীয় শাসক মুখে ইসলামের নাম করে শাসন চালালেই ইসলামী শাসন হবে না। কেবলমাত্র ধর্মীয় নেতার সঙ্গে সামাজিক ব্যাপারের যোগ থাকলেই ইসলামী সমাজ পাওয়া যাবে না। বাহ্যিক হাবভাব বা পোশাক-আশাকই যথেষ্ট নয়। ইসলামের নীতির সঙ্গেই সামাজিক ব্যাপারের সংযোগ হওয়া চাই। এই হিসেবেই [তথাকথিত ধর্মীয় নেতার অস্তিত্বের জন্যেই শুধু নয়] ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ, ধর্মীয় বা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামী তমদ্দুনের একটা বড় কথা।

এক সময় মুসলমানরা বিশ্বকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্বে দেয়ার পাশপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার দিক থেকেও নেতৃত্ব দিয়েছিল। আজকের যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা, তা কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের অর্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও গবেষণার ওপর, মুসলিম মনীষীদের সফলতার ওপর।

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত লেখক গোলাম আহমদ মোর্তজা তাঁর 'চেপে রাখা ইতিহাস' গ্রন্থের মুসলিম জাতির মূল্যায়ন অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা সেখান থেকে সামান্য কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করতে চাই। যেমন তিনি বলেছেন– 'বিজ্ঞান বিভাগে দৃষ্টি দিলেই দেখা যায়, রসায়ন বা কেমিস্ট্রির জন্মদাতা মুসলমান। রসায়নের

www.pathagar.com

ইতিহাসে জাবিরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ছোটখাটো জিনিস ধরলে তো ফিরিস্তি অনেক লম্বা হয়ে যাবে। বন্দুক, বারুদ, কামান প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্রের আবিষ্কারও তাঁদের অবদান। যুদ্ধের উন্নত কৌশল ও বারুদ বা আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বিখ্যাত আরবি গ্রন্থ তাঁরাই লিখেছেন বিশ্বাসীর জন্য। সেটির নাম 'আল ফুরুসিয়া ওয়াল মানাসিব উল হারাবিয়া'। ভূগোলেও মুসলমানদের অবদান এত বেশি যা জানলে অবাক হতে হয়। ৬৯ জন মুসলিম ভূগোলবিদ পৃথিবীর প্রথম যে মানচিত্র এঁকেছিলে তা আজও বিশ্বের বিস্ময়। তার আরবি নাম হচ্ছে 'সুরাতুল আরদ', যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বের আকৃতি। জনাব ইবনে ইউনুসের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমামণ্ডল নিয়ে গবেষণার ফল ইউরোপ মাথা পেতে নিয়েছিল। জনাব ফরগানি, জনাব বাত্তানি ও আল খেরজেমি প্রমুখের ভৌগোলিক অবদান স্বর্ণমণ্ডিত বলা যায়। কম্পাস যন্ত্রের আবিষ্কারকও মুসলমান। তাঁর নাম ইবনে আহমাদ। পানির গভীরতা ও সমুদ্রের স্রোত-মাপক যন্ত্রের আবিষ্কারক ইবনে আব্দুল মাজিদ।'

শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, মুসলমানদের রচিত প্রাচীন বিজ্ঞান গ্রন্থসমূহও আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত রচনায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। '২৭৫টি গবেষণামূলক পুস্তক যিনি একাই আহমাদ ও মুহাম্মাদ [সা] সম্মিলিতভাবে ৮৬০ সালে বিজ্ঞানের একশত রকমের যন্ত্র তৈরির নিয়ম ও ব্যবহার প্রণালি এবং তার প্রয়োজন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।'

'মুসলমানরাই পৃথিবীতে প্রথম চিনি তৈরি করেন। ভূতত্ত্বে সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুজাম আল ইবাদা'র লেখক হচ্ছেন ইয়াকুব ইবনে আব্দুল্লাহ। ৭০২ খ্রিস্টাব্দে তুলো থেকে তুলট কাগজ প্রথম তৈরি করেন ইউসুফ ইবনে উমার। তার দু'বছর পর বাগদাদে কাগজের কারখানা তৈরি হয়।'

'জাবির ইবনে হাইয়ান ইস্পাত তৈরি, ধাতুর শোধন, তরল বাষ্পীকরণ, কাপড় ও চামড়া রং করা, ওয়াটার প্রুফ তৈরি, লোহার মরিচা প্রতিরোধক বার্নিশ, চুলের কলপ ও লেখা পাকা কালি আবিষ্কারে অমর হয়ে রয়েছেন। ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড থেকে কাচ তৈরির প্রথম চিন্তাবিদ মুসলিম বিজ্ঞানি 'আররাজি' অমর হয়ে আছেন। ইংরেজদের ইংরেজি শব্দে এ বিজ্ঞানীর নাম লেখা আছে।'

আর রাজি বা আল রাজি একদিকে যেমন কুরআন-হাদিসে শিক্ষিত একজন বড় মাপের ইসলামী স্কলার ছিলেন, তেমনি তিনি তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ গণিত ও চিকিৎসা বিশরাদ ছিলেন। 'সোহাগা, লবণ, পারদ, গন্ধক, আর্সেনিক ও সালমিয়াক নিয়ে তাঁর লেখা ও গবেষণা উল্লেখযোগ্য। আরও মজার কথা, পৃথিবীতে প্রথম পানি বরফ তৈরি করাও তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ইউরোপ পরে নিজের দেশে বরফ প্রস্তুতের কারখানা চালু করে।'

'পৃথিবীখ্যাত গণিত বিশারদদের মধ্যে ওমর খৈয়ামের স্থান উজ্জ্বল রত্নের মতো। ঠিক তেমনি নাসিরুদ্দিন তুসি এবং আবু আলী ইবনে সীনা [ইবনে সিনা] নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।' ইবনে সিনাকে তো আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লাসিক সাহিত্য হিসেবে আজও স্বীকৃত।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মানমন্দির আবিষ্কারেও মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীতে প্রথম মানমন্দির আবিষ্কারক হলেন মুসলিম বিজ্ঞানী হাজ্জাজ ইবনে মাসার এবং হুনাইন ইবনে ইসহাক। সময় ৭২৮ খ্রিস্টাব্দ। তিনি আরো জানিয়েছেন, '৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্দেশপুরে দ্বিতীয়

www.pathagar.com

মানমন্দির তৈরি হয়। বাগদাদে হয় তৃতীয় মানমন্দির। দামেস্ক শহরে চতুর্থ মানমন্দির তৈরি করেন আ. মামুন।'

মুসলমানদের অবদানের কথা স্মরণ না করে ইতিহাস গবেষণা ও ইতিহাসের ইতিহাস লেখার কথা কল্পনাও করা যায় না। 'ইতিহাসের স্রষ্টা বিশেষত; মুসলমান।' 'মুসলমান ঐতিহাসিকরা কলম না ধরলে ভারতের ইতিহাস হয়তো নিখোঁজ হয়ে যেতো।' আলবিরুনী, ইবনে বতুতা, আলি বিন হামিদ, বাইহাকী, উৎবি, কাজী মিনহাজুদ্দিন সিরাজ, মহীয়ুদ্দিন, মুহাম্মাদ ঘোরী, জিয়াউদ্দিন বারণী, আমীর খসরু, শামসী সিরাজ, বাবর, ইয়াহিয়া বিন আহমদ, জওহর, আব্বাস শেরওয়নি, আবুল ফজল, বাদাউনি, ফিরিস্তা, কাফি খাঁ, মীর গোলাম হুসাইন, হুসাইন সালেমী ও সইদ আলী প্রমুখ মনীষী' পাক–ভারত উপমহাদেশের যে ইতিহাস রচনা করে গেছেন ইংরেজরা তার অনুবাদ করেছে মাত্র। আর ভারতীয় ঐতিহাসিকরা সে ইংরেজি অনুবাদের ছাত্র মাত্র।

মুসলমানদের রচিত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তারিখি ফিরোজ শাহী, তারিখুল হিন্দ, তা'জুম্মাসির, তবকত-ই নাসিরি, খাজেনুল ফতওয়া, ফতওয়া উস সালাতিন, কিতাবুর-রাহলার, তারিখি মুবারক শাহী, তারিখে সানাতিনে, আফগান, তারিখে শেরশাহী, মাখজানে আফগান, আকবর নামা, আইনি আকবরি, মুনতাখাবুত তাওয়ারিখ, মুনতাখাবুল লুবাব, ফতহুল বুলদান, আনসাবুল আশরাক ওয়া আখবারুহা, ওয়ুনুল আখইয়ার তারিখে ইয়াকুব, তারিখে তাবারি, আখবারুজ্জামান, মারওয়াজুজ জাহার, তামবিনুল আশরাফ, কামিল, উসুদুল গাবাহ, আখবারুল আব্বাস, কিতাবুল ফিদ-আ, মুয়াজ্জামুল বুলদান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো ইতিহাসের আকর গ্রন্থ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আল কুরআন এবং মহানবী হযরত মোহাম্মাদ [সা]-এর অপরিসীম উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে তাঁর জীবদ্দশাতেই ইতিহাস রচনা ও জ্ঞান-সাধনার যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল, সে ধারাবাহিকতাতেই তাঁর মৃত্যুর পর বাগদাদ, কায়রো, সালেনা ও কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। মহানবীর তিরোধানের ১১৮ বছর পর ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় তথা স্পেন হতে আরম্ভ করে একেবারে উপমহাদেশের সিন্ধুনদ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয়। আর মুসলমানরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র, পাঠাগার ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিদেশি গ্রন্থকারের উদ্ধৃতি দিয়ে মোর্তজা বলেছেন, 'গ্রন্থ বা পুস্তক সংগ্রহ মুসলমানদের জাতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। বন্দরে বন্দরে লোক প্রস্তুত থাকত, কোনো বিদেশি এলেই তাঁর কাছে যে বইপত্রগুলো আছে সেগুলো নিয়ে অজানা তথ্যের বইগুলো সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে কপি তৈরি করে যার বই তার কাছে ফেরত দেওয়া হতো আর তাঁদের অনিচ্ছা না থাকলে তা কিনে নেয়া হতো।'

মহানবীর সাহাবীগণ বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন জ্ঞান-সাধনার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। হযরত আলীর [রা] চেষ্টায় কুফার জামে মসজিদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের ছাত্ররা পড়াশোনার জন্য সেখানে ছুটে যেতেন। হযরত আলী নিজে ছিলেন সেখানকার অধ্যক্ষ। 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস' গ্রন্থ মাওলানা নূর মুহাম্মাদ আজমী লিখেছেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি একটি বড় উট বোঝাই বই রেখে গিয়েছিলেন। স্মরণ করা উচিত, সে সময়ে বই সংগ্রহ করা আজকের দিনের মতো এত সহজ ছিল না। অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রার কাছেও বহু পাণ্ডুলিপি পাওয়া

www.pathagar.com

গিয়েছিল। তিনি মহানবীর কাছ থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছিলেন। 'আরবের বিখ্যাত বক্তাদের সারা জীবনের সমস্ত বক্তৃতা লিখে নেওয়ার মতো লেখক ও প্রেমিকের অভাব ছিল না। লিখতে লিখতে কাগজ ফুরিয়ে গেলে জুতার চাড়াতে লেখা হতো। তাতেও সংকুলান না হলে হাতের তালুতে লিখতেও ভ্রূক্ষেপ ছিল না।' এ থেকে বলা যায়, সাংবাদিকতার উন্মেষও হয় মুসলমানদের হাত ধরেই। মোর্তজা জানিয়েছেন সবচেয়ে বিশুদ্ধভাবে বক্তব্য নোট করে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন আবু আমর ইবনুল আ'লা। তিনি এত লিখেছিলেন যে তা ঘরের ছাদ পর্যন্ত ঠেকেছিল।

গণিত শাস্ত্রের পথিকৃতও ছিলেন মুসলমানগণ। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল খারেজেমি ছিলেন বীজ গণিতের জনক। পেশায় তিনি ছিলেন খলিফা আল মামুনের জগৎ বিখ্যাত লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। উল্লেখ্য, সে সময়ে লাইব্রেরিয়ানের পদটি ছিল অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। এ পদের অধিকারী হতে হলে ব্যক্তিকে অত্যন্ত মেধাবী ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হতে হতো। তিনি একজন পর্যটকও ছিলেন এবং ভারতেও এসেছিলেন বলে গোলাম আহমদ মোর্তজা জানিয়েছেন। তিনি ভারত বিষয়ে 'কিতাবুল হিন্দ' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল খারেজেমি গণিত শাস্ত্রের শূন্যের উদ্ভাবক। তিনি একজন জ্যোতির্বিদও ছিলেন। বাগদাদের খলিফার অনুরোধে তিনি আকাশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন এবং একটি পঞ্জিকা রচনা করেন।

এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশে মুসলমানরা পথ দেখিয়ে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় মুসলিম শাসকদের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সেই সোনালি ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতেই হবে।

সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি প্রবন্ধে গবেষক মতিউর রহমান মল্লিক বলেন, 'সংস্কৃতি' শব্দটি অর্থ-শিক্ষা বা চর্চা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা-রুচি নীতি, উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture, তমদ্দুন, মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা অথবা সংশোধন। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ, একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা, কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প- সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদি।

"Culture is that what we are". –এর Lasky অর্থাৎ সংস্কার করে যা পাওয়া যায় তা-ই সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্যে একবার সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি বক্তব্য দারুণ রকমের বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো। ঐ বক্তব্য সম্পর্কে A Dictionary of Literary terms by J.A. Coddon বলেছেন :

In 1959 C. P. snow delivered a lecture in Cambridge which tells that the linkage between humanity and technology is a kind of culture. Here humanity means Arts, and technology means science. This lecture caused a great deal of controversy.

১৯৫৯ সালে অধ্যাপক C. P. Snow ক্যামব্রিজে প্রদত্ত এক লেকচারে বলেছিলেন : মানবতাবাদ এবং প্রযুক্তিবাদ এই দুয়ের মধ্যবর্তী যোগসূত্রই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

এখানে মানবতাবাদ অর্থ সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিবাদ অর্থ বিজ্ঞান। পরবর্তীতে তাঁর ঐ বক্তব্য ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো।

A.S Hornby -এর Oxford Abvanced learners English Dictionary সংস্কৃতি সম্পর্কে একাধিক তথ্য পরিবেশন করেছেন :

ক. Refined understanding and apperciation of arts, literature etc. সাহিত্য, কলা ইত্যাদির পরিশোধিত অনুধাবন এবং চিন্তাধারাই হলো কালচার বা সংস্কৃতি।

খ. State of intellectual development of a society. কোনো সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির নামই সংস্কৃতি।

গ. Particular form of intellectual expression specially in art and literature. বিশেষত সাহিত্য এবং কলার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি।

ঘ. Customs, Arts, Social institution etc of a particular group of poeple ... কোনো একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্যকলা ইত্যাদিই হলো এ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ কানাডীয় ইউনেস্কো কমিশন Canadian National Commisson for UNESCO সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি সভা আহ্বান করে। দীর্ঘ আলোচনা ও মত-বিনিময়ের পর উক্ত বিশেষজ্ঞরা যে সংজ্ঞা স্থির করে তাকে তাঁরাই working difiniton বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে এই সংজ্ঞাটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পর, কেননা সংজ্ঞাটি পরীক্ষামূলক ও সংশোধনমূলক ও সংশোধন সাপেক্ষ। স্থিরকৃত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

Culture is a dynamic value system of learned elements, with assumptions. conventions, beliefs and rules permitting members of a group to relate to each other and to the would to communicate and to develop their creative potential.

সমাজবিজ্ঞানী ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কারো মতে সংস্কৃতি হলো অতীতের ঐতিহ্য ও আগামীর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে নির্মিত মানুষের ভাবধারা, নান্দনিক রূপ ও মূল্যবোধের সমন্বিত প্রকাশ। আবার অভিধানে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ সন্ধান করলে হয়তো এই রকমের একটি বাক্য পাওয়া যাবে : Cultivatio improvement of refinement by education and training. The treaining and refinement of mind. tastes and manners. the condition of being thus trained and refined. The intellectual side of civilization.

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিক জ্ঞান চর্চার ধারায় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার সমুদয় ফসল-রূপে, মানুষ যা এই পৃথিবীতে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ সমস্ত কৃতী ও সৃষ্টি প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে এবং পরে মানুষের জীবন-যাপনকে করেছে উন্নততর। বলা যায়, মানুষের জীবনযাত্রার সকল উপাদান এবং সমুদয় উপলব্ধি নিয়েই মানব-সংস্কৃতি।

www.pathagar.com

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতির রূপ' প্রবন্ধে বলেছেন : 'কালচার' কী? উৎকর্ষ বা অনুশীলন। আজকাল সাধারণত একটা বিশেষ অর্থে এর ব্যবহার করা হচ্ছে যা অর্থ হচ্ছে মানব-মনের উৎকর্ষসাধন-পদ্ধতি বা রূপায়ণ।

অনেকে Refinement অর্থেও কথাটার ব্যবহার করে থাকেন। আবার কারো কারো মতে মানবকল্যাণমুখীতারই নাম 'কালচার'। কেউ কেউ আবার Civilization–এর কোনো তফাৎ খুঁজে পান না। এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে- অক্সফোর্ড ডিকশনারি বলে : Trained and refined state of understanding and menners and tastes, phase of these prevalent at a time or place, instilling of by training, artificial rearing of bees, fish bacteria etc. অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো বোধ, আচরণ ও আস্বাদনের প্রশিক্ষিত রূপ। একই সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে যে সবের ক্রমোন্নয়ন, বলা যেতে পারে, মৌমাছি, মাছ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি প্রজননের ধরনের ধীরে ধীরে যেসব পরিশীলিত রূপের চর্চা। সংস্কৃতির একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন বসনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আলীয়া আলী ইজেতবেগভিচ, সংস্কৃতি হলো অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা।

'আমাদের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন : 'তাহযীব ও তমদ্দুন দুটো আরবী শব্দ। তমদ্দুন শব্দটা এসেছে 'মুদন' থেকে। তা থেকে 'মাদানিয়াত' অর্থাৎ নাগরিক বোধ। অন্য কথায় নগর জীবন ভিত্তিতে যে পরিশীলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তমদ্দুন বলা যায়। তাই তমদ্দুন সভ্যতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে 'তাহযীব' শব্দ এসেছে 'হযব' থেকে। হাযাবা, হাযযবা, তাহযীব মানে কেটে সমান করা। যেমন বাগানের চারদিকে যে গাছের বেড়া দেয়া হয় মালি কাঁচি দিয়ে কেটে তার মাথাগুলো তাহযীব করে। অর্থাৎ ও দু'পাশ কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে। কোনো একটা ডাল বা পাতা সমান করে কাটা-সীমানা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে মালির কাঁচি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেটে সমান করে দেন। এভাবে পরিশীলিত জীবনধারা।'

অবশ্য 'কালচার'-এর ধারণা বিস্তার লাভ করার পরই আমাদের দেশে তাহযীব-তমদ্দুন এবং পরবর্তী কালে সংস্কৃতি শব্দটার প্রচলন শুরু হয়।

বিভিন্ন মনীষীদের সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও বিস্তারিত আলোচনা থেকে সহজভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃতি হচ্ছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন অর্থাৎ বিশ্বাসীদের জীবন আচার।

ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের জীবনাচারই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। আমাদের প্রিয় নবী [সা] আইয়ামে জাহিলিয়াতের এক চরম সময় আবির্ভূত হন। তিনি মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে ডাকলে, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এলেন, একত্ববাদে বিশ্বাসী এ জনসমষ্টিই মুসলমান-তাঁরা মদীনায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করলে এই ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের চাল-চলন, আচার-আচরণ ও জীবন পদ্ধতিই ইসলামী কালচার।

ক্রোধ সংযত করা এবং অপরাধীকে ক্ষমা করা মানুষের জন্যে তা এক উচ্চমানের নৈতিকতা। অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় তা ছিল তখনকার মানুষের কল্পনাতীত, মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা-সম্প্রীতি মানুষকে সম্মান করা, তা কল্পনাও করতে পারেনি তখনকার মানুষ। শ্রেণিতে শ্রেণিতে হিংসার আগুন জ্বালানোই ছিল তাদের কালচার। শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

১. ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য : ১. তাওহীদ ২. মানবতার সম্মান ৩. বিশ্ব ব্যাপকতা সর্বজনীনতা ৪. মানবীয় ভ্রাতৃত্ব ৫. বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ৬. বিশ্বমানবতার ঐক্য ৭. কর্তব্য ও দায়িত্ব ৮. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও পংকিলতা থেকে মুক্তি ৯. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা ১০. ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্য।

এই মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তাই ইসলামী সংস্কৃতি।

রাসূল [সা] মদীনায় যে রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন সেখানকার কালচার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, তা পরশ পাথরের মতো মানুষকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই মূলত কালচারের উৎপত্তি। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসীদের জীবনের প্রতিফলন হিন্দু সংস্কৃতি, বুদ্ধদের বুদ্ধ সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের খ্রিস্টান সংস্কৃতি। এক মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে দেখা হলে বলে আসসালামু আলাইকুম। [আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক]। এটাই মুসলিম কালচার।

হিন্দুরা বলে, নমস্কার; এটা হিন্দু কালচার। মেয়েরা মাথায় সিঁদুর পরে, এটাও হিন্দু কালচার।

মুসলমান ইন্তেকাল করলে তাকে আতর গোলাপ দিয়ে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে কবর দেয়া হয়। মৃত্যুর পর তার লাশ আস্তে আস্তে ধরে স্থানান্তর করা হয়, কারণ ব্যথা পাবে এই জন্য। আর হিন্দু কালচার–মৃতের বড় আদরের ছেলে দ্বারা মুখাগ্নি করানো। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধরা লাশ বাক্সে করে কবরে দেয়। তাই ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন ভিন্ন তাদের সংস্কৃতিও ভিন্ন।

মুসলমানদের বিশ্বাস মৃত্যুই শেষ নয়, তারপরও জীবন আছে। শুধু স্থানান্তর হয়ে কবরে যায়–সেখানে তার দুনিয়ার ভালো কর্মের ভালো ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল অর্থাৎ কবরে আযাব হবে তাই তার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয়। আর বস্তুবাদী নাস্তিকদের বিশ্বাস, মানুষ এক রকম উন্নত পশু। আল্লাহ বলে কিছু নেই। মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই জন্মে ও মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত্যুতে তার সব শেষ। তাই তার মৃত্যুর পর লাশ যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে সে জন্য মাটিতে পুঁতে ফেলে এবং তাকে সম্মান জানানোর জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন করে। এটা নাস্তিকের সংস্কৃতি।

কাজেই ভাষাগত কারণে কোনোভাবেই সংস্কৃতির ঐক্য হতে পারে না। অঞ্চলভিত্তিকও শুধু নয়, শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমেই সংস্কৃতির ঐক্য হয়। যারা ভাষাগত কারণে সংস্কৃতির ঐক্য দাবি করে তারা আসলে নাস্তিক ও আস্তিক নয়।

প্রাচীন মিসরীয়দের বিশ্বাস ছিল মৃত্যু হলো দীর্ঘমেয়াদি ঘুম, নিদ্রা শেষ হলে সে আবার জেগে উঠবে। এই বিশ্বাস থেকে ফারাওরা মৃত্যুর পর লাশ মমি করে রাখতো। পিরামিডে, তার সাথে তার ব্যবহার্য দামী জিনিসপত্র রেখে দিত এবং পিরামিডের গায়ে তাদের জীবনের কর্মকাণ্ড সব একে একে লিপিবদ্ধ করে রাখতো। কারণ এসব লেখা এবং আঁকা কর্মকাণ্ড দেখে সে যেন নিজেকে চিনতে পারে এবং তার ব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলো সে আবার ব্যবহার করতে পারে। এটাই তাদের কালচার ছিল।

www.pathagar.com

বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারে মহানবীর [সা] পত্রাবলি

ড. আবু নোমান

মহান আল্লাহ আল কুরআনে সূরা আন নাহলে বলেছেন, হে রাসূল [সা], ইসলামের দাওয়াত দাও হিকমাত ও প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর ওয়াজ উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতার পদ্ধতিতে আলোচনা ও বিতর্ক কর। সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তুমি প্রচার কর। যদি তুমি তা প্রচার না কর তবে তুমি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলে না। সূরা আন নাহলের ৩৫ নং আয়াতে নবী-রাসূলদের কর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে। যে, রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে প্রচার করা। সূরা আলে ইমরানের ১০৪ নং আয়াতে দাওয়াত প্রচারের জন্য এভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। ইসলামের প্রতি আহ্বানে কী ধরনের বক্তব্য থাকতে হবে সে সম্পর্কেও সুস্পষ্ট পরামর্শ রয়েছে আল কুরআনে। সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। মহান আল্লাহ দাওয়াত দানকে একটি মহান কল্যাণকর কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে যারা এ মহান দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকে তাদের সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ১১৪নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারাই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আত-তাগাবুনের ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের [সা] আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, জেনে রেখো আমার রাসূলের [সা] দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা। অনুরূপ বক্তব্য সূরা আন-নূরের ৫৪ নং আয়াতেও উল্লিখিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, হে রাসূল [সা] আপনি বলুন, আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য

www.pathagar.com

তোমরা দায়ী। তোমরা যদি আনুগত্য কর, তবে সৎ পথ পাবে। রাসূলের [সা] দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। আল কুরআনের অসংখ্য নির্দেশনার ভিত্তিতে মহানবী [সা] জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির নিকট ইসলামের আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। মহানবী [সা] সমগ্র জীবনে যে প্রতিভূ ধারণ করেছেন ইসলাম প্রচারে তা ছিল অনিবার্য প্রয়োজনীয়। মহানবীর [সা] জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিবাহ এবং বিবাহপরবর্তী নবুয়তপূর্ব জীবন বিশ্লেষণ করলেও সে চিত্রটিই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নবুয়তপ্রাপ্ত হয়ে মহানবী [সা] সমাজজীবনে ইসলাম প্রচারে যে অভিনিবেশ পরিব্যপ্ত করেছিলেন তা সাফল্যের অন্যতম কারণ তাঁর নবুয়তপূর্ব জীবনের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, গুণপণা ও কর্মকাণ্ড। মহানবীর [সা] ইসলাম প্রচারে তাঁর নবুয়ত পূর্ববর্তী জীবনের সদ্গুণাবলি অনেকাংশেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মহানবীর [সা] ওপর অবতীর্ণ প্রথম অহি 'ইকরা'। ইকরা শব্দ অবতীর্ণ হওয়া থেকেই মহানবী [সা] সমাজের সকল ধরনের মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। মক্কার সমাজে ইসলাম পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে মিত্র সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে শত্রুরাও তেমনি শক্তিশালী হতে শুরু করে। মক্কায় থাকা কালীনই মহানবী [সা] বহির্বিশ্বে পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। এ কর্মসূচি মদীনাকালীন সময়েও অব্যাহত ছিল। এ সমস্ত পত্রের মাধ্যমে মহানবী [সা] আল-কুরআনের মর্মবাণী শিক্ষাদান, মৌখিক উপদেশাবলি ও সতর্ককরণের পাশাপাশি রাজা-বাদশাহ, গোত্রপতি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দানই ছিল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায় যে, এ ধরনের পত্রসংখ্যা প্রায় শতাধিক। সব পত্রগুলোই বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে সংকলিত রয়েছে। এ পত্রগুলোর মধ্য থেকে মহানবীর [সা] বিশিষ্ট সাহাবি হযরত হাসান আনসারী [রা] ২১টি পত্র লিখে রেখেছিলেন। পরবর্তীতে ইবনে তুলুন উক্ত পত্রগুলোকে তাঁর গ্রন্থে সংকলিত করেন। ড. মোহাম্মদ হামিদুল্লাহ রচিত রাসূলুল্লাহর [সা] রাজনৈতিক জীবন, হাফিজ আল্লামা ইব্ন কাইয়িম রচিত যাদুল মা'আদ, আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী রচিত আর রাহীকুল মাখতুমসহ রাসূলের [সা] অসংখ্য জীবনীগ্রন্থেও অনেক পত্রের উল্লেখ দেখা যায়। নিম্নে আটটি পত্রসংক্রান্ত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

প্রথম পত্র

মহানবী [সা] মক্কায় থাকাকালীন কিছুসংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করে ইসলাম প্রচারে ভূমিকা রেখেছিলেন। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর কাছে ইসলামের দীক্ষা উপস্থাপন করা হলে রাজা মুগ্ধ হয়ে শোনেন এবং তাঁর রাজ্যে মুসলমানদের সম্মানের সঙ্গে বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন। সে আলোচনায় ইসলামের যে মহান আলোকিত শিক্ষার কথা উপস্থাপিত হয়েছিল তা ছিল ইসলামের একান্তই অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য। ইসলামের এমন বৈশিষ্ট্যের কথা শুনে রাজা নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। জানা যায় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী [সা] ইসলাম প্রচারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগণকে ইসলামের দাওয়াত দান করে পত্র প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন রাজা নাজ্জাশী অন্যতম একজন। ইতঃপূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানদের তিনি সম্মানের সঙ্গে তাঁর রাজ্যে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন। সে সময় থেকেই তিনি ইসলাম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অতঃপর হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী [সা] তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। পত্রটি এইরূপ–

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার নাজ্জাশীর আযমের প্রতি।

সালাম সে ব্যক্তির ওপর যিনি হিদায়েতের অনুসরণ করেন। আমি আপনার নিকট মহান আল্লাহর পাকের প্রশংসা করছি; তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। যিনি কুদ্দুছ, যিনি সালাম। যিনি নিরাপত্তা ও শান্তি দেন, যিনি হিফাজতকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইসা ইবনে মরিয়ম [আ] আল্লাহর রূহ এবং তাঁর কালিমা। আল্লাহ পাক তাঁকে পবিত্র ও সতী মরিয়মের ওপর স্থাপন করেছেন। আল্লাহ পাকের রূহ এবং ফুঁ-এর কারণে হযরত মরিয়ম [আ] গর্ভবতী হলেন। যেমন আল্লাহ পাক হযরত আদম [আ]-কে নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের প্রতি এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি পরস্পরকে দাওয়াত দিচ্ছি। এছাড়া এ কথার প্রতিও দাওয়াত দিচ্ছি যে, আপনি আমার আনুগত্য করুন এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। কেননা আমি আল্লাহ পাকের রাসূল, আমি আপনাকে এবং আপনার সেনাদলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। আমি তাবলিগ ও নসিহত করছি। কাজেই আমার তাবলিগ ও নসিহত কবুল করুন। [পরিশেষে] সালাম সে ব্যক্তির ওপর যিনি হিদায়েতের আনুগত্য করেন।"

কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই চিঠিটিকে অন্য কোনো রাজার কাছে লেখা বলে মনে করেন।

যাই হোক এ পত্রের উত্তরে নাজ্জাশী একটি পত্র মহানবীর বরাবরে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জাফর বিন আবু তালিব এবং অন্য সাহাবীদের প্রসঙ্গে লিখেছেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করেছেন। রাজা নাজ্জাশী নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মহানবী [সা] তাঁর ইন্তেকালের খবর সাহাবীদের অবহিত করেন এবং গায়েবানা জানাজা পড়েন। বর্ণনা পাওয়া যায় যে, রাজা নাজ্জাশীর পরবর্তী রাজাকেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মহানবী [সা] পত্র প্রেরণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

দ্বিতীয় পত্র

মহানবী [সা] মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরাইজ ইবনে মাতার নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র লিখেন। জোরাইজের উপাধী ছিল মুকাওকিস। ড. হামিদুল্লাহ এই রাজার নাম বনি ইয়ামিন বলে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এই চিঠিটির আহ্বানের ধরন উল্লেখ করা হলো।

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুকাওকিস আযাম কিববের নামে। তাঁর প্রতি সালাম যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন।

আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ পাক আপনাকে দুটি পুরস্কার দেবেন আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে কিবতিরা, এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্য সমান। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে না মানে। যদি কেউ এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তবে বলে দাও সাক্ষী থেকো, আমরা মুসলমান।"

www.pathagar.com

বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মুকাওকিস এ পত্রের উত্তরে একটি পত্র লিখেন। উক্ত পত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। তবে ইসলামের পত্রবাহক হাতেব ইবনে আবি বালতাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং অনেক উপহার সামগ্রীসহ মহানবীর [সা] দরবারে তাঁর শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন।

তৃতীয় পত্র

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট মহানবী [সা] একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটির ভাষা ছিল নিম্নরূপ-

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্যের পারভেজের নামে।

সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি যিনি হিদায়েতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত।

যারা বেঁচে আছে তাদেরকে পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফেরদের ওপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমাদের কাজ। কাজেই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। যদি এতে অস্বীকৃতি জানান তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার ওপরেই বর্তাবে।"

জানা যায় পারভেজকে পড়ে শোনানো হলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলে বলেন, আমার সামান্য একজন প্রজা যে নিজের নাম আমার নামের ওপরে লিখেছে। এরপর গ্রেফতার করে দরবারে মহানবীকে নিয়ে আসার জন্য লোক প্রেরণ করেন। তারা মহানবীর [সা] কাছে গিয়ে উদ্ধত আচরণ করে এবং রাজার নির্দেশের কথা মহানবীকে জানায়। মহানবী [সা] তাদেরকে পরদিন দেখা করার জন্য বলেন। ইতোমধ্যে পারস্যের সিংহাসনের পালাবদলে পারভেজ তার সন্তান শিরওয়াই কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। তাঁর নির্দেশিত সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনা মহানবী [সা] আল্লাহ কর্তৃক অবগত হয়ে দূতদের জানালে এর সত্যতা জেনে তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

চতুর্থ পত্র

ইসলামের আহবান পৌছানোর উদ্দেশ্যে মহানবী [সা] রোমান সম্রাট হিরোক্লিয়াসের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। সহীহ আল বুখারিতে এ পত্রের উল্লেখ আছে। পত্রের ভাষা নিম্নরূপ-

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের [সা] পক্ষ থেকে রোমের মহান হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে শান্তিতে থাকবেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে দুই রকমের পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের ও আপনাদের জন্য একই সমান। সেটি হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা ও আনুগত্য করব না। আল্লাহ ব্যতীত আমরা কাউকে শরিক করব না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করবো না। যদি লোকেরা অমান্য করে, তবে তাদের বলে দিন যে, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

উপরিউক্ত বাক্যসম্বলিত পত্র সাহাবী হযরত দেহিয়া ইবনে খলিফা কালবি [রা] বহন করে বসবার শাসনকর্তার নিকট পৌঁছে দেন। অতঃপর বসরার শাসনকর্তা পত্রটি সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে পৌঁছে দেন।

বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, পত্রটি যখন সম্রাংট হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছে তখন সেখানে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানসহ কিছুসংখ্যক মক্কার কুরাইশ সেখানে ব্যবসাসংক্রান্ত কারণে উপস্থিত ছিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাঁকে বলেছেন যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁকে কুরাইশদের একদল লোকের সাথে দরবারে আমন্ত্রণ জানান। এ সময় হিরাক্লিয়াস বায়তুল মাকদাসে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সেখানের দরবারে সম্রাটের আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস দোভাষীকে ডাকলেন। তিনি দোভাষীর মাধ্যমে কুরাইশদের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন তার সঙ্গে বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে কে বেশি নিকটতর? আবু সুফিয়ান বললেন আমি। আবু সুফিয়ানকে সম্রাটের কাছে নিয়ে আসা হলো এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের তার পেছনে বসানো হলো। সম্রাট হিরাক্লিয়াস দোভাষীর মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের পেছনে থাকা ব্যক্তিবর্গকে বললেন যে, জিজ্ঞাসিত কোনো কথার উত্তরে আবু সুফিয়ান মিথ্যা বললে সাথে সাথে যেন তারা প্রতিবাদ করে। আবু সুফিয়ানের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এ কারণে মিথ্যা বলতে পারলেন না বলে পরবর্তীতে তিনি জানিয়েছিলেন।

হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে সেই লোকটির বংশমর্যাদা কেমন? আবু সুফিয়ান বললেন, তিনি উচ্চ বংশমর্যাদার অধিকারী।

হিরাক্লিয়াস বললেন, তিনি যা বলেন এ রকম কথা কি তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ বলেছিলেন?

উত্তরে আবু সুফিয়ান বললেন, না।

হিরাক্লিয়াস বললেন, তাঁর পিতামহের মধ্যে কেউ কি সম্রাট ছিলেন? আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন, না।

সম্রাট বললেন, তাঁর আনুগত্য কারা করছে, বড় লোকেরা না দুর্বল লোকেরা?

আবু সুফিয়ান বললেন, দুর্বল লোকেরা।

হিরাক্লিয়াস বললেন, তাদের সংখ্যা কি বাড়ছে না কমছে?

আবু সুফিয়ান বললেন, বেড়েই চলেছে।

হিরাক্লিয়াস বললেন, এ ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের পর কেউ কি ধর্মান্তরিত হয়েছে? আবু সুফিয়ান জবাবে 'না' বললেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, তিনি এখন যা বলছেন এসব বলার পূর্বে কেউ কি মিথ্যা বলার জন্য কখনো তাঁকে অভিযুক্ত করেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, না।

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন ?

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান বললেন, না। তবে সম্প্রতি তাঁর সাথে আমরা একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছি এ ব্যাপারে তিনি কী করবেন জানি না। সুযোগ পেয়ে আবু সুফিয়ান কৌশলে নেতিবাচক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন।

হিরাক্লিয়াস বললেন, তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো ?

আবু সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ।

হিরাক্লিয়াস বললেন, তোমাদের এবং তাঁর যুদ্ধ কেমন ছিল? আবু সুফিয়ান বললেন, যুদ্ধ আমাদের এবং তাঁর মধ্যে বালতিতে পানি উঠানোর মতো। কখনো তিনি আমাদের পরাজিত করেন, কখনো আমরা তাঁকে পরাজিত করি। হিরাক্লিয়াস বললেন, তিনি তোমাদের কী কাজের আদেশ দেন?

আবু সুফিয়াস উত্তরে বললেন, তিনি বলেন তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত করো তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না, তোমাদের পিতা, পিতামহ যা বলতেন। সত্যবাদিতা, পরহেজগারী, পাক-পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের তিনি আদেশ দিয়ে থাকেন।

হাদীসের ভাষ্য অনুসারে সম্ভবত উপরিউক্ত প্রশ্নটিই ছিল শেষ প্রশ্ন। এরপর হিরাক্লিয়াস নিজেই নিজের প্রশ্ন এবং আবু সুফিয়ানের উত্তরের ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি দোভাষীর মাধ্যমে আবু সুফিয়ান ও দরবারের উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, আমি যখন নবুওয়তের দাবিদারের বংশমর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি তখন সে বলেছে, তিনি উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন। নিয়ম হচ্ছে যে, পয়গাম্বর উচ্চ বংশমর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, তাঁর পূর্বে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ এ ধরনের কথা বলেছিল কিনা, সে বলেছে যে, বলেনি। যদি অন্য কারো কথারই সে পুনরাবৃত্তি করতো তবে আমি বলতাম যে, এই লোকটি অন্যের বলা কথারই প্রতিধ্বনি করেছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? যদি তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকতো, তবে আমি বলতাম যে, এ লোক বাপ-দাদার বাদশাহী দাবি করছে। এরপর আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি যা বলছেন, ইতঃপূর্বে তোমরা তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে শুনেছিলে কিনা? তুমি বলেছো, না। মানুষের ব্যাপারে যিনি মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক সম্পর্কে মিথ্যা বলবেন এটা হতেই পারে না। আমি এ কথা জিজ্ঞেস করেছি যে, ধনী মানুষরা তার আনুগত্য করে না দরিদ্ররা? প্রকৃতপক্ষে দরিদ্ররাই প্রথমত নবীদের আনুগত্য করে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের পর কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে কিনা। তুমি বলেছো, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের সজীবতা অন্তরে প্রবেশের পর এ রকমই হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন কিনা। তুমি বলেছো না, প্রকৃতপক্ষে পয়গাম্বর এ রকমই থাকেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। আমি জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি কী কী কাজের আদেশ দেন? তুমি বলেছো যে, তিনি তোমাদের আল্লাহর ইবাদতের আদেশ করেন, তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করার আদেশ করেন, মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন, নামায, সত্যবাদিতা, পরহেজগারি, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আদেশ দেন। তুমি যা কিছু বলেছো যদি এসব সত্য হয়ে থাকে তবে তিনি খুব শীঘ্রই আমার দু'পায়ের নিচে জায়গারও মালিক হয়ে যাবেন।

www.pathagar.com

একপর্যায়ে রাজা হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণেরও অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু পরবর্তীতে দরবারের উপস্থিত জনতার বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় সেটি তিনি করেননি। তবে রাসূলের পত্রবাহক হযরত দেহিয়া কালবিকে [রা] বেশকিছু ধনসম্পদ ও মালামাল উপহার হিসেবে প্রদান করেন।

পঞ্চম পত্র

মুনযের ইবনে সাদি ছিলেন বাহরাইনের শাসনকর্তা। মহানবী [সা] তাঁর নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জনিয়ে একটি পত্র দিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত চিঠিটি যদিও আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু উক্ত চিঠির জবাবে মুনযের ইবনে সাদি একটি পত্র লিখেছিলেন সে পত্র সম্পর্কে জানা যায়। সে পত্রটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার চিঠি আমি বাহরাইনের অধিবাসীদের পড়ে শুনিয়েছি। কিছু লোক ইসলামকে পছন্দ করেছেন ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে পছন্দ করেননি। এখানে ইহুদি এবং অগ্নি উপাসকও রয়েছে। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিন। উপরিউক্ত চিঠির উত্তরে মহানবী [সা] আরেকটি পত্র লিখেন। উভয় পত্রের ভাষা পড়ে অনুধাবন করা যায় যে মুনযের ইবনে সাদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্য মদীনা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মুনযের ইবনে সাদির পত্রের উত্তরে মহানবী [সা] যে দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।"

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুনযের ইবনে সাদির নামে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [সা] আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবেন তিনি নিজের জন্যই সে সব করবেন। যে ব্যক্তি আমার দূতদের আনুগত্য করবে এবং তাদের আদেশ মান্য করবে সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করেছে মনে করা হবে। যারা আমার দূতদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে। আমার দূতরা আপনার প্রশংসা করেছেন। আপনার জাতি সম্পর্কে আপনার সুপারিশ আমি গ্রহণ করেছি। কাজেই মুসলমান যে অবস্থায় ঈমান আনে, তাদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি দোষীদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনিও ওদের ক্ষমা করুন। আপনি যতদিন সঠিক পথ অনুসরণ করবেন ততোদিন আপনাকে আমি বরখাস্ত করবো না। যারা ইহুদি ধর্ম বিশ্বাসের ওপর রয়েছে এবং যারা অগ্নি উপাসনা করছে তাদের জিযিয়া বা নিরাপত্তা কর দিতে হবে।"

ষষ্ঠ পত্র

মহানবী [সা] ইসলামের আহ্বান প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের নিকট পত্র লিখেন। ইতঃপূর্বে প্রেরিত পত্রগুলোর বেশিরভাগ পত্রই প্রেরিত হয়েছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী পত্রগুলোর ভাষা ও নির্দেশনা সরাসরি নির্দেশমূলক; যা পড়লেই অনুধাবন করা যায়। মহানবী [সা] ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা ইবনে আলীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তার ভাষা ও নির্দেশনা দেখে অনুমান করা যায় যে, পত্রটি হুদায়বিয়ার সন্ধির অনেক পরে প্রেরিত হয়েছিল। পত্রটি নিম্নরূপ-

www.pathagar.com

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাওজা ইবনে আলীর নিকট চিঠি। সে ব্যক্তির ওপর সালাম যিনি হিদায়েতের অনুসরণ করেন। আপনার জানা উচিৎ যে, আমার দ্বীন উট ও ঘোড়ার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনার অধীনে যা কিছু রয়েছে, সে সবকে আপনার জন্য অক্ষুণ্ন রাখা হবে।"

উপরিউক্ত পত্রটি সাহাবী সালীত ইবনে আমর আমেরি [রা] হাওজা ইবনে আলীর নিকট পৌঁছে দেন। উল্লেখ্য, পত্রটি পাঠের পর ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা ইবনে আলীর প্রতিক্রিয়া খুব ভালো ছিল না। তার প্রতিক্রিয়া ছিল নিম্নরূপ-

"আপনি যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছেন তার কল্যাণময়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত আরবদের ওপর আমার প্রভাব রয়েছে। কাজেই আপনি আমাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিন, আমি আপনার আনুগত্য করবো।"

এই পত্রের মধ্যে শাসনকর্তা আরবদের মধ্যে তার প্রভাবের কথা উল্লেখ করে প্রচ্ছন্নভাবে এক ধরনের অহঙ্কার ও শর্তযুক্ত আনুগত্যের প্রস্তাব রয়েছে, যা মহানবীর [সা] অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল। শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করেননি। মহানবী [সা] শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি।

সপ্তম পত্র

মহানবী [সা] তাঁর জীবদ্দশায় দামেশকের শাসনকর্তা হারেছ ইবনে আবু শিমার গাসসানিকে পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের ভাষাটি ছিল নিম্নরূপ:

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদের [সা] পক্ষ থেকে হারেছ ইবনে আবু শিমারের নামে। সেই ব্যক্তির প্রতি সালাম যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। ঈমান আনেন এবং সত্যতা স্বীকার করেন। আপনাকে আমি আল্লাহ পাকের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিচ্ছি যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যার কোনো শরিক নেই। ইসলামের দাওয়াত কবুল করুন। আপনাদের জন্য আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।"

উল্লেখ্য, সাহাবী হযরত সুজা ইবনে ওয়াহাব পত্রটি হারেছ ইবনে আবু সিমার গাসসানির নিকট পৌঁছে দেন। তিনি পত্র পেয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে, কে আমার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারে? শীঘ্রই আমি তাঁর বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছি। বলাবাহুল্য শাসনকর্তা হারেছ ইবনে আবু সিমার গাসসানি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি।

অষ্টম পত্র

মহানবী [সা] আম্মানের বাদশাহ যেফার ইবনে জলনদি ও তাঁর ভ্রাতা আবদ ইবনে জলনদির নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রের ভাষা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

"পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে শুরু করছি।

আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের পক্ষ থেকে জলনদির দুই পুত্র যেফার ও আবদের নামে।

www.pathagar.com

সালাম সেই ব্যক্তির ওপর যিনি হিদায়েতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আমি আপনাদের উভয়কেই ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রাসুল। যারা জীবিত আছে তাদের পরিণামের ভয় দেখানো এবং কাফেরদের জন্য আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই আমি কাজ করছি। আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাদেরকেই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনার বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখণ্ড ঘোড়ার খুরের নিচে যাবে। আপনাদের বাদশাহীর ওপর আমার নবুয়ত বিজয়ী হবে।"

উপরিউল্লিখিত মহানবীর [সা] পত্রটি আবিসিনিয়ায় রাজা নাজ্জাশীর নিকট থেকে ফেরত আসা অভিজ্ঞ সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আসকে পৌঁছে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। চিঠি পৌঁছানোর সময় তিনি যে সমস্ত প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি তারও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনাটি নিম্নরূপ–

আমি রওনা হয়ে আম্মান গেলাম এবং আবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। দু ভাইয়ের মধ্যে আবদ ছিলেন নরম মেজাজের। তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে এবং আপনার ভাইয়ের কাছে রাসুলের [সা] দূত হিসেবে এসেছি। তিনি বললেন, আমার ভাই বয়স এবং বাদশাহী উভয় দিক থেকেই আমার চেয়ে অভিজ্ঞ। তাই আমি আপনাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, তিনি নিজেই আপনার আনীত চিঠি পড়বেন। একথার পর আবদ বললেন, আচ্ছা আপনারা কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?

আমর ইবনুল আস বললেন, আমরা আল্লাহ পাকের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমরা বলে থাকি যে, আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তাকে বাদ দিয়ে সাক্ষ্য দিন যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আবদ বললেন, হে আমর, আপনি আপনার কওমের সর্দারের সন্তান। বলুন, আপনার পিতা কি করেছিলেন। আপনার পিতার কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য হবে।

আমর ইবনুল আস জবাবে বললেন, আমার পিতা মুহাম্মদের [সা] ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং আল্লাহর রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন, তবে কি যে ভালো হতো। আমি নিজেও অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে ইসলামের হিদায়েত দিয়েছেন।

আবদ বললেন, আপনি কবে থেকে তাঁর অনুসরণ করেন?

উত্তরে আমর বললেন, বেশিদিন হয়নি।

আবদ বললেন, আপনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

আমর বললেন, নাজ্জাশীর সামনে। নাজ্জাশীও মুসলমান হয়েছিলেন।

আবদ বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর নাজ্জাশীর বাদশাহীর কী অবস্থা হয়েছে?

আমর বললেন, বাদশাহী অক্ষুণ্ন রয়েছে।

আবদ বললেন, তাঁর স্বজাতি, গীর্জার পাদ্রী এবং অন্যদের কী অবস্থা?

আমর বললেন, তাঁরা সকলেই নাজ্জাশীকে অনুসরণ করেছে।

আবদ বিস্মিত হয়ে বললেন, হে আমর ভেবে দেখুন আপনি কী বলছেন। মনে রাখবেন একজন মানুষের জন্য মিথ্যার চেয়ে বদগুণ আর কিছুই হতে পারে না। আমর বললেন, আমি মিথ্যা

www.pathagar.com

বলছি না। মিথ্যা বলা আমরা বৈধও মনে করি না। আবদ বললেন, আমি মনে করি সম্রাট হিরাক্লিয়াস নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা জানেন না।

আমর প্রতিবাদ করে বললেন, অবশ্যই জানেন। আবদ বললেন, আপনি কি করে জানলেন?

আমর বললেন, নাজ্জাশী পূর্বে হিরাক্লিয়াসকে আয়কর পতিশোধ করতেন, কিন্তু ইসলামের মাধ্যমে তিনি মুহাম্মদের [সা] সত্যতা মেনে নেয়ার পর বললেন, আল্লাহর শপথ এখন থেকে হিরাক্লিয়াস যদি আমার কাছে একটি দিরহামও চান তবু আমি তাকে দেবো না। এ খবর হিরাক্লিয়াসের দরবারে পৌঁছবার পর তাঁর ভাই ইয়ানাক তাকে বলেছিল, আপনি কি আপনার একজন এমন প্রজা যে খারাজ দিতে চায় না তাঁকে ছেড়ে দেবেন? এমনকি আপনার ধর্মবিশ্বাস বাদ দিয়ে অন্য একজনের ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করবেন এটাও কি আপনার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব? হিরাক্লিয়াস বললেন, এই লোক একটি ধর্ম বিশ্বাস পছন্দ করেছে এবং তা গ্রহণ করেছে, আমি তাকে আর কী করতে পারি? খোদার কসম রাজত্বের লোভ না হলে নাজ্জাশীর মতো আমিও তাই করতাম। আবদ বললেন, আমর আপনি কী বলছেন একটু ভেবে বলুন।

আমর বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যা কিছু বলছি, সত্য বলছি। আবদ বললেন, আচ্ছা এবার বলুন, তিনি কী কাজের আদেশ দেন আর কী কাজ করতে নিষেধ করেন?

আমর বললেন, আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ প্রদান করেন এবং নাফরমানী করতে নিষেধ করেন। নেকী করার এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ প্রদান করেন। জুলুম, অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, ব্যভিচার, মদপান, পাথর, মূর্তি এবং ক্রুশ-এর উপাসনা করতে নিষেধ করেন।

আবদ বললেন, তিনি যে সব কাজের নির্দেশ করেন এর সবই তো ভালো কাজ। আমার ভাই [যেফার] যদি আমার অনুসরণ করবেন বলে আমার ভরসা থাকতো তবে আমরা সওয়ার হয়ে মদীনায় ছুটে যেতাম এবং মুহাম্মদের [সা] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম। কিন্তু আমার ভাই রাজত্বের ক্ষমতালোভী একজন মানুষ। তিনি রাজত্ব হারানোর ভয়ে অন্য কারো আনুগত্য মেনে নেবেন কিনা সন্দেহ রয়েছে।

আমর বললেন, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহর রাসুল তাকেই তাঁর বাদশাহীতে বহাল রাখবেন। তবে তাকে একটি কাজ করতে হবে। সেটি হচ্ছে ধনীদের নিকট থেকে সদকা আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

আবদ বললেন, এটা তো ভালো কথা। তবে সদকা কী জিনিস?

আমর বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর রাসুলের নির্ধারিত সদকার বিবরণ উল্লেখ করলেন। এক পর্যায়ে উটের প্রসঙ্গ এলে আবদ বললেন, হে আমর আমাদের ওসব পশুপাল থেকেও কি সদকা নেয়া হবে যারা নিজেরাই চারণ ভূমিতে চরে বেড়ায়?

জবাবে আমর 'হ্যাঁ' বললেন। আবদ তখন বললেন, আল্লাহর শপথ আমার জানা নেই যে, আমাদের দেশের মানুষ দেশের বিশালতা এবং উটের সংখ্যাধিক্যতার কথা ভেবে এটা মেনে নেবে কিনা।

এরপর আমর ইবনুল আস রাজ দরবারের দেউড়িতে কয়েকদিন কাটালেন। আবদ তার ভাই যেফারের কাছে গিয়ে তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। এরপর একদিন আমরকে ডাকলেন।

www.pathagar.com

আমর ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রহরীরা তাকে বাধা দিতে চাইলে আবদ প্রহরীদের ছেড়ে দিতে বললেন। আমরকে দেখে বাদশাহ বললেন, আপনি কী চান? আমর মহানবীর [সা] চিঠিখানি তাঁকে দিলেন। তিনি খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটি পড়ে তার ভাইয়ের হাতে দিলেন। আমরের [রা] মনে হলো আবদের তুলনায় তার ভাই বাদশাহ যেফার অনেক কঠিন একজন মানুষ। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে কী করেছে বলুন। আমর বললেন, সবাই তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কেউ দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার কারণে। দু-একজন তলোয়ারের ভয়ে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তার সাথে কী ধরনের লোক রয়েছে?

আমর বললেন, তাঁর কাছে সব ধরনের লোকই রয়েছে। তাঁরা ইসলামকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইসলামকে অন্য সকল ধর্মবিশ্বাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহ পাকের হিদায়েত পেয়ে তারা অনুধাবন করেছে যে, এ যাবত তারা গোমরাহর অন্ধকার পাঁকে হাবুডুবু খাচ্ছিল। আমর আরো বললেন, আমার জানামতে এতদঞ্চলে আপনিই শুধু একা যিনি এখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন এবং রাসুলের [সা] আনুগত্য না করেন তবে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী মানুষ এসে আপনাকে তছনছ করে দিয়ে যাবে। আপনার সজীবতা নষ্ট করে দেবে। তাই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। এতে করে রাসুল [সা] আপনাকেই আপনার সম্প্রদায়ের শাসনকর্তা হিসেবে বহাল রাখবেন। এখানে কোনো হামলাকারী প্রবেশ করতে পারবে না।

বাদশাহ আমরকে পরদিন দরবারে ডাকলেন। আমর তার ভাই আবদের কাছে আসলেন। আবদ বললেন, আমার ভাইয়ের বাদশাহীর লোভ প্রবল না হলে ইসলাম গ্রহণ করে নেবেন। পরদিন আমর আবদের সাহায্য নিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন।

বাদশাহ তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, আমি আপনার উপস্থাপিত দাওয়াত সম্পর্কে ভেবে দেখেছি। আমি যদি আমার বাদশাহী এমন একজনের কাছে ন্যস্ত করি যার কোনো সেনাদল এখনো এখানে এসেই পৌঁছেনি। এমতাবস্থায় আমাকে সকলে দুর্বল হিসেবে ভাববে। যদি তার সৈন্যবাহিনী এখানে এসেই পড়ে তবে নিশ্চয় তাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করবো।

বাদশাহর কথা শুনে আমর বললেন, তাহলে ঠিক আছে। আমি আগামীকালই ফিরে যাচ্ছি। বাদশাহ এমতাবস্থায় তার ভাই আবদের কাছে নির্জনে পরামর্শ করতে গেলেন। আমর [রা] অপেক্ষা করলেন।

বাদশাহ তার ভাই আবদকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করলেন। পরামর্শে বাদশাহ আবদকে বললেন, এই পয়গাম্বর যাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে তাদের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য। তিনি যার কাছেই দাওয়াত দিয়েছেন তিনিই দাওয়াত কবুল করে নিয়েছেন।

পরামর্শ শেষে আমরকে পরদিন দরবারে ডাকা হলো। তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। হযরত আমরকে সেখানে কাজী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

পত্রের ভাষা এবং বাদশাহ ও বাদশাহর ভাই আবদের সঙ্গে হযরত আমর ইবনুল আসের কথোকথন থেকে অনুধাবন করা যায় যে, এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের পরে সংঘটিত হয়েছিল।

অসম্ভব এক নিকষ কালো পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার রাত থেকে পৃথিবীর মানুষকে স্নিগ্ধ সকাল উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা]। মক্কার কুরাইশদের ইসলামের আহ্বানের মাধ্যমে মহানবীর [সা] দাওয়াত দান কর্মসূচির সূচনা হয়েছিল তা বিস্তৃত হয়ে দেশান্তরে ছড়িয়ে

www.pathagar.com

পড়েছিল অতি দ্রুততায়। মহানবী [সা] মক্কার সমাজকে দাওয়াত দানের সাথে সাথে মক্কার বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলেও পত্রের মাধ্যমে ইসলামের সৌরভ ছড়িয়েছিলেন। একদল অতি দক্ষ পরিশ্রমী সাহাবীদের কুশল উপস্থাপনা ও অমায়িকতায় রাজা-বাদশাহ বা গোত্রপতিদের দরবারে মহানবীর [সা] পত্রের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সমকালীন বহির্বিশ্বের খ্যাতনামা রাজা-বাদশাহদের অনেকেই মহানবীর [সা] পত্র মাধ্যমে দাওয়াত দানে ইসলাম গ্রহণ করে কৃতার্থ হয়েছিলেন। অনেকে গ্রহণ না করলেও ইসলামের পরিচয় জানার সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। ফলে ইসলাম সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব পরিসরে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। ■

গ্রন্থপঞ্জি

১. ইবনে হিশাম, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, [আকরাম ফারুক অনূদিত], বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৮

২. আল্লামা শিবলী নোমানী, *সিরাতুন নবী [সা]*, [আল্লামা সোলায়মান নদভী ও মওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত], প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৫

৩. ড. এ কে এম ইয়াকুব আলী, *সারওয়ার-ই-কায়েনাত মুহাম্মাদ [সা]*, রাজশাহীঃ সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, বাংলাদেশ,২০১০।

৪. গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮০

৫. আ,খ,মু, ইয়াকুব আলী [ড.একেএম ইয়াকুব আলী] *মহানবী ও ইসলাম*, রেযা-উর-রহীম, মতিহার, রাজশাহী, ১৯৭৪

৬. শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন ও ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা [সা], সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

৭. ইবনে ইসহাক, [শহীদ আখন্দ অনূদিত], *সীরাতে রসুলুল্লাহ [সা]*, [তৃতীয় খণ্ড], ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২

৮. আল্লামা ছফিউর রহমান *মোবারকপুরী, আর রাহীকুল মাখতুম*, [খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত, পরিবেশনা-আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ কার্যালয়], খাদিজা আখতার রেজায়ী, লন্ডন, চতুর্থ প্রকাশ, ২০০০

৯. ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস*, গ্লোব লাইব্রেরী [প্রাঃ] লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৫

১০. ডঃ মজিদ আলী খান, *শেষ নবী হযরত মুহম্মদ [সা]*, [আবু মুহম্মদ অনূদিত] ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫

১১. মুহম্মদ আবু তাহের [সম্পাদিত], *রাসুলুল্লাহ [সা]-এর হুদায়বিয়ার সন্ধি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭

১২. হাফিজ ইব্ন কাইয়িম, আল্লামা, *যাদুল মা আদ*, [অনূ. অধ্যাপক আখতার ফারুক], ঢাকাঃ ইফাবা, ১৯৯০।

১৩. ওয়েবসাইট।

www.pathagar.com

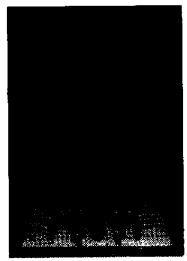

হেরা থেকে ওহুদ এক আধ্যাত্মিক সফর

মাসুদ মজুমদার

কোনো একটি ভ্রমণ আধ্যাত্মিক সফরের মর্যাদা পেতে পারে। যারা আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের অনবদ্য গ্রন্থ 'রোড টু মক্কা'র সাথে পরিচিত, তারা আধ্যাত্মিক সফরের তাৎপর্য অবশ্যই উপলব্ধি করেছেন। অধ্যাপক শাহেদ আলীর অনুপম অনুবাদের কারণে বাংলাভাষীরা ভিন্ন এক আধ্যাত্মিক সফরের সাথে পরিচিত হতে পারেন। মক্কা পবিত্র শহর। এর অন্যান্য নাম– আল বালাদ, বাক্কা, আল কারিয়াহ ও উম্মুল কুরা। মদিনার আদি নাম ইয়াসরিব। মহানবীর হিজরতের পর এর নাম মদিনাতুন্নবী বা নবীর নগর। এই নগরীতেই মসজিদে নববী, রাসূলের হাতে গড়া মসজিদ। এই মসজিদেরই এক কোণে প্রিয়নবীর অন্তিম শয়নস্থান। যারা পবিত্র ওমরাহ ও হজ পালন করতে যান– তারা মূলত কোনো দেশ ভ্রমণে যান না, তারা যান এক বেহেশতি সফরে। যে সফরে ঈমান তাকে পথ বাতলে দেয়। আল্লাহর রহমত তাকে পাহারা দেয়। মহানবীর অদৃশ্য হাতছানি তাকে যেন ঘিরে রাখে। এ রাহের পথিকের সামনে থাকে হেরার জ্যোতি ও রাজতোরণ। ওহুদের মায়াবী ছায়া যেন তাকে কাছে টানে।

হেরা মক্কার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পর্বত। এই পর্বত বা পাহাড়ের একটি চিহ্নিত গুহায় ৬১০ সালের রমজান মাসে হাজার বছরের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এক রাতে আল্লাহর নবীর ওপর প্রথম 'ওহি' নাজিল হয়েছিল। প্রভুর নামে পড়বার সেই আহ্বান আরশের মালিকের কাছ থেকে হজরত জিব্রাইল [আ] বহন করে এনেছিলেন। আরবরা জাবালে নূর বা হেরাকে আলাদাভাবে সম্মান করে। হেরা গুহায় নাজিল হওয়া সেই আসমানি আহ্বানে মানুষ সাড়া দেবে অনন্তকাল। সেদিন প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন আহমদ ও মুহাম্মদ নামের এক আ'লামিন। তখন যার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। তার সমাধি এখন আরেক পাহাড় ওহুদের লাগোয়া।

ওহুদ মদিনায় অবস্থিত। এই পাহাড়ের সাথেও মানবসভ্যতার অনেক ইতিহাস-ঐতিহ্য মিশে আছে। প্রিয়নবীর জীবনে মক্কা-মদিনার প্রভাব ও অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এ দুই পাহাড়ের মাঝখানে নতুন অবয়বে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছে; যা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। ওহুদ ও হেরা ছাড়াও আমরা আসমানি কিতাবে তুর পাহাড় ও সিনাই উপত্যকার বিশেষত্ব খুঁজে পাই। এই তুর পর্বতেই আল্লাহর সাথে হজরত মুসা [আ.]-এর কথোপকথনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। হজরত মুসা [আ] ছিলেন আল্লাহর আরেক প্রিয় বান্দা। তুর

www.pathagar.com

ও সিনাইয়ের অবস্থান বৃহত্তর ফিলিস্তিনে। যেখানে প্রথম কেবলা আল আকসা আজ শত্রুপরিবেষ্টিত রয়েছে।

আরবের পুরনো নাম হেজাজ। হেজাজ ফিরিয়ে দেয়ার দাবি পুরনো। এর সাথে এক সাগর রক্তক্ষরণের ইতিহাস জড়িত। সেই ইতিহাস অনেক বেদনাবিধুর ও মুলকিয়াতের নিগড়ে বন্দী। সময়ের সাথে সাথে সমাজ পাল্টায়। রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আসে। মানচিত্র ওলট-পালট হওয়ার ঘটনাও সবার জানা। সব পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত না হলেও মানুষ মেনে নেয়। যন্ত্রণাকাতর স্মৃতিও মানুষ হজম করে নিতে বাধ্য হয়। মরুভাস্করের রহমতি ছোঁয়ায় তেলসমৃদ্ধ আরব জাহান এখন নানা জাতি ও শ্রেণীকে নানাভাবে হাতছানি দেয়; প্রলুব্ধ করে। কিন্তু পরাশক্তির অভিলাষ আর সাধারণ মানুষের ইচ্ছা কখনো একই সমতলে থাকে না। বিশেষত মুসলিম বিশ্বের সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি আরব জাহানের উত্থান-পতন ও সমৃদ্ধির সাথে কম-বেশি সম্পৃক্ত। তেলের প্রতি তাদের মোহ নেই। কিন্তু দরদ আছে। তা ছাড়া আজকের আরবসমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রকৃত ঈমানদার জনগণকে টানে না। হাতছানি দেয় না। তবে মক্কা-মদীনার প্রতি দুর্বার ও দুর্নিবার আকর্ষণ সবার মনে বাসা বেঁধে আছে। আরব জাহানের শাসকেরা সাধারণ মানুষের জন্য কোনো অনুপ্রেরণা নন, কিন্তু তাদের শাসিত অংশত কল্যাণ রাষ্ট্রের কিছু সুফল তাবৎ বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ উপভোগ করে। কার্যত মক্কা-মদিনাই জনগণকে ভাবায়। অনুপ্রাণিত করে। আপ্লুত করে। আমাদের সাধারণ মানুষ আরব ও আরবি বলতে শুধু শ্রদ্ধামিশ্রিত আবেগ লালন করে না, এক ধরনের মমত্ববোধও পোষণ করে। এই আবেগ ও মমত্ববোধের কারণ আরবি কুরআনের ভাষা, জান্নাতের ভাষা। নৃতাত্ত্বিকভাবে মহানবী ছিলেন আরব। বৃহত্তর আরবের বুকেই বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববী, মসজিদুল আকসাও। যেকোনো ঈমানদার সওয়াব ও ঈমানি কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে তিনটি স্থানে সফর করতে পারেন– বায়তুল্লাহ, বায়তুল মোকাদ্দাস বা মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী। বায়তুল্লাহ সারা বিশ্বের ঈমানদারদের কেবলা। এক সময় সেই কেবলা ছিল মসজিদুল আকসায়, যা বায়তুল মোকাদ্দাসেরই অংশ। প্রিয়নবীর রওজা মসজিদে নববীর এক কোণে অবস্থিত, যা আগেই উল্লেখ করেছি। মহানবীর কবরের পাশেই রয়েছে দোয়া কবুলের স্থান রিয়াজুল জান্নাহ বা বেহেশতের একটি টুকরা। যেখানে ইবাদত কবুলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

পূর্বাপর ইসলামের সব নবী-রাসূল এসেছিলেন আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক বুঝিয়ে দিতে। বায়তুল্লাহ ও এর প্রভুর মর্যাদা তুলে ধরতে। মানুষের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিতে। ইহকাল ও পরকালের পথ-পাথেয় সম্পর্কে ধারণা দিতে। এই কাবাকেন্দ্রিক জীবনের শুরু হজরত আদম [আ] থেকে, শেষ পথপ্রদর্শক ছিলেন মহানবী [সা]। আল্লাহ মহানবীর প্রতি দরুদ পড়তে বলেছেন। দরুদের সারকথা দোয়া। আমরা যারা পীর ফকির দরবেশের কাছে দোয়া চাই, তাদের জন্য আল্লাহর নবীর জন্য আল্লাহ নির্ধারিত দোয়া-দরুদের বিষয়টি মাথায় রাখতে পারি। ইবাদতের নামে বাহুল্য বর্জনের তাগিদ পেতে পারি।

হজরত আদম-হাওয়া [আ]-এর সময় থেকে মহানবীর কাল অতিক্রম করে সাহাবাসহ অধস্তন অসংখ্য জিন্দাদিল মানুষের পদছোঁয়ায় আরব জাহান ধন্য। যারা ইসলামের প্রাণস্পর্শী জীবনবোধ উপলব্ধি করেন, তারা মক্কা-মদীনার প্রতিটি ধূলিকণায় প্রিয়নবী ও তার অসংখ্য অনুসারীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। হেরার দিকে তাকিয়ে তিনি পান পথচলার প্রেরণা এবং অনাবিল এক স্বস্তি। হেরা ও ওহুদের পানে দৃষ্টি ফেলে তিনি নতুন করে নিতে পারেন

www.pathagar.com

আনুগত্যের শপথ। বদর-ওহুদ-খন্দকের স্মৃতি তাকে নবীজীবনের সাথে হেরার রাজতোরণ দেখিয়ে দেয়। ত্যাগ-কুরবানির মোকাবেলায় সত্য-মিথ্যার লড়াইয়ের চিরায়ত ধারণা নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে।

আল্লাহর অনুগত বান্দা ও মানুষ শুধুই আল্লাহর কাছে চায়, বান্দার কাছে নয়। এই চাওয়ার ফলাফল তাৎক্ষণিক প্রত্যাশা করা যায়, কিন্তু সব সময় তা হওয়া সম্ভব নয়। তাই দোয়ার পরে কিংবা আল্লাহর কাছে চেয়ে অধৈর্য হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দোয়া চেয়ে হতাশা কিংবা দোয়া চেয়ে লাভ নেই ভাবা মৌল বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, জমজমের পানি পান করেই যারা সব মুশকিল তাৎক্ষণিক আসান চান, তারা এর খোদায়ি মাজেজা বুঝতে চান না। জমজমের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রত্যেক মুমিনকে আপ্লুত করে। তাই এর ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরনের রহমতের ফল্গুধারা। এর আদি স্থানটি এখন সাধারণভাবে দৃশ্যমান নয়। তবে মক্কা-মদীনার ব্যবস্থাপকেরা প্রত্যেক হজযাত্রী ও তাওয়াফকারীর জন্য জমজমের পানি সহজলভ্য করেছেন। এ বরকত থেকে এখন মসজিদে নববীর নামাজিরাও বঞ্চিত নন। মক্কা থেকে সরাসরি পাইপযোগে মদীনা পৌঁছে গেছে জমজমের পানি।

মক্কা থেকে মদীনায় রাসূলের হিজরতের পথ ধরেই রাজপথটি তৈরি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। হালে আধুনিকায়নের কারণে মহাসড়কটির গতিপথ কিছুটা পরিবর্তন করে দূরত্ব কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। হেরা থেকে ওহুদের দূরত্ব প্রায় ৫০০ মাইল। কিন্তু বিশ্বাসী মনের সেতুবন্ধনে এক ফলক মাত্র। হজ ও ওমরার সাথে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় এবং রাসূলের রওজায় সালাম-দরুদ পাঠানোর কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যারা তাওয়াফকারী তারা মদীনায় ছুটে যান এক অদম্য ও দুর্নিবার আকর্ষণে। এই আকর্ষণ ঈমানবিদৌত, নবীর প্রতি ভালোবাসার আকর্ষণ, তার অনুসৃত দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ। সঙ্গত কারণেই বিশ্বাসের মানদণ্ডে ও অবিমিশ্র আবেগের কাছে এই দূরত্ব একেবারেই গৌণ।

বায়তুল্লাহ থেকে সামান্য দূরে রাসূলের আদিনিবাসটি এখন একটি সাধারণ পাঠাগার। একজন বিজ্ঞ আলেম সারাক্ষণ দর্শণার্থীদের ওখানে সিজদা কিংবা বাহুল্য কোনো আমল থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেই পাঠাগার থেকে বিভিন্ন ভাষায় অনেক বই প্রকাশিত হয়। বাংলায় অনূদিত বইও পাওয়া সম্ভব। রাসূলের বাড়ির পাশেই তার পড়শি কাফের নেতা আবু জেহেলের বাড়িটি এখন হাম্মামখানা। আরব জাহানে হাম্মামখানা বলতে পায়খানা-প্রস্রাবখানা ও গোসলখানা একসাথে বুঝানো হয়। ওখানে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি ছুঁড়লেই আপনার চোখে আবু তালেব পাহাড়টি নজরে পড়বে। এই পাহাড়ের পাদদেশে রাসূল [সা] নবুওয়াতি জীবনের শুরুতে তিন বছর কাফেরদের বয়কটের কারণে অনাহারে-অর্ধাহারে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাফা-মারওয়ায় প্রতীকী দৌড়াদৌড়ি, যা কি না ইসলামি পরিভাষায় সায়ি। এটি হজ ও ওমরার অবশ্যকরণীয় কাজের একটি। সেখানে হজরত হাজেরা ও ইসমাইল [আ]-এর যন্ত্রণাকাতর স্মৃতি আপনার মনে পড়বেই। এই স্মৃতিবিজড়িত স্থানে মিল্লাতের পিতা হজরত ইব্রাহিম [আ]-এর ঘটনাপ্রবাহ ও তার পুত্র ইসমাইল [আ]-এর কথা সায়ি করার সময় আপনার মনে বেশি দাগ কাটবে। সেখানে সাফা পাহাড়ের একটু চিহ্ন এখনো দেখতে পাবেন। কিন্তু সেই পরিবেশ পাবেন না। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ ও মসৃণ পথে সাফা-মারওয়ায় সায়ি করার সময় আপনি হয়তো এক ধরনের অনুতাপ ও মর্মপীড়ায় ভুগবেন। হজরত হাজেরার কষ্ট,

www.pathagar.com

শিশুপুত্র ইসমাইল [আ]-এর জন্য আপনার মনে এক ধরনের ব্যথাতুর যন্ত্রণামাখা মমত্ববোধ জাগবেই।

বায়তুল্লাহর কিছুটা দূরে জাবালে নূর বা হেরা পাহাড় আপনাকে বিস্মিত করবে। মনে জাগবে কিভাবে প্রিয়নবী এত ওপরে উঠতে পারলেন, তাকে হজরত খাদিজা কিভাবে সহযোগিতা দিতেন। একই সাথে প্রকৃতির ধর্ম ও আল্লাহর নিয়ম সম্পর্কেও আপনি কিছুটা সবক পাবেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার প্রিয় বান্দার জন্য হেরা পাহাড়ের অবস্থান হজরত খাদিজার দোরগোড়ায় এনে দিতে পারতেন। আল্লাহ স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ন রাখাকেই সমীচীন ভেবেছেন। কুদরত না দেখালে সৃষ্টি পরিচালনায় এটাই আল্লাহ চিরায়ত নিয়ম।

মক্কা আদি নগর রাষ্ট্র। আল্লাহ নিজে এই নগরীর শপথ করে আয়াত নাজিল করেছেন। এর চৌহদ্দির বাইরে আপনি সওর পর্বতের দেখা পাবেন। হিজরতের সময় প্রিয়নবী তার প্রাজ্ঞ সাহাবি হজরত আবু বকর [রা]- কে নিয়ে এই পর্বতের একটি গুহায় আত্মগোপন করে কাফের-মুশরেকদের দৃষ্টিবিভ্রাট সৃষ্টি করেছিলেন। সেই পর্বতের উচ্চতা ও দুর্গম অবস্থান আপনাকে অবশ্যই ভাবাবে। হিজরতের সময়কার বাহন রাসূলের প্রিয় উট কাসওয়ার সাথে সময়ের ব্যবধান ও বাস্তব কারণেই আপনার দেখা মিলবে না। আপনি কোনো চিহ্ন খুঁজে পাবেন না হজরত আবু আইয়ুব আনসারির বাড়িটিরও। তবে মসজিদে নববীর এক পাশে আপনি একটি চমৎকার ডিসপ্লে মিউজিয়ামে রাসূলের মদীনা জীবনের সেই সময়ের পরিবেশ, বিভিন্ন স্থাপনা ও আবাস এলাকা সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাবেন।

মসজিদে নববী থেকে নামাজ আদায় করে বেরোলেই আপনি প্রলম্বিত ও আকাশে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকা ওহুদ পাহাড়ের হাতছানি প্রত্যক্ষ করবেন। রাসূল [সা.] এই পাহাড়কে নিয়ে মন্তব্য করেছেন– ওহুদ আমাদের ভালোবাসে, আমরা ওহুদকে ভালোবাসি। ওহুদের পাদদেশে আপনি যুদ্ধচিত্রটাও প্রত্যক্ষ করবেন। শহীদদের সরদার হজরত হামজাসহ সত্তর জন সাহাবার গণকবরের চিহ্নও দেখা যাবে সেখানে। শত্রুদের আঘাতে ঝরে পড়া রাসূলের পবিত্র দাঁতটিও ওখানে কোথাও পড়ে থাকতে পারে। ছোট্ট একটি টিলার ওপর রাসূল যাদের দাঁড় করিয়ে পুনর্নির্দেশের আগে অবস্থান পরিবর্তন করতে নিষেধ করেছিলেন, সেই টিলাটি আপনার নজরে পড়বে। আপনার মানসপটে ভেসে উঠবে অসম ওহুদ যুদ্ধের মর্মান্তিক সব ঘটনাপ্রবাহ। একই সাথে শিক্ষা হয়ে ধরা দেবে নেতৃত্বের আনুগত্যের খেলাপ হলে জয়ও পরাজয়ে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাপ্রবাহ।

মক্কা-মদীনায় সফর করার সময় আপনি কখনো হুদায়বিয়ার সন্ধিস্থল, আকাবার শপথ এলাকা, কেবলা পরিবর্তনের স্থান মসজিদে কেবলাতাইন, মদিনায় ঢুকে রাসূল যে মসজিদে প্রথম নামাজ আদায় করেছিলেন সেই কুবা মসজিদ পরিদর্শন না করে ঘরে ফিরবেন না। মক্কায়ও যারা ঘুরতে চাইবেন তারা সহজেই জিয়ারত বা পরিদর্শনের জন্য ভাড়ায় গাড়ি পাবেন। সহজেই আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন আরাফার ময়দানে। দেখতে পাবেন জাবালে রহমত বা রাসূলের বিদায় হজের ভাষণ দেয়ার স্থানটি। মসজিদে আন নামেরা, যেখানে এখন হজের খুতবা পড়া হয়, সেটিও আপনার দেখার সুযোগ হবে। একনিমিষে চলে যেতে পারবেন মুজদালিফায়, যেখানে হাজী সাহেবরা খোলা আকাশে রাত কাটান। দুই ওয়াক্ত ফরজ কসর নামাজ মিলিয়ে পড়েন। রাতভর ইবাদতে কাটান। অদূরেই মিনা। যেখানে শয়তানকে ঢিল ছোড়া হয়। কুরবানির ফরজ আদায় করা হয়।

www.pathagar.com

মক্কার মিনা এলাকায় গেলে অনেকেই একটা মসজিদের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ান। চাঁদবিহীন মসজিদটিতে সন্ধিচুক্তি কিংবা শপথের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে। আরবিতে অস্পষ্ট শিলালিপিটির পাঠ উদ্ধার করতে পারলে বিষয়টা বোঝা সহজ। মক্কায় জিন মসজিদের সাথেও আপনার পরিচয় ঘটবে। যেখানে জিনরা রাসূলের কাছে শিক্ষা নিতে জমায়েত হতো। মদীনায় অনেকেই আগ্রহ নিয়ে জিন পাহাড় এলাকা দেখতে যান। চার দিকে পাহাড়বেষ্টিত একটি ঢালু জায়গায় আপনার গাড়ি কিংবা রাখা বস্তুটি গড়িয়ে ওপরে উঠতে থাকে। গাড়ির স্টার্ট ও গিয়ার বন্ধ করে দিলেও গাড়িটি এই এলাকায় ১১০-১২০ কিলোমিটার গতি পায়। রহস্যঘেরা এই স্থানটি নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন, চুম্বকের কোনো আকর্ষণ কিংবা আল্লাহর অপার মহিমায় কোনো অতিলৌকিক কিছু একটা ঘটে যায়। বিশ্বাসীদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকাই ভালো। পুরো বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেই নিরাপদ থাকা সম্ভব।

মদীনায় অনেকেই 'জান্নাতুল বাকি' দেখতে ও জিয়ারত করতে যান। আরবরা 'জান্নাতুল বাকি' শব্দটি গ্রহণ করেন না। জান্নাতের সংখ্যা নির্ধারিত, তারা জান্নাত বলতে কবরস্থানটিকে বোঝাতে আপত্তি করেন। তাদের যুক্তি সঠিক বলেই মনে হয়। কারণ জান্নাতের সংখ্যা আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই 'বাকি কবর'স্থানে অসংখ্য সাহাবা শায়িত আছেন, এটি নিঃসন্দেহে জিয়ারত করার স্থান, কিন্তু কোনোভাবেই জান্নাত নয়, বরং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের অনেকেই এখানে কবরস্থ হয়েছেন। জান্নাতুল বাকি বা মদীনার এই বৃহদাকারের কবরস্থানে অসংখ্য শহীদ সাহাবা ও আহলে বাইতের সদস্যদের কবর রয়েছে। তাদের জন্য দোয়া করা সবার কর্তব্য। তবে ইবাদতের নামে বাড়াবাড়ি কোনোভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এখানকার মাটি সংগ্রহ ও মাতম অর্থহীন কাজ।

ভাষাগত জড়তা নিয়েও হজ ও ওমরা যাত্রী বাংলাদেশীরা একটি বাড়তি সুবিধা পান। কারণ জেদ্দা, মক্কা, মদিনা এবং ট্রানজিট স্পট আবুধাবি ও দুবাইতে প্রচুর বাংলাদেশীর সাক্ষাৎ মেলে। বায়তুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে অসংখ্য বাংলাদেশী পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। হোটেল-মোটেল, রেস্তোঁরা এবং যানবাহনসহ সর্বত্র বাংলাদেশীরা হজ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য সহায়ক। সর্বত্র বাংলাদেশী খাদ্য সহজলভ্য।

যারা হজে যান, তারা ওমরাও পালন করেন। কিন্তু শুধু ওমরায়– ওমরার ইবাদতের শর্ত ও মনের ইচ্ছা পূরণ হয়, ফরজ হজের শর্ত পূরণ হয় না। তবে ওমরাহ পালনের পর হজের অনুষ্ঠানিকতা পালন করা সহজ হয়। আরবরা ওমরাকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন না, কিন্তু হজের সাথে কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। আল্লাহর নবী অনেকবার ওমরা পালন করেছেন। হজ পালন করেছেন একবার। সেটাই বিদায় হজ। বিদায় হজের ভাষণ এখনো বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য দলিল। যেমনটি মদিনা সনদ।

ঈমানদারদের জীবন কাবাকেন্দ্রিক। কাবা সব বিশ্বাসীর কেবলা। কাবাই জান্নাতের পথে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রাণকেন্দ্র। কাবার সান্নিধ্য বিশ্বাসী মনে দোলা দেয়। নিজের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবন-জিজ্ঞাসার সব প্রশ্নের জবাব পাইয়ে দেয়। কাবার প্রভুর কাছেই আমাদের সব চাওয়া-পাওয়া। যারা এ জীবনের চাওয়া-পাওয়ার হিসাব মেলাতে চান, তাদের জন্য কাবার সান্নিধ্য অনিবার্য। তা ছাড়া পুরো বিষয়টি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। কে কোন দৃষ্টিতে বায়তুল্লাহ বা খানায়ে কাবার দিকে তাকাল সেটাই মুখ্য। গিলাবে ঢাকা একটা পাথুরে ঘরকে মুমিন বান্দা

www.pathagar.com

আকর্ষণের স্থান তখনই বানাতে পারে, যখন তিনি এর ভেতর আল্লাহর নির্দেশ ও এর আসমানি মর্যাদা অনুভব করবেন।

কাবার গিলাপে আবেগ আছে। সেই সাথে উপলব্ধি যোগ করা জরুরি। নয়তো তাওহিদের মর্মবাণী নিজের ভেতর সংরক্ষণ করা সহজ নয়। সেখানেই হাতিম শরিফ ও হাজরে আসওয়াদে রয়েছে দোয়া কবুলের কথা। মাকামে ইব্রাহিমের বেষ্টনীর ভেতর, তাওয়াফ চত্বরে– যারা আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না তারা বারবার তালবিয়া পাঠ করবেন, উচ্চকণ্ঠে লাব্বায়েক বলে নিজের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করবেন; কিন্তু ইসলামের প্রাণস্পর্শী জীবনবোধ, জীবনাচার ও জীবনবিধান সম্পর্কে কোনো পূর্ণ ধারণাই পাবেন না। তাওয়াফের জায়গা, কাবাঘরের দরজা, জমজম কুয়ার কাছে, মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের ওপর দৌড়ানোর জায়গা, কাবা শরিফের ওপর বিশ্বাসের দৃষ্টি নিক্ষেপ, রুকনে ইয়েমেনি ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার মসজিদগুলো, আরাফার ময়দান, জাবালে রহমত, মুজদালিফা, কঙ্কর মারার স্থান, জাবালে নূর, জাবালে সাওর, নবীর জন্মস্থান, দারে আরকাম বা হজরত উমর রা: যেখানে ইসলাম গ্রহণ করেন– এসব জায়গায় দোয়া কবুল হয়। এর বাইরে মদিনায়ও কিছু দর্শনীয় স্থান দেখে আসা সহজ। যেমন– আইর ও সওর পর্বত। তৎকালীন বিভিন্ন গোত্রের আবাসভূমি। মসজিদে কুবা, ইজাবা ও জুমআ, কিবলাতাইন, ফাতহ, মিকাত, মুসল্লা, ফাসহ। এসব মসজিদ সহজেই দেখা সম্ভব। যেকোনো বিশ্বাসী মানুষ যদি হালাল উপার্জনের টাকায় হজ ও ওমরার নিয়ত করেন, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র মনে মৌলিক শর্তগুলো পূরণ করেন তবেই পরিতৃপ্তি পাবেন। ইসলামকে যারা জীবনবিধান হিসেবে বোঝেন, তারা পাবেন আলাদা খোরাক। পবিত্র কুরআনের ছাত্রদের জন্য হজ ও ওমরা হবে বাস্তব প্রশিক্ষণ। সেই সাথে নিজের মানোত্তীর্ণ করার অপার সুযোগও। যারা আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ও পবিত্র কুরআনের দাবি অগ্রাহ্য করে শুধু সওয়াবের পেছনে ছুটবেন, তারা মক্কা-মদিনা সফর আধ্যাত্মিক সফরের মর্যাদা পাবেন না। সেটা হবে নিছক এক ভ্রমণ মাত্র।

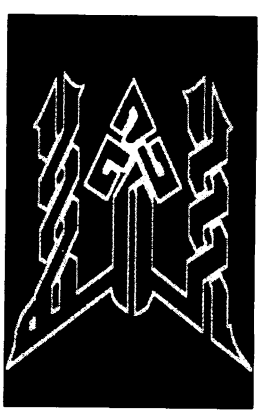

সিরাতুন্নবী (সা.)

হিজরী-১৪৩৫ বাংলা-১৪২১ ইংরেজী-২০১৪
সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র